SAHITYER RUP RITY
O GADYA SAHITYA

BA

Fourth Semester

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Manju Bhash Mitra

Ex – Professor, Department of Bengali, Presidency College

Author: Kuntal Mitra, Professor, Department of Bengali, Moharaja Sris Chandra College

Copyright © Reserved, 2018

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বইম্যাপিং
প্রথম একক :	**একক-১**
সাহিত্যের রূপ - রীতি	পৃষ্ঠা (1 - 70)
দ্বিতীয় একক :	**একক - ২**
কমলাকান্তের দপ্তর (নির্বাচিত) : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পৃষ্ঠা (71 - 124)
তৃতীয় একক :	**একক - ৩**
ছিন্নপত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পৃষ্ঠা (125 - 188)
চতুর্থ একক :	**একক - ৪**
তিতাস একটি নদীর নাম : অদ্বৈত মল্লবর্মণ	পৃষ্ঠা (189 - 210)

সূচীপত্র

প্রথম একক : **পৃষ্ঠা (1 - 70)**

সাহিত্যের রূপ-রীতি

(ক) কাব্য ও নাটক

(খ) উপন্যাস ও ছোটগল্প

দ্বিতীয় একক : **পৃষ্ঠা (71 - 124)**

কমলাকান্তের দপ্তর (নির্বাচিত) : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় একক : **পৃষ্ঠা (125 - 188)**

ছিন্নপত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্থ একক : **পৃষ্ঠা (189 - 210)**

তিতাস একটি নদীর নাম - অদ্বৈতমল্লবর্মণ

টিপ্পনী

মুখবন্ধ / ভূমিকা

টিপ্পনী

সাহিত্যের রূপ-রীতি ও গদ্যসাহিত্য বইটি থেকে আমরা জানতে পারবে - প্রথম এককে (ক) কাব্য ও নাটক (খ) উপন্যাস ও ছোটগল্প, দ্বিতীয় এককে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর (নির্বাচিত), তৃতীয় এককে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছিন্নপত্রের কিছু বিশেষ পত্র সংখ্যা এবং সবশেষে চতুর্থ এককে অদ্বৈত মল্লবর্মণ - এর তিতাস একটি নদীর নাম সংযুক্ত করা হয়েছে। আশা করি ছাত্রছাত্রীরা বইটা পড়ে উপকৃত হবে এই আশা করি।

প্রথম একক :: সাহিত্যের রূপ-রীতি

বিভাগ - ক

টিপ্পনী

কাব্য ও নাটক :

"প্রকাশই কবিত্ব"

কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এমন মন্তর্ব্যটি শিরোধার্য করে কবিতার স্বরূপ আলোচনায় মগ্ন হতে পারি। ভারতীয় আলংকারিকরা কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আনন্দ বর্ধন বলেছে - 'বাক্য রসাত্মকং কাব্যম্'। অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। কেউ কেউ মনে করেন অলংকৃত বাক্যই কাব্য কিংবা রীতিযুক্ত বাক্য কাব্য। শাস্ত্রবেত্তাদের মতানুসারে বলা যায় - শব্দ ও অর্থ, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার সাহসী - দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষ হল কবিতা।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতা সম্পর্কে অবিস্মরণীয় উক্তি করেছেন - "Poetry the spontaneous overflow of powerful feeling" পন্ডিত স্যামুয়েল জনসন কবিতাকে বলেছেন - "Metrical Composition' অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ রচনা। আর ম্যাথু আর্নল্ডের মতে -"Poetry is at bottom a criticim of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty."

অন্তরের গভীরতল থেকে তুলে আনা মনিরত্নকে শব্দের সাজ পরিয়ে দিয়ে কবিতা তৈরি হয়। তা অনুভববেদ্য জগতে আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে পারি - 'অন্তর হতে আহরি বচন / আনন্দলোকে করি বিচরণ / গীতিরসধারা করি সিঞ্চন / সংসার ধূলিজালে।"

দার্শনিক স্টুয়ার্ট মিল কবিতা কী বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন - "What poetry, the thought and words in which emotion spontaneously embodies itself"?

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

1

যাইহোক না কেন আমরা বোধহয় সন্ত অগাস্টাইনের মতো বলতে পারি - "If not asked, I know ; if you ask me, I know not."

সাহিত্যের এই রূপনির্মিতিটির রহস্যময়তার সঠিক উত্তর এটাই কবিতাতে ক্ষণকাল চিরকালীন হয়ে ওঠে।

"Art for artsake" এবং "Art for lifesake"

টিপ্পনী

- এই দুই বিতর্কের মধ্যে না ঢুকে আমরা কাব্যসত্য সম্পর্কে বলতে পারি কবিতা বস্তুসত্যকে ভাবসত্যে পরিণত করে। আর কাব্যসত্য আমাদের এক চৈতন্যময় অনুভূতির জগতে পৌঁছে দেয়। যে জগৎ অনির্বচনীয় জগৎ। সমালোচক হাডসনের ভাষায় - "By poetic truth we mean fidelity to our emotional apprehension of facts, to the impression which they make upon us, to the feelings of pleasure or pain, hope or fear, wonder or religious reverence which they arouse."

কবিতার নানান রূপ। এই বৈচিত্র্যময়তাকে মূলত দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায় -

(১) মন্ময় কবিতা বা গীতি কবিতা বা Subjective Poetry.

(২) তন্ময় কবিতা বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বা Objective Poetry

যে কবিতা প্রধানত আত্মগত তাকে বলে মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা। এখানে কবি ব্যক্তিমনের উপলব্ধি জগৎ থেকে কবিতার উপলখন্ডকে তুলে আনেন। মন্ময় মূলক কবিতায় কবির মন থাকে অন্তর্মুখী।

আর কবি যদি অন্তর্মুখী না হয়ে বহির্মুখী হন, বস্তুজগৎ তাঁর কবিতার রূপনির্মাণ করে, তবে তাকে আমরা মন্ময়মূলক বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বলতে পারি।

আমরা একটা সারনি তৈরি করে মোটা দাগের বিভাজন করতে পারি কবিতাকে।

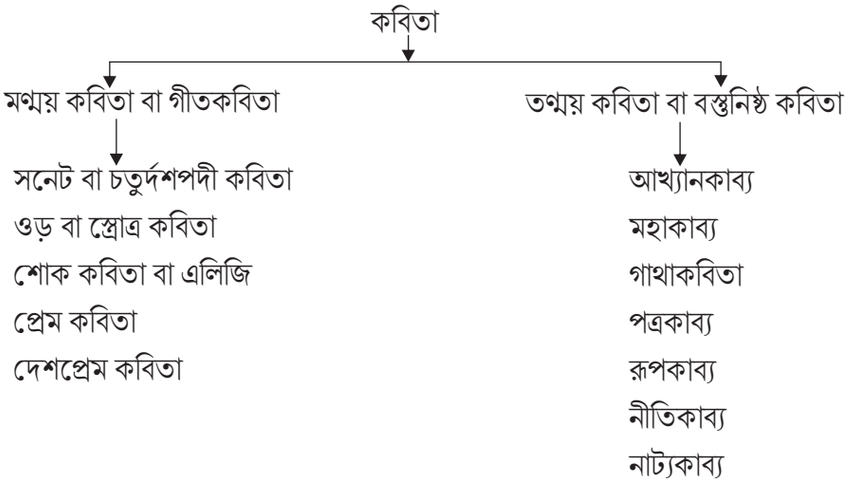

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই শ্রেণীবিভাজন এদিক - ওদিক হতে পারে। যেমন 'পত্রকাব্য বা গাথা কবিতা মন্ময়মূলক কবিতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আখ্যান কাব্য (Narrative Poetry) :

আখ্যান শব্দের অর্থ কাহিনী। কোনো কোনো কাব্য আখ্যান বা কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, একে আখ্যানকাব্য বলে। মূলত কবিকল্পিত বা প্রচলিত বর্ণনাত্মক কাহিনী এর বিষয়। এম. এইচ. আব্রামস বলেছেন - "A narrative is a story, whether told in prose or verse, involving events, characters, and what the characters say and do. Some literary forms such as .... the epic and romance in verse, are explicit narratives that are told by a narrator." [A Hand Book of Literary Terms]

টিপ্পনী

এখান থেকে আমরা আখ্যানকাব্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই সেগুলি হল -

(ক) আদি - মধ্য - অন্ত্য যুক্ত কাহিনী আখ্যানকাব্যের বিষয়।

(খ) ঐতিহাসিক ঘটনা বা রোমান্স বা কবি কল্পিত বিষয় এর কাহিনী।

(গ) নানান চরিত্রের সমাবেশ ঘটে আখ্যান কাব্যে।

(ঘ) তবে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ নয়, প্রাধান্য পায় তার কর্মকান্ড।

(ঙ) আখ্যাণকাব্য বর্ণনাত্মক।

(চ) মূলত বীর ও করুণ রস এ কাব্যের অঙ্গিরস।

(ছ) ছন্দের পরীক্ষা - নিরীক্ষা নয়, প্রচলিত ছন্দেই আস্থাশীল আখ্যাণকাব্যের কবিরা।

মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আখ্যান কাব্যের ধারার সূচনা হয়েছিল। দান্তের ডিভাইন কমেডি, চসারের ক্যান্টারবেরিটলস, কোলরিজের দ্য রাইম অব দ্যাশ এনগিয়েই ম্যারিন্যার ক্রিষ্টাবেল, ওয়ার্ডসওয়ার্থের দ্য সলিট্যারি রিপার কীটসের ইসাবেলা ও দ্য ইভ অব সে অন্টাগনেস ইত্যাদি পৃথিবীখ্যাত কাহিনীনির্ভর কাব্য।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের রচনাগুলি প্রায় সবই আখ্যান নির্ভয় কাব্য। চাঁদ সদাগরের কাহিনী কিংবা কালকেতু - ফুল্লরা উপখ্যান মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়। একইরকমভাবে মধ্যযুগীয় অন্যান্য সাহিত্যও কাহিনী নির্ভর।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

3

আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সূচনালগ্নেই আখ্যানকাব্য ধারার শুরু। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত ধরে এ জাতীয় কাব্যধারার পথ চলা আরম্ভ। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'

(১৮৫৮) সেই অর্থে বাংলার প্রথম আখ্যানকাব্য। এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আখ্যান কাব্যগুলি হল - রঙ্গলালের কর্মদেবী, শূরসুন্দরি, কাঞ্চীকাবেরী, মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমা সম্ভব; ব্রজাঙ্গনা; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরবাহু; নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ, রঙ্গমতী প্রভৃতি।

টিপ্পনী

রঙ্গলাল - মধুসূদন - হেমচন্দ্র - নবীনচন্দ্র - এই চারজন ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি। বাংলা কাব্য - সাহিত্যে যেমন বীরযুগের সূচনা করেছিলেন, তেমনি আখ্যানকাব্যের ধারা পরিপুষ্টি ঘটিয়েছিলেন। এঁদের পরবর্তীকালে গীতকবিতার ধারাটি প্রধান হয়ে উঠল এবং অন্যধারাটির প্রায় অবলুপ্তি ঘটল। রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি (যেমন - দেবতার গ্রাস, পুরাতন ভৃত্য ইত্যাদি) এই ধারার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা শ্রেষ্ঠ আখ্যান কাব্য।

একটি বাংলা আখ্যান কাব্য : পদ্মিনী উপন্যাস :

চিতোরের রানী পদ্মিনীর আত্মত্যাগমূলক কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটি। রাজপুত রানী পদ্মিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূর - দূরান্তে। তা গিয়ে পৌঁছয় দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন খিলজির কাছেও। আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে পেতে চান। কিন্তু তা পাওয়া সহজ নয়। ফলে সম্রাট চিতোর আক্রমণ করেন। পদ্মিনীর প্রৌঢ় স্বামী ভীমসিংহ প্রবল লড়াই করেন। আর রাণি পদ্মিনী অন্যান্য রাজপুত বধূদের নিয়ে জহরব্রতে আত্মবিসর্জন দেন।

এই কাব্যের মধ্য দিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের কবি রঙ্গলাল দেশবাসীর মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। রানা ভীমসিংহের সেই বিখ্যাত উক্তিটি আজও স্মরণীয় -

"স্বাধীনতাহীনতা কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

4

'পদ্মিনী উপাখ্যানের বিষয় ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এ কাব্য আদি - মধ্য - অন্ত্য যুক্ত কাহিনী কাব্য। এই কাব্যটি অবশ্যই বর্ণনাত্মক। চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে তাদের ক্রিয়াকলাপ। বাংলা কাব্যে বীরযুগের সূচনা 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটি দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কবি মূলত প্রচলিত ছন্দকেই ব্যবহার

করেছেন , নতুন কোনো ছন্দ প্রয়োগ করতে পারেননি । ফলে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটিকে সার্থক আখ্যানকাব্য বলা যেতে পারে।

মহাকাব্য :

টিপ্পনী

জাতির জীবন যে মহৎ কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তাকে মহাকাব্য বলে। দেশকালের এক সামগ্রিক রূপধরা পড়ে মহাকাব্যে। ইংরেজি Epic এর বাংলা প্রতিশব্দ মহাকাব্য। Epic শব্দটি এসেছে গ্রীক Epicos বা Epos থেকে। Epic হচ্ছে দীর্ঘ বীরগাথা। উচ্চ আদর্শযুক্ত এক নায়কদের মহিমোজ্জল কীর্তির মধ্যে দিয়ে জাতীয় জীবনের এক সংহত কাহিনী মহাকাব্যের রূপ লাভ করে।

গ্রীক দার্শনিক অভারিস্টটল মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁর 'Poetics' নামক গ্রন্থে তেইশ ও চব্বিশ আধ্যায়ে। সেখানে তিনি বলেছেন - "They should be based on a single action, one that is complete whole in itself, with a beginning, a middle, and an end so as to enable the work to produce its own proper pleaser with all the organic unity of a living creature ..... As for its metre, the heroic has been assigned to it from expearience."

ড্রাইডেন বলেছেন - " A heroic poem which epitomises the feeling of many ages and voices the aspirations and imagination of all people."

এম এইচ আব্রামস্ এবং জিওফ্রে হারফাম মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন - "In its srtict seuse the term epic or heroic poem is applied to a work that meets at least the following criteria; it is a long verse narrative on a serious subject, told in a formula and elevated style, and centered on a heroic or quasi divine figure on whose actions depends the fate of a tribe, a nation, or the human race."

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

মহাকাব্যকে দুভাগে ভাগ করা হয় ধ্রুপদী মহাকাব্য বা Classical Epic এবং সাহিত্যিক বা আলংকারিক মহাকাব্য বা Literary Epic । সারা বিশ্বে চারটি ধ্রুপদী মহাকাব্য আছে। গ্রীকভাষায় লেখা হোমারের ইলিয়ড় ও ওড়িসি এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসদেবের মহাভারতের।

প্রাচ্য আলংকারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছে । আচার্য দন্ডী

টিপ্পনী

'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছে। সেই আলোচনানুসারে প্রাচ্য বা সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে মহাকাব্যের লক্ষণগুলি হল -

(ক) মহাকাব্যের কাহিনীর বিষয় হবে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক।

মাহাকাব্য সর্গবন্ধে লিপিবদ্ধ হবে।

(গ) মহাকাব্যে অষ্টাধিক সর্গ থাকবে এবং ত্রিশ বা তার কম সংখ্যক সর্গ বা অধ্যায় থাকবে।

(ঘ)অধ্যায়গুলিকে অন্তত পঁচিশটি শ্লোক থাকবে। উর্ধপক্ষে তিনশটি শ্লোক থাকতে পারে।

(ঙ) সর্গগুলি আলাদা শিরোনাম থাকবে। নামকরণ করা হবে সর্গের বিষয় অনুযায়ী।

(চ) আশীর্বচন, নমস্কার, প্রার্থনা থাকবে সর্গের সূচনাতে।

(ছ) বর্ণনাত্মক কাহিনিতে থাকবে সর্গ-মর্ত্য -পাতালের বর্ণনা, থাকবে ছয় ঋতু ও সংস্কৃতির বর্ণনা, থাকবে যুদ্ধ - বিগ্রহের বর্ণনা।

(জ) সাধারণত একটি সর্গ একটি ছন্দেই লিপিবদ্ধ হবে।

(ঝ) মহাকাব্যের মূলরস বীর বা শৃঙ্গাররস, কখনও আবার শান্তরস।

(ঞ) মহাকাব্যের নায়ক হবে ধীরোদাত্ত, মহৎ, উদার, সদবংশজাত চরিত্র।

(ট) মহাকাব্য পাঠ করে ধর্ম- অর্থ-কাম-মোক্ষ - চতুর্বর্গ ফললাভ হবে।

(ঠ) মহাকাব্যের ভাষা হবে গুরুগম্ভীর, অলংকারিক, ওজস্বী।

পাশ্চাত্য আলংকারীগণ বিশেষত অভারিস্টটলেত 'Poetis' অনুযাবী মহাকাব্যে লক্ষণগুলি হল -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

6

(১) মহাকাব্য হবে জীবনের অনুকরণ।

(২) এক বিশাল ব্যাপ্ত পটভূমিতে অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বিস্তৃত হবে মহাকাব্য।

(৩) আদি - মধ্য - অন্ত্য যুক্ত বিবৃতিমূলক সুসংবদ্ধ কাহিনী থাকবে মহাকাব্যে।

(৪) মহাকাব্যে থাকবে যুদ্ধ বিগ্রহ, অতিপ্রাকৃত, অসম্ভব কার্যের বর্ণনা।

(৫) মহাকাব্যের নায়ক হবে উচ্চবংশজাত বিশিষ্ট মানুষ বা জাতীয় বীর।

(৬) স্থান - কাল - পাত্রের ঐক্য থাকা জরুরী।

(৭) মহাকাব্যের ভাষা হবে ওজাস্বিতাপূর্ণ, গম্ভীর। ছন্দ মূলত Heroic matre বা বীর্যব্যাঞ্জন। শৈলীর গাম্ভীর্য এবং অলংকারের বিস্তার ঘটবে মহাকাব্যে।

(৮) এর রস মূলত বীররস।

টিপ্পনী

একটি আদি মহাকাব্য : মহাভারত

ব্যাসদেব লিখিত মহাভারত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে - 'যা নেই ভারতে তানেই ভারতে'। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে ধারণ করে থাকে মহাভারত একটি যথাযথ অর্থে মহাকাব্য হয়ে উঠেছে।

আঠারো পর্বের বিস্তৃত কাব্য মহাভারত হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি-র মিলিত আকারের থেকেও আটগুণ বড়। অর্থাৎ প্রাচ্য আলংকারিকদের মতানুসারে এটি অষ্টাধিক অধ্যায় বিশিষ্ট মহাকাব্যের লক্ষণ যুক্ত।

মহাভারতের কাহিনীর উৎস বেদের নানান অংশ, সংহিতা, গাথা ইত্যাদি। এগুলি পৌরাণিক কাহিনী। সেই সঙ্গে মহাভারতের কাহিনী বীরত্বব্যাঞ্জক।

মহাভারতের আঠারো পর্বের প্রতিটির আলাদা আলাদা শিরোনাম আছে - (১) আদি পর্ব (২) সভা পর্ব (৩) বর্ণপর্ব, (৪) বিরাট পর্ব (৫) উদ্যোগপর্ব, (৬) ভীষ্ম পর্ব (৭) দ্রোণপর্ব (৮) কর্ণপর্ব, (৯) শল্যপর্ব (১০) সৌপ্তিক পর্ব (১১) স্ত্রী পর্ব (১২) শান্তিপর্ব (১৩) অনুশাসন পর্ব (১৪) আশ্বমেধিক পর্ব (১৫) আশ্রমিক পর্ব (১৬) মৌষল্য পর্ব (১৭) মহাপ্রস্থানিক এবং (১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব।

বিশাল এই মহাকাব্যটিতে আছে অনেক উপকাহিনী। এই উপকাহিনীগুলি মূল কাহিনীকে পরিপূর্ণ করেছে এবং এর ব্যাপ্তিকে বাড়িয়ে তুলেছে। এই বিস্তৃতি যেন জাতীয় কাব্যের বিস্তৃতি যেন জাতীয় কাব্যের বিস্তৃতি দান করে।

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, শল্য, শকুনি, ধৃতরাষ্ট্র, অভিম্যু, দ্রোপদী, কুন্তী, গান্ধারী এবংআরও সব চরিত্র সবই রাজকীয় চরিত্র। সমাজের উচ্চবর্ণ থেকে এদের আগমণ। এরা আদর্শচরিত্র। কৃষ্ণ-অর্জুন-ভীষ্ম-যুধিষ্টিরের তো মহৎ, আদর্শবান, ধীর, উদার চরিত্র অন্যত্র অপ্রতুল।

টিপ্পনী

মহাভারতের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যেন শুভ - অশুভের এটা আড়াআড়ি বিভাজন ঘটিয়েছে। সমগ্র আখ্যান জুড়ে কখনও যুদ্ধের আবহ। কখনও শান্ত সমাহিত। তাই বলা যেতে পারে এ কাব্যের মূলরস বীররস ও শান্তরস।

মহাভারতের ভাষা মহাকাব্যিক ওজস্বিতাপূর্ণ। বিষয় প্রয়োজন ও চরিত্রানুসারে ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার করেছেন কবি।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনাংশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে জ্ঞানদান করেছিলেন তাই গীতা নামে পরিচিত। এই গীতার যেন শুধু হিন্দু ধর্মের নয়, ভারতবর্ষের দর্শনের পথ তৈরি করে দিয়েছে। এই বিশাল মহাকাব্যটি একই সঙ্গে পাঠককে ধর্ম - অর্থ - কাম - মোক্ষ এই চতুবর্গের আসগবাদ দেয়।

সব মিলিয়ে রামায়ণ - মহাভারত শুধুমাত্র মহাকাব্য নয়, ভারতবর্ষের পুরাণ - ইতিহাস সম্বলিত জাতীয় কাব্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। প্রাচ্য আলংকারিকেরা এগুলি পড়েই মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। আলংকারিকদের বৈশিষ্ট্য অনুযাবী তাঁরা কাব্য লেখেননি।

সাহিত্যিক মহাকাব্য :

মহাকাব্য দু প্রকারের - আদি বা ধ্রুপদী বা প্রাচীন মহাকাব্য (Authentic Epic বা Epic of Growth) এবং সাহিত্যিক বা আলংকারিক মহাকাব্য (Literary Epic বা Epic of art) । আমরা আগেই আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছি যে, আদি মহাকাব্য প্রাচীনযুগের সৃষ্টি এবং আধুনিক যুগের অবদান সাহিত্যিক বা আলংকারিক মহাকাব্য।

প্রাচ্য বা সংস্কৃত আলংকারিকেরা সাহিত্যিক মহাকাব্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি এরকম -

(১) মহাকাব্য সর্গবদ্ধে রচিত হবে।

(২) সর্গ সংখ্যা হবে নয় বা ততোধিক এবং ত্রিশ বা তার কম।

(৩) মহাকাব্যের সূচনায় নমস্ক্রিয়া, আশীর্বচন ইত্যাদি থাকবে।

(৪) এর বিষয়বস্তু হবে পুরাণকেন্দ্রিক।

(৫) প্রতিটি সর্গের আলাদা শিরোনাম থাকবে। সর্গের বিষয়ানুযায়ী এর নামকরয়ণ

করা হবে।

(৬) মহাকাব্যের পটভূমিতে থাকবে স্বর্গ - মর্ত্য - পাতাল।

(৭) প্রকৃতি, ঋতু, মানব জীবনের নানা দিক ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে।

(৮) প্রধানরস হবে - বীর, শৃঙ্গলা কিংবা শান্ত-র কোন - একটি। অন্য গুলি অঙ্গিরস।

(৯) প্রতিটি সর্গ একই ছন্দে লেখা হবে। তবে সর্গের শেষে আন্য ছন্দ থাকতে পারে।

(১০) মহাকাব্যের নায়ক হবে ধীর ও উদত্ত, উচ্চবংশীয়, বীর - সবমিলিয়ে আদর্শ চরিত্র।

(১১) মহাকাব্যের ভাষা স্বভাবতই ওজস্বিতাপূর্ণ, গম্ভীর, অলংকারমন্ডিত হবে।

(১২) মহাকাব্য পর্বে চতুবর্গ - ধর্ম - অর্থ - কাম - মোক্ষ - ফল লাভ হবে।

সাহিত্যিক মহাকাব্য একক ব্যাক্তির সৃজন। এটি আধুনিক সৃষ্টি। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সাহিত্যিক মহাকাব্য রচিত হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় টালমাটাল পটভূমি, সাহিত্যিক মহাকাব্য গড়ে ওঠার উৎসভূমি। যেহেতু যুগ পরিবর্তন ঘটেছে তাই কবি মানসের পরিবর্তন ঘটে। চিন্তনের গভীরতা এবং প্রয়োগের জটিলতা ঘটে এখানে দেখা যায়। সমকালীন জাতির জীবনচর্যা ধরা পড়ে এখানে। প্রকাশ পায় কবির শিল্প দক্ষতা। সমালোচক হাডসনের ভাষায় বলতে পারি - "The Epic of Art is learned, antiquarian, bookish, imitative." অর্থাৎ মার্জিত, রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত জীবনকেই আনুসরণ করে সাহিত্যিক মহাকাব্য। এর সঙ্গে মনে রাখার যে, সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আলংকারিক মহাকাব্যে করুণ রসও অঙ্গিরস হতে পারে। তবে কাহিনী হবে সুসংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত, শিথিলতা বর্জিত।

আমাদের দেশে প্রচুর মহাকাব্য লেখা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত বাদ দিলে আলংকারিক মহাকাব্যের মধ্যে পড়ে। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে লেখা আশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ', চতুর্থ শতকে লেখা মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম' ও 'কুমারসম্ভবম', ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারবীর 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম', কুমার দাসের 'জানকীহরণ' ইত্যাদি। এছাড়া আছে ভট্টিকাব্য - রাবণবধ বা মাঘের 'শিশুপালবধ'।

ভার্জিনের 'ঈনীড' কে আমরা আরও পাশ্চাত্য আলংকারিক মহাকাব্যের প্রথম নিদর্শন বলতে পারি। এছাড়া আরও উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল - দান্তের 'দিভিনা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কোমেদিয়া', স্পন্সারের 'দ্য ফেয়ার ক্যুইন', টমাস হার্ডির 'ডাইনাস্টাস', মিলটসের 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'প্যারাডাইস রিগেন' এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেট' । প্রাচ্যের অন্যান্য ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের ইরানীয় ভাষায় 'জেন্দ - আবেস্তা', পহ্লবী সাহিত্যে 'য়াৎকার -ই জারিয়ানা' পারসী সাহিত্যে কবি ফিরদৌসীর 'শাহনামা' ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় আধুনিক যুগের সূচনা উনিশ শতকে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম আখ্যান কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' একই সঙ্গে বাংলা কাব্যে বীরযুগের আরম্ভ করেছিল। তিনি 'কর্মদেবী', 'কাঞ্চিকাবেরী', 'শূরসুন্দরী'র মতো আখ্যানকাব্য লিখলেও সাহিত্যিক মহাকাব্য লিখতে পারেননি। সে সম্মান প্রথম অর্জন করেন মাইকেল মধূসুদন দত্ত। 'তিলোত্তমা সম্ভব' নামক আখ্যানকাব্যের পর্ব পার হয়ে এসে মধুসূদন লিখলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। 'মেঘনাদবধ' কাব্যই বাংলার প্রথম সাহিত্যিক মহাকাব্য। এরপর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'বৃত্রসংহার'। তিনখন্ডের এই বিশাল মহাকাব্যটি সমসময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আরেক কবি নবীনচন্দ্র সেন লেখেন ত্রয়ী মহাকাব্য - রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস। তারপরের বাংলা কাব্যসংসার রবীন্দ্র শাসিত। গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ গুরু বলে মনে করতেন। ফলে গীতিকবিতা অনাগত ভবিষ্যৎ দলে মহাকাব্যের ধারা ক্রমে শুকিয়ে আসে।

একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের আলোচনা :

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মহাকাব্যটি হল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য। আমরা লক্ষণ মিলিয়ে দেখতে পারি 'মেঘনাদবধ' কতটা সার্থক মহাকাব্য হয়ে উঠেছে।

(১) 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' আছে নয়টি সর্গ। অর্থাৎ প্রাচ্য আলংকারিকদের মতে এটি মহাকাব্যের আয়তন যুক্ত।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
10

(২) মধুসূদন দত্ত প্রতিটি সর্গের সমাপ্তিতে সর্গের একটি করে শিরোনাম দিয়েছেন। যেমন - 'অভিষেক নামঃ প্রথম সর্গ সমাপ্ত'। এরকমভাবে দ্বিতীয় সর্গ 'উদ্যোগ', তৃতীয় সর্গ 'সমাগম' ইত্যাদি নামকরণ করেছেন যা লক্ষণ সম্মত। নামকরণগুলি করা হয়েছে সর্গের বিষয়বস্তুভিত্তিক।

(৩) 'মেঘনাদ বধ' এর সূচনাতে কবি মধুসূদন দেবী সরস্বতীর বন্দনা করেছেন,

প্রণাম জানিয়েছেন বাল্মীকিকে।

(৪) 'মেঘনাদ বধ' এর আখ্যানবস্তু নেওয়া হয়েছে মহাকাব্য 'রামায়ণ' থেকে। রামায়ণের লঙ্কাকান্ডের তিনদিন দু রাত্রি কাহিনী এখানে স্থান পেয়েছে। রাবণ - চিত্রাঙ্গদার পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু বর্ণনা থেকে মেঘনাদের চিতায় স্বর্ণমঠ তৈরীর কাহিনি। দ্রুতগতিতে ধাবমান আখ্যান কাহিনী পুরাণকেন্দ্রিক।

(৫) 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের পটভূমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিস্তৃত মর্তলোকে ঘটেছে মূল কাহিনী। ঘটনার প্রয়োজনে দ্বিতীয় সর্গে এসেছে স্বর্গ, অষ্টম সর্গে নরক এবং প্রথম সর্গে পাতাল এর প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ প্রাচ্যালংকারিকদের স্বর্গ - মর্ত্য - পাতালের পটভূমির শর্ত রক্ষিত হয়েছে।

(৬) 'মেঘনাদ বধ' শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা নেই, আছে প্রকৃতির চিত্র, চিত্রকল্প এবং মানব জীবনচর্যার নানাদিক।

(৭) 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' - এসব কথাই কাব্যের প্রথম সর্গে বলেছেন কবি। অর্থাৎ বীররস এর প্রধান রস। তবে বাঙালীর হৃদয় ব্যাকুল কবি করুণরসকে ফল্গুধারার মতো বইয়ে দিয়েছেন।

(৮) বাংলা কাব্যকে মধুসূদন দত্ত নতুন ছন্দ উপহার দিয়েছেন - অমুত্রাক্ষর ছন্দ। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে ভাবানুসারী এই ছন্দ প্রথম থেকে শেষ অবধি ব্যবহৃত। মিলটনের 'Blank verse' ছন্দের আদলে বাংলা পয়ারে ছন্দকে ভেঙে অমিত্রাক্ষর করলেন মধুসূদন। এই ছন্দ যথেষ্ট ভাবগম্ভীর।

(৯) 'মেঘনাদবধ' এর নায়ক রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র নন। বরং তথাকথিত ভিলেন রাবণ এ কাব্যের নায়ক। তাঁর Doing ও Suffering আমেদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বরাবণ স্বর্ণলঙ্কার রাজা। যে শুধু উচ্চবংশীয়ই নয়, বীর এবং উদাত্ত ও। সবমিলিয়ে তিনি রুচিমান জাতির নায়ক। তাই তাঁর নায়ক হতে কোনো বাধা নেই।

(১০) মধুসূদন ওজাস্বিতাপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'মেঘনাদ বধ' এর ভাষা মহাকাব্যোচিত গুরুগম্ভীর। এই ভাষা একটা অনুরণন সৃষ্টি করে। অলংকার প্রয়োগেও তিনি গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন - 'লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে'। এ বাক্যে শুধু ছেকানুপ্রাস নেই, আছে অন্তর্নিহিত সত্যও। এছাড়া উপমা -উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহার করেছেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(১১) পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে মধুসূদন সমকালীন যুগজীবনকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের পরাধীন দেশের অন্তরের স্বর এখানে প্রতিফলিত।

উপরোক্ত এই লক্ষণগুলি বিচার করে আমরা বলতে পারি মাইকেলের 'মধুসূদন বধ কাব্যটি' যথার্থ সাহিত্যিক মহাকাব্য। এটাই বাংলার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।

সনেট (Sounet) :

কবিতার একটি নির্দিষ্ট রীতি হল সনেট। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে সনেট হল এক জাতীয় গীতিকবিতা। বংলায় সনেটকে চতুর্দশপদী কবিতা বলা হয়। চোদ্দ অক্ষর বা মাত্রাযুক্ত পংক্তি বিশিষ্ট, চোদ্দ পংক্তির গীতিকবিতাকে সনেট বলা হয়। M.H. Abrams এর ভাষায় - "A lyric poem consisting of a single stanza of fourteen iambic pentameter lines linked by an intricate rhyme scheme.

সনেট মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত মূলত পয়ার ছন্দে লিকিত। তবে মনোরাখতে হবে যে, সব চতুর্দশপদী কবিতাই সনেট নয়। তবে সনেটের বন্দন কাঠিন। তার জন্যই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন -

"ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্দন
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।।"

অর্থাৎ সনেটে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সুদৃঢ় আন্তরিক যোগ থাকার প্রয়োজন।

ইতালীয় শব্দ Sonetto থেকে Sonnet শব্দটির উৎপত্তি। ল্যাটিন শব্দ Sonus এর অর্থ হল শব্দ Sound। সেখান থেকে Sonetto - র উদ্ভব। Sonetto -র অর্থ ছোট শব্দ বা গান। জিয়াকোমো ডা লেন্টিনি (Giacomo De Lentini) সনেটে উদগাতা বলে মনে করেন কেউ কেউ। গিডট্টন দ্যা অ্যারেৎসো (Guittone d' Arezzo) একাদশ শতাব্দীতে এটি পুনপ্রচলিত করেন। ফ্রেডরিক (দ্বিতীয়) -এর আমলে সিসিলিয়ান (Sicilian) স্কুল -এর প্রধান ছিলেন লেন্টিনি। আর আরেৎস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মিও - সিসিলিয়ান (Neo Sicilian) স্কুল (১২৩৫ - ১২৯৪ খ্রিঃ)। অভারেৎসা প্রায় আড়াইশটি সনেট রচনা করেছিলেন। সমসাময়িক কবি দান্তে বা গিৎদো কাভালকন্টি সনেট রচনা করেছিলেন কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর কবি ফ্রান্সেস্কো পেত্রার্কার কলমে সনেট বিশেষ মহিমা লাভ করে। বাংলা সনেটের উদ্ভব ইতালীয় সনেটতে বা পেত্রাকার সনেট থেকে।

সনেটের মূলত তিনটি প্রচলিত -

(১) ইতালিয়ান বা পেত্রার্কীয় সনেট (Italiaon or Petrachan Sonnet)

(২) স্পেনসারীয় সনেট (Spenserian Sonnet)

(৩) শেক্সপীরীয় সনেট (Shakesperean Sonnet)

এআড়া মিলটনীয় সনেট (Mioltonic sonnet), তের্জা রিমা সনেট (Terza Rima Sonet) এবং কার্টাল সনেট (Curtal Sonnet) ও উল্লেখযোগ্য।

পের্ত্রাকীয় বা ইতালীয় সনেট সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। এমনকী দান্তেও তার সনেটগুলি পের্ত্রাকীয় রীতিতেই লিখেছেন। এই ধরণের সনেট এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(ক) চোদ্দ পংক্তি আট ও ছয় পংক্তির স্তবকে বিভক্ত থাকে। প্রথম আট পংক্তি অষ্টক এবং শেষ ছয় পংক্তি ষটক নামে পরিচিত।

(খ) প্রথম আট পংক্তিতে থাকে ভাবেদর উপস্থাপন এবং ঢ়টকে এই ভাবের বিস্তার ঘটে।

(গ) এতে অন্ত্য মিল থাকে। অষ্টকের অন্ত্য মিল এরকম হয় - কখ খক কখ খক বা কখ কখ কখ কখ। ষটকের ক্ষেত্রে অন্ত্য মিল গঘঙ বা গঘ গঘ গঘ বা গঘগ গঘগ বা গঘ ঘগ ঙঙ ইত্যাদি।

(ঘ) অষ্টক থেকে ষটকে যাবার সময় কবির যোজনা বা সময়ের (ইতালীয় ভাষায় Volta) পরিবর্তন ঘটে। স্যার এডমন্ড স্পেনসার (Edmund Spenser) প্রথম কবি যিনি পের্ত্রাকীয় রীতিথেকে সরে এসে নতুন রীতি তৈরি করলেন দুটির বদলে চারটি স্তবক হল - তিনটি চার পংক্তির এবং একটি দুই পংক্তির চৌপদীগুলিতে আলাদা আলাদা ভাবের হলেও তাদের মধ্যে অন্তর্বিহিত যোগ লক্ষ্য করা যায়। শেষের দুই পংক্তিতে আছে আলাদা ভাব বা মন্তব্য। অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে দেখা গেল কখ কখ - খগ খগ - গঘ -গঘ- ঙঙ।

ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়র কবি হিসাবেও বিশেষ বিখ্যাত। তিনি ১৫৪ টি সনেট লিখেছিলেন। সনেটগুলি বৈশিষ্ট্য অনেকটা স্পেনসারীয় রীতির। তাঁর সনেটের স্তবক চারটি - তিনটি চারপংক্তির এবং একটি দুই পংক্তির। চার পংক্তির স্তবকগুলি চতুষ্ক বা চৌপদী এবং দুই পংক্তির স্তবকগুলি দ্বিপদী নামে পরিচিত।

টিপ্পনী

চৌপদীগুলিতে ভাবের একটা অন্তর্নিহিত মিল আছে। শেক্সপীয়র রূপক ব্যবহার করেছেন সুপরিণতি লাভ করেছে। এই রীতির সনেটের অন্ত্যমিল এরকম কখকখ - গঘগঘ - ঙচ ঙচ - ছছ।

টিপ্পনী

বাংলায় সনেটের উৎস মুখের সূচনা কবি মধুসূদন দত্তের হাত ধরে। তিনিই প্রথম পেত্রার্কার সনেট অনুসরণে বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতাবলী লেখেন। তিনি কিছু শেক্সপীরীয় রীতির সঙ্গেও লিখেছিলেন। মধুসূদন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রমথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ, জয় গোস্বামী প্রমুখ কবিরা বাংলা সনেটে রঙ ছড়িয়েছেন ।এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে যে একশটি সনেট লিখেছিলেন তাতে তিনি নানাধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন । তা ইতালীয় বা শেক্সপীয়ীর রীতিকে ছাপিয়ে আরও অন্যরকমের হয়েছে। স্তবক বিন্যাস কখনও আট ছয়, কখনও চার চার ছয়, কখনও ছয় ছয় দুই, কখনও চার চার চার দুই কখনও আট চার দুই, কখনও সাত সাত , কখনও বা দশ চার।

প্রমথ চৌধুরীর হাত ধরে বাংলায় ফরাসী ধারার সনেটের প্রবেশ। এর স্তবক আট দুই চার।

বাংলা ভাষার সনেট :

বাংলা সনেট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মধুসূদন দত্তকে বাদ দেবার কোনো উপায় নেই। চতুর্দশপদী কবিতা লিখবার আগেই বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন একটি চিঠিতে লিখেছিলেন - "I want to introduce the sonnet into our language." চিঠিতেই তিনি 'মার্তৃভাষা' কবিতাটি লিখে পাঠান। এবং সেইসঙ্গে বলেন - " In my opinion if cultivated by men of genious, our sonet in time world rival the Italian".

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

14

আমরা আগেই আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছি যে, মধুসূদন পেত্রার্ক এবং শেক্সপীয়র উভয় রীতিকে অনুসরণ করেছেন। এখানে আমরা তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি উল্লেখ করতে পারি -

হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন ;-
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর - ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি -
ফেলিনু শৈবালে ; ভুলি কমল কানন
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে -
"ওরে বাছা মাতৃ - কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; আইলাম কালে
মাতৃভাষা - রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

টিপ্পনী

আলোচ্য কবিতাটিতে কবি বাংলা ভাষায় কীভাবে লিখতে শুরু করলেন তা ব্যক্ত করেছেন। অন্য ভাষার দ্বার ঘুরে শেষ অবধি মাতৃভাষাররত্নের চরণে আশ্রয় নেবার কথা বলেছেন।

এখানে চোদ্দটি পংক্তি আছে। প্রতিটি পংক্তি ৮ + ৬ মাত্রার পর্বে বিভক্ত পয়ার ছন্দে রচিত।

চোদ্দটি পংক্তিকে আট ছয় স্তবকে বিন্যস করা যেতে পারে। অষ্টকে যে ভাবের প্রকাশ। ষটকে তারই বিস্তার ঘটেছে। অন্ত্যমিল কখ কখ কখ কখ, গঘ ঘগ ঙঙ।

বিষয়টি সংহত ও স্পষ্টভাবে পাঠকের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। তাই সব মিলিয়ে এটিকে সার্থক সনেট বলতে পারি। এটি ইতালীয় সনেটের অনুসরণে লেখা।

গীতিকবিতা (Subjective Poetry):

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

15

'গানই যে কবিতার উদ্দেশ্য তাই গীতিকবিতা'

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গীতিকবিতা সম্পর্কে এমন মন্তব্য বুঝিয়ে দেয় যে কবিতার মধ্যে গানের সুরের ধারা বহমান তাই গীতিকবিতা। গীতিকবিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Lyric। এই শব্দটি এসেছে গ্রীক Lyre শব্দ থেকে। Lyre মানে বীনা জাতীয়

টিপ্পনী

বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন গ্রীসে রাখাল বালকের দল Lyre বাজিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত আবেগ - অনুভূতিকে গান গেয়ে প্রকাশ করতে। সেই গানই Lyric নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে গানের সাহায্যে কবিতাকে উপস্থাপিত করা হত। অর্থাৎ গান হয়ে উঠেছে কবিতার আত্মা। গীতিকবিতা মন্ময়মূলক কবিতা। এম. এইচ. আব্রামসন্ ও জিওফ্রে হরফাম তাঁদের Literary Terms বইয়ে বলেছেন - " ..... a lyric is any fairly short poem, uttered by a single speaker, who expresses a state of mind or a process of perception, thought and feeling."

অর্থাৎ ছোট একটি কবিতার মধ্যে একটি মাত্র ভাবের বিকাশ ঘটে গীতিকবিতায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (Encyclopedia Britannica) -য় বলা হয়েছে - "Lyric, a verse or poem that is, or supposedly is, susceptible of being sung to the accompaniment of a musical instrument (in ancient times usually a lyre) or that expresses intense personal emotion in a manner suggestive of a song. Lyric poetry expresses the thoughts and feelings of the poet and is sometimes contrasted with narretive poetry and verse drama which relate events in the form of a story."

ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন - "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, it takes its orgin from emotion recollected in tranquillity."

অন্যদিকে পি. বি. শেলি বলেছেন - "Poetry is indeed something divine"

রবার্ট ফ্রস্টের মতে - "Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words".

কহলিল জিব্রান কবিতা বলতে বোঝেন - "Poetry is a deal of joy and pain and wonder, with a dash of the dictionary."

গীতিকবিতা কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। এমন কথা আমরা জানলেও আধুনিক কবি টি. এস. এলিয়ট বললেন - "Poetry is not a turtling loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality."

অবশ্য একই সঙ্গে এলিয়ট বলেছেন - "But of course, only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things."

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'গীতিকাব্য' নামক প্রবন্ধে গীতিকবিতা সম্পর্কে বলেছেন - "বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফূটন মাত্র যার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"

সব মিলিয়ে আমরা গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী তা দেখে নিতে পারি -

(ক) ভাবগত বৈশিষ্ট্য -

গীতিকবিতা নির্জন এককের গান। একলা কবির ব্যক্তি অনুভূতির চিত্রলিপি গীতিকবিতা। কবি নিজেকে উন্মুক্ত করে দেন এখানে। হৃদয়ের উৎসমুখ থেকে বাণী নিঃসৃত হয়। কবির হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, হতাশা-আক্রোশ। আভিমান - অভিযোগ, ক্ষোভ - ঘৃণা, চাওয়া - পাওয়া - না পাওয়া - সব কিছু শব্দের অক্ষরে ছন্দোবদ্ধ হয় গীতিকবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই অবিস্মরণীয় উক্তিটি এখানে আবারও বলতে হয় - "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings.

(খ) অঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য :

গীতিকবিতা হবে সংহত, সংযত। আল্প একটুর মধ্যে বৃহতের ইশারা ধ্বনিত হবে। কবিতা হবে সংগীতধর্মী। প্রাচীনকালে Lyre বা বীনাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র যেমন Lyric এর সঙ্গী ছিল। তেমনি আজও গীতিকবিতার অন্তরে একটা সুর ধ্বনিত হয়। আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্যের মতো বৃহদায়তন তো নয়ই, এমনকী আদি - মধ্য - অন্ত্য বিশিষ্ট হবে না।

এম . এইচ. আব্রামস্ আধুনিক গীতিকবিতা সম্পর্কে বলেছেন - "In the original Greek, "lyric' signified a song rendered to the accompaniment of a lyre. In some current usage, lyric still retains the sense of a poem written to be set to music, the hymn." আধুনিক যুগে গানের কথাকে লিরিক বলা হয়। এবং আমরা জানি যে , বব ডিলান একজন বিখ্যাত সংগীতকার। তিনি ২০১৬ -র সাহিত্য বিভাগের নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন তাঁর গানের কথার জন্য অর্থাৎ Lyric এর জন্য। তবে গান ও কবিতার পথ আজকে খনিকটা সরে এসেছে। কিন্তু গীতিকবিতার মূল ব্যক্তিমনের স্বতোৎসারিত ভাবোচ্ছ্বাস। এই ব্যক্তিমনটিকে অবশ্য রোমান্টিক হতে হবে। আর রোমান্টিকতার লক্ষণগুলি হল - আত্মমগ্নতা, বিষণ্ণতা, প্রকৃতি - প্রেম, মানব - প্রেম,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সৌন্দর্য - প্রেম, অতীতের প্রতি আকর্ষন, সুদূরের প্রতি আকর্ষন, বিস্ময়বোধ, অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার, বিদ্রোহী চেতনা, আদর্শবাদ, আবেগপ্রিয়তা, সংগীত প্রিয়তা ইত্যাদি।

গীতকবিতা তথা Lyric কে ইংরেজ তাত্ত্বিকরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন - সনেট ওড. এলিজিও ড্রামাট্রিক মোনোলন। আধুনিকযুগে আরও কয়েকটি শ্রেণী যুক্ত হতে পারে - প্রেম বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, স্বদেশপ্রেম বিষয়ক, আধ্যাত্মিক, বিষাদাত্মক, চিন্তামূলক।

(ক) প্রেম কবিতা :

আবহমানকাল ধরে দেশকাল ভাষা নির্বিশেষে কবিতার অন্যতম প্রধান উপজীব্য বিষয় নরনারীর প্রেম। মানব - মানবীর ভালবাসাকেন্দ্রিক রাগ - অনুরাগ বীতরাগের জন্ম। এই আকর্ষণ বিকর্ষণের কাহিনীও প্রেম বিষয়ক কবিতার উৎসকেন্দ্র।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সঙ্গীতশতক', 'প্রেমপ্রবাহিনী' দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় কবিতার সূচনা। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতা, কিংবা বিশ শতকের, তিরিশের দশকের কবিদের কবিতায় প্রেম অন্যতম প্রিয় বিষয়। উনিশ শতকের গীতিকবিদেরও অন্যতম প্রধান অবলম্বন প্রেম। রবার্ট ব্রাউনিং এর 'Last Ride Together' রবীন্দ্রনাথের 'আশঙ্কা' জীবনানন্দের 'বনলতা সেন', 'সুচেতনা' জয়গোস্বামীর 'মালতিবালা বালিকা বিদ্যালয়' প্রভৃতি এই জাতীয় কবিতার উদাহরণ।

(খ) প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা :

প্রকৃতির রূপ মুগ্ধ কবিরা তাদের হৃদয়ে অনুভব করেন নিসর্গ চেতনাকে, স্পর্শ করেন তার গভীরতাকে। প্রকৃতির রূপ - রস - স্পর্শ - শব্দ - গন্ধ - বর্ণ এর ডালি সাজিয়ে বসে আছে। আর কবিরা তাতে আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে ভাষায়, প্রকাশ করেছেন। সেই প্রাচীনকাল থেকেই নিসর্গ কবিদের প্রিয় বিষয়। ওয়ার্ডওয়ার্থের 'লুসি পোয়েমর্স' এই জাতীয় কবিতার উদাহরণ। লুসি যেন প্রকৃতি কন্যা। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক কবিরা সবাই প্রকৃতিপ্রেমী। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', নজরুলের ইসলামের 'বাতায়নের পাশে গুবাকতরুর সারি' কিংবা 'বাদল দিনে' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর 'ঝর্ণা', বুদ্ধদেব বসুর 'চিল্কায় সকাল', জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' -এই জাতীয় কবিতা।

(গ) স্বদেশপ্রীতি বিষয়ক কবিতা :

মাতৃভূমি কিংবা পিতৃভূমির প্রতি মানুষের মধ্যে আছে আবেগ - ভালবাসা -শ্রদ্ধা। তা কখনো উচ্চকিতভাবে, কখনও বা শান্ত সমহিতভাবে কবিতায় উচ্চারিত হয়। যুদ্ধজয়ের জন্য রণদামামা বাজানো, বীরত্ব পূর্ণ লড়াই এ নিজেকে আত্মোৎসর্গ করা - এজাতীয় কবিতার একটি দিক। আবার দেশমাতৃকার প্রতি অতিভক্তিভাবে বিনম্র চিত্তে তার রূপ গুণ বর্ণনা করতে দেশপ্রেমমূলক কবিতার আরেকটি দিক। টেনিসন, টমাস হার্ডি বা এম্বারব্রুম্বিরা দেশের জন্য স্বদেশপ্রেমের উল্লাসময় কবিতা রচনা করেছেন। অন্যদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মেডফিলডরা গভীর দেশপ্রেমে মগ্ন। বাংলায় দেশপ্রেমের কবিতার সূচনা ঈশ্বর গুপ্তের খন্ডকবিতার মধ্যে। উনিশ শতকের গীতিকবিতা দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' দেশের জাতীয় সংগীত ও গান হিসাবে মর্যাদা পেয়েছেন। দ্বিজেন্দ্র লালের 'ভারতবর্ষ' শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' - এই জাতীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা। নজরুল ইসলামের কবিতা পড়ে পরাধীন ভারতের বিপ্লবীরা হাসতে হাসতে প্রাণ দিতেন দেশের জন্য।

(ঘ) ভক্তিমূলক গীতিকবিতা :

ভক্তিভাবকে কেন্দ্র করে যে লিরিক্যাল কবিতা লেখা হয়েছে তাকে ভক্তিমূলক গীতিকবিতা বলা যায়। ভক্ত কবি নিজেকে সমর্পণ করেছেন এখানে। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র ডালিতে এই জাতীয় কবিতা সুপ্রচুর। এছাড়াও তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্য বেশ ষকিছু সর্বাধিনায়ককে সমর্পণ করে লেখা। কবি নিশিকান্ত 'অরবিন্দ বন্দনা'য় এই জাতীয় কবিতা লিখেছেন। উনিশ শতকের গীতিকবিদের কবিতার ধারায় ভক্তিমূলক গীতিকবিতার দেখা মেলে। মধ্যযুগে লেখা 'বৈষ্ণবপদাবলী'র বেশ কিছু কবিতাও কি এই জাতীয় নয়?

(ঙ) পারিবারিক জীবনকেন্দ্রিক কবিতা :

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন যে, আমাদের সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ আমাদের সমাজের দৃঢ় বন্ধন পরিবার। সুতরাং পরিবারকেন্দ্রিক বাঙ্গালি পরিবারের প্রতি অণুগত স্বাভাবিক ভাবেই পরিবার জীবনকেন্দ্রিক কবিতা তাঁরা লিখেছেন। বিশেষত উনিশ শতকের গীতিকবিরা গার্হস্থ্যজীবনকেন্দ্রিক কবিতা লিখেছেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এই কবিতাগুলিতে গৃহ তথা পরিবার যে আশ্রয়, ভরসা, বিশ্বাস ভালোবাসা, শান্তির জায়গা তা পরিস্ফূট। সেইসঙ্গে সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ - আদরের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আবার পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাও প্রকাশিত । কবি মাইকেল মোরানের (Michell Moran) 'এ ট্রিবিউই টু ফ্যামিলি' (A Tribute to family), এডউইনা রেইজারের (Edwina Reizer) এর 'হোয়াট ইজ ফ্যামিলি (What is family) এই জাতীয় কবিতা। বাংলায় মানকুমারী বসু, নিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখের কবিতায় পারিবারিক জীবন সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

এছাড়াও আরো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন - বিষদাত্মক কবিতা, তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা,স্তোত্র কবিতা, চিন্তামূলক কবিতা, এলিজি ও শোকগাথা, ননসেন্স ভার্স, সনেট, গদ্যকবিতা, হাইম, হাইকু ইত্যাদি।

যে কবিতার মূল সুর বিষাদ তাকে বিষাদাত্মক কবিতা বলা যেতে পারে । সমালোচকের ভাষায় - "Dark poems may seek to romanticize sadness and depression. Other dark poems are simply poems about sad subject." কখনো কখনো রোমান্টিক কবিদের এ বিষাদ অকারণ।

এডগার অ্যালান পো - র 'the Raven' কীটসের 'হাইপীরিয়ন' (Hyperion), ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'Poem of Joy', ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'টিনট্রান অ্যাবে' (Tintern Abbey) শেলির 'আলাস্টার অব দ্যা স্পিরিট অফ সলিটিউড (Alstor or the sprit of solitude) টেনিসনের'দ্যা টকিং ওক' (The Talking Oak) প্রভৃতি এই জাতীয় কবিতার নিদর্শন ল বাংলায় মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' প্রথম এই জাতীয় কবিতা ।হেমচন্দ্রের 'হতাশার আক্ষেপ', অক্ষয় বড়ালের 'প্রদীপ' - এ ধরনের কবিতা । জীবনানন্দ দাশ বিষণ্ণতা মায়াময় সুর শুনিয়েছেন বাঙালি কাব্যপাঠককে। যেমন - "বাকি সব মানুসেরা অন্ধকারে হেমন্তের অরিবল পাতার মতন / কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়" (১৯৪৬ -৪৭)।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

20

যে গীতিকবিতার তত্ত্বকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে তাকে তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা বলা হয়ষ । ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের গীতিকবিতা তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা লিখেছেন , 'সোনারতরী', 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা তত্ত্ব' এই জাতীয় কবিতার প্রকৃষ্ট উদসাহরণ।

স্তোত্র কবিতা বা Ode আলাদা আলোচনা যোগ্য বিষয়। এম . এইচ. আব্রামস্ বলেছেন "....'Ode' denotes a long lyric poem that is serious in subject and treatmenr, elevated in style and elaborate in its stanzic structure." তিন ধরনের ওডের সন্ধান মেলে - পিন্ডারীয় ওড, হোরাতিয় ওড় এবং অনিয়মিত ওড়। গ্রীক কবি পিন্ডার যে সমবেত কবিতা বা .কোরাসের সূচনা করেন তাই এ জাতীয় ওড। লাটিন কবি হোরেস পিন্ডারের থেকে আলাদা একান্ত অনুভবের ওড লিখেছেন। নির্দিষ্ট ছকের বাইরের ওডগুলি অনিয়মিত ওড (Irregular Ode0 নামে পরিচিত। শেলির ওড টু দ্যা ওয়েস্ট উইন্ড' বা কীটসের ' ওড টু এ নাইটিঙ্গেল', 'ওড অন এ গ্রীসিয়ান আর্ন'। বিখ্যাত স্তোত্র কাব্য বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ', সুরেন্দ্র মজুমদারের 'মাতৃস্তুতি', মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'নমস্কার' ইত্যাদি বাংলা ভাষার এই জাতীয় কবিতা।

কবির ব্যক্তিগত শ্লোক যখন বিশ্বাতিগ হয়ে কাব্যরূপ পায় তখন তা শোকগীতি বা Elegy - তে পরিণত হয়। কেমব্রিজ ডিকশনারীতে বলা হয়েছে - "A sad poem or song, especially remembering someone who has died or somthing in the past". 'Elegy' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Elegus' থেকে যার অর্থ বাঁশির সুরের সঙ্গে দুঃখবোধক গান গাওয়া। এটা অনেকটা বিষাদত্মক কবিতার মতো। শেলির 'অ্যাডোনিস, টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' (In memorium), অডেন এর 'ইন মেমারি অফ ডব্লু বি ইয়েটস (In memory of W.B. Yeats), হুইটম্যানের ও ক্যাপ্টেন, মাই ক্যাপ্টেন '(O Captain ! My Captain)' ইত্যাদি এজাতীয় কবিতার অন্তর্গত। বাংলায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম শোকগীতিকাব্য । রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ', আক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মন্ত্র' প্রভৃতি এই জাতীয় কাব্য। অক্ষয় বড়াল ও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের স্ত্রী - বিয়োগজনিত দুঃখ ব্যাথাতে এই জাতীয় কাব্য লিখেছেন।

যুক্তি তর্কের বাইরে এক ধরনের কবিতা লেখা হয় - যা মূলত শিশুতোষ মূলক তাকে আমরা ননসেন্স ভার্স বা আবোল তাবোল জাতীয় কবিতা বলতে পারি । এনসাইক্লোপিড়িয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে - "Nonsence verse, humorous or whimsical verse that differes from other comic verse in its resistance to any rational or allegorical interpretation. Though it often makes use of

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

টিপ্পনী

coined, meaningless words, it is unlike the ritualistic gibberish of children's counting - out rhymes in that it makes these words sound purposeful.

ননসেন্স ভার্সের অন্যতম সেরা লেখক লুইস ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়র। ক্যারল 'Jabber Wocky', 'A Strange wild song' প্রভৃতি ; এডওয়ার্ড লিয়রের 'Book of Nonsense Verse' সারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ননসেন্স ভার্স এর বই। আমাদের বাংলায় সুকুমার রায় ননসেন্স ভার্সের সেরা লেখক । তাঁর আবোল তাবোল বাংলা সাহিত্যের আন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

হাইম (Hymn) হচ্ছে একজাতীয় গান বা লিরিক যা ঈশ্বর বা বিধাতা বা স্বদেশকে প্রশস্তি করে সম্মান দিয়ে লেখা হয়ে থাকে। Hymn শব্দটি এসেছে গ্রীক 'Hymnos' থেকে। আগত ল্যাটিন শব্দ "Hymnus" থেকে। গ্রীক 'Hymnos' এর অর্থ ঈশ্বর বা নায়কের প্রশস্তিমূলক গান । মূলত ধর্মীয় কবিতা বলা যেতে পারে । প্রাচীন গ্রীসে ফ্যারাওদের প্রশস্তিমূলক কবিতা বা ভারতীয়দের 'বেদ' এই জাতীয় রচনা। পরবর্তীতে গ্রেগরিয়ান চান্ট বা চাপেল Hymn - এর অন্তর্গত হয়। এ অনেকটা স্তোত্রজাতীয় কবিতা। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য', গীতাঞ্জালি ইত্যাদির বেশ কিছু কবিতা এই জাতীয়। কিথ (Keith) ও ক্রিস্টিন গেটি (Kristyn Getty) আধুনিক Hymn সংগীতের কম্পেজার।আমাদের বাউল শিল্পীরাও Hymn এর বড় লেখক।

হাইকু হচ্ছে জাপানী কবিতা। তিন পংক্তির অতি সংক্ষিপ্ত কবিতায় বৃহতের ইসারা লুক্কায়িত থাকে। ৫ -৭ -৫ মাত্রার পংক্তি জাপানী কবি বাশোর (Basho) কবিতা থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে -

Fu - ru - i - ke ya (5)

Ka - wa - zn to - bi - ko - mu (7)

mi - zu - no - o - to (5)

[old pond / a frog leaps in / water's sound]

[পুরনো পুকুর / ব্যাঙের লাফ / জলের শব্দ]

হাইকু কাব্য আন্দোলন জাপান ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল পাশ্চাত্যেও । এই জাতীয় কবিতার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন - মাৎসুও বাশো, ইসো বুসোন, কোবয়শি ইসা,

মাসাওকা শিকি, ওজিকি কোয়োন ইত্যাদিরা। ইংরেজিতে এজরা পাউন্ড প্রথম ১৯১৩ সালে হাইকু কবিতা লেখেন। পল এলুয়ার্ড , নেরুদা, লোরকা, অক্টাভিও পাজ, রাফায়েল লোজানো প্রমুখেরা হাইকু লিখেছেন। বাংলায় অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাইকু লেখেন। কাশিনাথ কর্মকার, আজু মুখোপাধ্যায়, মুজিব মেহদি, জাহিরুল হাসান প্রমুখরা বাংলায় হাইকু লিখেছেন।

টিপ্পনী

নাটক :

নাট্যচার্য ভরত 'দৃশ্যশ্রব্যক্রীড়নীয়ক' এর দশটি রূপকের কথা বলেছেন। এগুলির মধ্যে আছে - ভান, ব্যায়োগ, বীথী, প্রহসন, ডিম, ঈহামৃগ, সমবকার, অঙ্ক, প্রকরণ ইত্যাদি। এরই একটি অংশ নাটক। 'সাহিত্য দর্পন' গ্রন্থে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন -

নাটকং খ্যাতবৃত্তংস্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম।
বিলাসর্দ্ধ্যাদ্বিগুণবদ্ যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ।।
সুখদুঃখসমুদ্ভূতি - নানারস নিরন্তম্।
পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাংকাঃ প্রতাপবান।।

এম এইচ আব্রামস্ বলেছেন - "The form of composition designed for performance in the theater, in which actors take the roles of the characters, perform the indicated actions, and utter, the writen dialogue." [Literary Terms]

জন ড্রাইডেন বলেছেন - "Just and lively image of human nature, representing its passions and humours, and the changes of fortune to which it is subject, for the delight and instruction of mankind."

নাটক হল জীবনের অনুকরণ। নাটকের লক্ষণগুলি ও প্রাচ্য আলংকারিদের মতে - নাট্যবৃত্ত হবে পঞ্চসন্ধিযুক্ত ; জীবনের সুখ - দুঃখ প্রতিফলিত হবে; নাটকের নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত, উচ্চবংশজাত, আদর্শ চরিত্র; নাটকে থাকবে পাঁচ থেকে দশটি অঙ্ক। পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্ববিদদের মতে দুটি প্রধান লক্ষণ হল - অনুকরণ তথা জীবনের অনুকরণ এবং দ্বন্দ্ব - নাট্যদ্বন্দ্ব।

নাটকের বিভিন্ন ভাগগুলি হল - ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন, মেলোড্রামা,

মিউজিক্যাল ড্রামা, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটক।

ট্র্যাজেডি :

টিপ্পনী

'ট্র্যাজেডি' বলতে আমরা বুঝি বিয়োগান্তক নাটক। গ্রীক শব্দ 'Tragoidia' থেকে Trageedy শব্দটির উৎপত্তি।'Trag(os) মানে Goat এবং 'Oide' মানে song। অর্থাৎ ছাগগীতি বা Goat - song হল ট্র্যাজেডি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। গ্রীক Tragodia থেকে লাতিন Tragoedia, তার থেকে মধ্যযুগীয় লাতিনে Tragedia এবং তার থেকে মধ্যযুগীয় ইংরেজিতে Tragedie । এই Tragedie -ই আধুনিককালে Tragedy হয়েছে।

গ্রীসে দেবতা ডায়োনিসাস (Dionysus) এর পুজো উপলক্ষে ছাগ বা ভেড়া বলিদান উৎসব হত। বসন্তকালীন এই উৎসবে গায়কেরা ভেড়ার চামড়ায় সারা শরীর ঢেকে আনুষ্ঠান করত। গানের সঙ্গে নাট্যকাহিনী যুক্তছিল। এইসব নাটককে ট্র্যাজেডি বলা হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নাট্যভিনয়ের প্রতিযোগিতা হত এবং সেই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ্য নাট্যকারকে 'ছাগ' পুরস্কার দেওয়া হত।

অন্য একটি মতও আছে। ডায়োনিসাসের পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমাংশে তার মৃত্যুজনিত শোকানুষ্ঠান এবং দ্বিতীয়ভাগে পুনর্জীবন প্রাপ্তিজনিত আনন্দানুষ্ঠান, ও শোকানুষ্ঠান থেকে ট্র্যাজেডি এবং আনান্দানুষ্ঠান থেকে কমেড়ি (Comedy) -র উৎপত্তি।

অ্যারিস্টটল আবার মনে করেছেন Dithramb গান থেকে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি।

যাইহোক না কেন, বর্তমানে ট্রাজেড়ি হচ্ছে মানবজীবনের ভাগ্যবিপর্যয়ের ইতিবৃত্ত। সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্য নেমে আসাই ট্র্যাজেডি সংস্কৃত আলংকারিকরা বিয়োগান্ত নাটকে বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা মিলনান্ত নাটক সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলেও বিয়োগান্ত নাটক সম্পর্কে কিছুই বলেননি। প্রাচীন কালে অ্যারিস্টটল তাঁর 'পেয়েটিকস' গ্রন্থে ট্র্যাজেডি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

অ্যারিস্টটল এর সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন - "Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in the language embellished with each kind of artistic

ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation - catharsis of these and similar emotions."

এইজ সংজ্ঞা থেকে আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলিতে পৌঁছতে পারি সেগুলি হল -

(ক) ট্র্যাজেডির বিষয় হবে গুরুগম্ভীর।

(খ) ট্র্যাজেডির প্লট হবে বৃত্তাকার ও সুগঠিত।

(গ) কাহিনী হবে আদি - মধ্য - অন্ত্য যুক্ত।

(ঘ) ট্র্যাজেড়িতে ত্রি-ঐক্য থাকবে অর্থাৎ স্থান কাল - পাত্রের ঐক্য থাকবে।

(ঙ) নাটকে বিভিন্ন ঘটনা থাকবে এবং কিন্তু ঘটনাবলির পরিণাম হবে একমুখী।

(চ) নায়কের উপরে নেমে আসা বিষাদময় ঘটনা দর্শনমনে করুনা ও ভীতির (Pity ও fear) সৃষ্টি করবে। এর ফলে দর্শকদের Catharsis বা ভাবমোক্ষণ ঘটবে।

(ছ) ট্র্যাজেডির ভাষা, সংলাপ, ও সংগীত হবে ভাবগম্ভীর।

(জ)ট্র্যাজেডির রস হবে ভীতিজনক করুণ।

(ঝ) ট্র্যাজেডি জীবনকে অনুকরণ করবে।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গে কথা বলেছেন - কাহিনী (Plot), চরিত্র (Character), চিন্তন (Thought), বচন (Diction), সঙ্গীত (Melody), দৃশ্যসজ্জা (Spectacle)।

কাহিনী বা বৃত্ত (Plot) :

অ্যারিস্টটল নাট্যবৃত্তকে প্রধান উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁর কাছে কাহিনীর মানে - "The arrangement of the incidents"। প্রাচ্যে উপবৃত্তের (Sub-plot) ধারণা থাকলেও গ্রীসে নাট্য সংহত একমুখীন। তবে বৃত্ত হতে পারে সরল, জটিল বা যৌগিক। সরল প্লটে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি ছাড়াই নায়কের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। যেমন রাজা অয়দিপাউস' নাটকে অয়দিপাউসের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে অথচ জ্ঞানত কোনো অন্যায় করেনি। অর্থাৎ সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। অন্যদিকে জটিল বা যৌগিক বৃত্তে বিপরীত কাহিনীর উপস্থাপনা করা হয়। এতে অবশ্য আগের ঘটনা পরবর্তী ঘটনা ঘটতে সাহায্য করে। যেমন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান'

টিপ্পনী

নাটকে নুরজাহানের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তার নিজের কৃতকর্ম।

সাধারণত কাহিনী হয় পাঁচ অঙ্কের। এই অঙ্কগুলি আবার কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত তবে এক দৈর্ঘ্য এবং সংহতি এমন হবে যে, দর্শকরা প্রতিটা আলাদা করে এবং সামগ্রিক নাটক একসঙ্গে - দুইই বুঝতে পারবেন। নায়কের ভাগ্যের ওঠাপড়ার সঙ্গে কাহিনী এগোবে। জোর দেওয়া হবে সম্ভাব্যতার উপরে এবং নাটকীয় কার্যকরণের উপর।

টিপ্পনী

চরিত্র (Character) :

অ্যারিস্টটল বৃত্তএ-র পরে স্থান দিয়েছেন চরিত্রকে। কারণ, ট্র্যাজিক বিপর্যয়ের জন্য চরিত্রের ব্যাক্তিত্ব বা নিয়ন্ত্রণ দায়ী নয়। প্রাচ্য আলংকারিকদের মতো অ্যারিস্টটল বলেছেন, নায়ক হবে 'Highly renowened and prosperous', উচ্চবংশজাত, সমৃদ্ধশালী, সৎ। নায়ক হবে সাধারণ মানুষের থেকে উচ্চস্তরের ব্যক্তি - 'Person who are above the common level"। অ্যারিস্টটলের ভাষায় বলতে পারি - " .... the tragic hero will most effectively evoke both our pity and terror if he is neither thoroughly good nor thoroughly bad, but a mixture of both; and also that this tragic effect will be stronger if the hero is "better than we are", in the sense that he is of higher than ordinary moral worth. Such a man is exhibited as suffering a change in fortune from happiness to misery because of his mistake choice of an action, to whish he is led by his hamartia - his 'error' or 'mistake' of judgement' or, as it is often, although misleadingly and less literally translated, his tragic flaw."

নায়কের চরিত্রে একটা ত্রুটি থাকবে। একেই অ্যারিস্টটল hamartia বলেছেন। গ্রীক ট্র্যাজেডি নায়ক নিয়তি বা নেমেসিসের (Nemesis) দ্বারা তাড়িত হয়। অন্যদিকে, শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির নায়কের কোনো একটা ত্রুটির মধ্য দিয়ে কাল প্রবেশ করে। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি নাটকে সাধারণত চরিত্রপ্রধান অর্থাৎ 'Character is destiny'।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

উচ্চস্তরীয়, সমৃদ্ধশালী চরিত্রের ভাগ্য বিপর্যয় দেখে দর্শক তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে করুণা ও ভীতির উদ্রেক হবে এবং অতিরিক্ত করুণা ও ভীতির ভাবমোক্ষণ বা Catharsis হবে।

চিন্তন (Thought):

কাহিনীর গড়ে তোলার জন্য নায়কের চিন্তা বা অনুভবকে চিন্তন বা Thought বলতে পারি। একে চরিত্রের বিচারSক্তিও বলা চলে। চিন্তন ও নাট্যমুহূর্তের মধ্যে সংযোগ আছে। যেমন - সংকটজনক নাট্য মুহূর্ত সর্বাদা সংকটজনক চিন্তনেই প্রকাশ। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নাট্যদ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তোলে।

বাচন (Diction) :

বচন হল ভাষা। এটাই হল নাট্যক্রিয়ার প্রাথমিক প্রকাশ। অ্যারিস্টটলের মতে - "The diction should be embellished with each kind of artistic element." বাচনের মধ্যে দিয়ে চরিত্রের চিন্তন ও অনুভূতি প্রকাশ পায়। প্রাচীনকালে যা ছিল 'Metrical arrangement of the words' পরবর্তীতে তা হয়েছে গদ্যভাষা।

দৃশ্যসজ্জা (Spectacle) :

'The Spectacle is theatrical effect presented on the stage', নাটককে জীবন্ত করার জন্য দৃশ্যসজ্জার সৃষ্টি প্রয়োগ প্রয়োজন। দৃশ্যপট দর্শকের আবেগকে জাগিয়ে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। শৈলিকে সৃষ্টি নাটককে অন্যমাত্রায় তুলে নিয়ে যায়। বাদল সরকার যে থার্ড থিয়েটারের কথা ভেবেছিলেন বা পথ নাটিকায় দৃশ্যসজ্জা থাকে না।

সংগীত (song) :

গানের মধ্য দিয়ে চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্য ব্যক্ত হয়। নাটকের অন্তঃসারও গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। অ্যারিস্টটল কোরাস (Chorus) - এর কথা বলেছেন। সমবেতসংগীত যেন সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। 'Chorus should be fully integrated into the play like an actor." একইসঙ্গে সংগীত অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে নাটককে দেখতে সাহায্য করে। সংগীত অনেক সময় নাটকে যা দেখা হয় না বা যায় না তা ব্যাখ্যা করে দেয়।

ট্র্যাজেডির শ্রেণীভেদ :

ট্র্যাজেডিকে কয়েকটি শ্রেণীভেদে ভাগ করা যায়। গ্রীসে অ্যারিস্টটলের অনেক আগে থেকেই ট্র্যাজেডি নাটক লেখা হয়েছে। পরবর্তিকালে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির একটা ধারা তৈরি হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গ্রীক ট্র্যাজেডিতে প্লটের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ত্রয়ী ঐক্যকে রক্ষা করে আদি - মধ্য - অন্ত্যযুক্ত কাহিনীতে চরিত্রের উপর ভাগ্য বিপর্যয় নেমে আসে নিয়তির দ্বারা তাড়িত হয়ে। উচ্চবংশীয় সমৃদ্ধশালী নায়কের দুর্ভাগ্য থেকে দর্শকদের মধ্যে করুণা ও ভীতির উদ্রেক হবে এবং দর্শকদের ভাবমোক্ষণ ঘটবে।

রোমান দার্শনিক নাট্যকার সেনেকা যে ট্র্যাজেডি নাটক লেখেন সেগুলি সেনেকান ট্র্যাজেডি বা রোমান ট্র্যাজেডি বলে পরিচিত। এগুলি অভিনয়ের থেকে পাঠের জন্যই মূলত লিখিত। 'Probably meant to be veeited at elite gatherings, they differ from the Greek versions in their long declamatory , narrative accounts of action, their ob-trusive moralising and bombastic rhetoric". লম্বা স্বগতোক্তি স্থান পেয়েছে। দেবতার বদলে গুরুত্ব পেয়েছে ভূত -প্রেত চরিত্র। 'Senecan tragedies explore ideas of revenge, the occult, the supernatural, suicide, blood and gore'. এই শ্রেণীর নাটকের উদাহরণ, ম্যাকভিলের 'গরবোডাক' (Gorboduc) । শুধু ইংরেজি সাহিত্যই নয়, সারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপীয়র দশটি নাটক লিখেছিলেন যেগুলি ট্র্যাজেডি নামে পরিচিত । "Shakespearean tragedy .... tells the story of a seemingly heroic figure whose major character flaw causes the story to end with his tragic downfall."

শেক্সপীয়র প্লটের থেকে চরিতের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর নাটকের ক্ষেত্রে 'Character is destiny'। চরিত্রের দুর্বলতার মধ্যেই পতনের বীজ লুকিয়ে থাকে। গ্রীক নাটকে চরিত্রের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী নিয়তি (Nemesis)। কিন্তু শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির নায়কের চারিত্রিক দুর্বলতা বা কোনো Flaw -র জন্য ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। নায়ক বহিদ্বন্দ্ব ও অংতদ্বন্দ্বে (External & Internal cocflit) দগ্ধ হয়, বিক্ষত হয়। নায়ক অবশ্যই সাধারণ মানুষের উপরে অবস্থান করে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

28

এছাড়া ও আরও অন্তত তিনধরনের ট্র্যাজেডির শ্রেণীর কথা নাট্যবিদরা বলেছেন - রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি (Revenge Tragedy), ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি (Domestic Tragedy) রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডি (Restroration Tragedy)।

রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি বা ট্র্যাজেডি অব ব্লাড (Tragedy of Blood) অনেকটা সেনেকান ট্র্যাজেডির মতে। 'The plot is centred on the tragic hero's attempts

at taking revenge on the murderer of a close relative; in these plays the hero tries to 'right a wrong'। সেনেকান ট্র্যাজেডি অভিনীত না হলেও এই জাতীয় ট্র্যাজেডি মঞ্চায়িত হয়েছে । এম. এইচ. আব্রামস্ বলেছেন, "Elezabethan dramatists usually represented then on stage to satisfy the appetite of the contemporary audience for violence and Horror." স্প্যানিশ ও ফরাসি ট্র্যাজেডিতে সম্মানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে ভালবাসা ও কর্তব্যের মধ্যে। অন্যদিকে ইংরেজি নাটকের ধারায় স্পর্শকাতর, অতিনাটকীয় নাট্যক্রিয়া আছে। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কীড - এর 'The Spanish Tragedy', ওয়েবস্টারের 'The Duchess of Malfi', শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' ইত্যাদি। বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' কে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পরিবারের কথা - মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের ট্র্যাজেড়ি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বামী - স্ত্রীর সম্পর্কের মতো অতি ব্যক্তিগত বিষয় এ নাটকে চিত্রিত হয়েছে। যেন বড় বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক - রাষ্ট্রনৈতিক বিতর্কের বাইরে পরিবারের ছোটখাটো সুখদুঃখকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই নাটক। টিউডর ও জ্যাকবের নাটকে এর প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। হেইউডের 'A woman killed with kindness', লিলোর 'The London Merchant', আর্থার মিলারের 'Death of a Salesman' শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' - এই জাতীয় নাটকের উদাহরণ । বাংলায় গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' বা বলিদান' রবীন্দ্রনাথে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের কথা বলা যেতে পারে।

রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডি, নিও-ক্ল্যাসিক্যাল (Neo - Classical) ট্র্যাজেডি বা হিরোয়িক ট্র্যাজেডি (Heroic Tragedy) নামেও পরিচিত । এই ধরনের নাটকে গুরুগম্ভীর ভাষা এবং জাকজমকপূর্ণ দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয়। নায়ক মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে ভালবাসা ও দেসব্রতের মধ্যে। এই ধরনের নাটকের সবথেকে বড় উদাহরণ ড্রাইডেনের 'The Conquest of Granada'। বাংলায় মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' -এই জাতীয় নাটক।

ট্র্যাজেডির ধারা :

ট্র্যাজেডি শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর উদ্ভবের ইতিহাস। গ্রীসে এই জাতীয়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নাটকের উদ্ভব । গ্রীক দেবতা 'ডায়োনিসাসের পুজো উপলক্ষে এর সূচনা । আম্পিথিয়েটারে এই নাটকের অভিনয় হত হাজার হাজার দর্শকের সামনে । স্বাভাবিকভাবে প্রথমদিকের নাটকে ধর্মের মিশ্রণ ছিল। পরবর্তীকালে তার লোপ ঘটে। দিথুরাম্বের মঞ্চায়ন প্রথম ঘটেছিল আরিয়ান (Arion) এর হাতে। এরপর থেসপিসের (Thespis) আগমন। আইকোরিয়ায় (Icarius) ছয়শ খ্রি. পূর্বাব্দে তাঁর জন্ম। ফ্রাইনিকাস (Phrynichus) থেসপিসের উত্তরাধিকার বহন করে চলেন। ইস্কাইলাস (Aeschylus) কোরাসকে ভিন্ন মর্যাদা দেন। দ্বিতীয় অভিনেতা যোগ করে কোরাসে দ্বিবাচনিকতা (Dialogue) নিয়ে আসেন। এই দুই অভিনেতা পরস্পরের বিপরীত ধর্মী চরিত্র হয়ে ওঠে। ইস্কাইলাসের নাটকগুলির মধ্যে আছে - প্রমিথিউম রাউন্ড (Prometheus Bound), অ্যাগামেনন (Agamenon), ওরেসটেইয়া (Oresteia) ইত্যাদি। ট্র্যাজেডিতে তৃতীয় চরিত্র যোগ করেন সফোক্লেস (Sophocles) । ইস্কাইলাস ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের বিরাজহীন লড়াই ও আপরাজেয়তার কথা বলেছেন। সফোক্লেস এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিণতি দান করেছেন। চতুর্থ চরিত্রের যোগ করেছেন তিনি। তাঁর ট্র্যাজেডিগুলি হল - আন্তিগোনে (Antigone), রাজা অয়দিপাউস (Oedipus the King), ইলেকট্রা (Electra), অ্যাজাক্স (Ajxs) ইত্যাদি।

গ্রীসের সালামিসে ৪৮০ খ্রি. পূ. এ জন্মানো ইউরিপিদিস (Euripides) ট্র্যাজেডিতে চতুর্থ চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল - মেডোয়া (Medea), হিপ্পোলাইটাস (Hyppolytus), ট্রোজান উইমেন (The Trojan Women) ইত্যাদি। তাঁর নাটকে এক অদ্ভুত পরিবেশে মিধের চরিত্রগুলিকে সাধারণ মানুষ হিসাবে দাঁড় করান হয়।

রোমান নাট্যকার লিভিয়াস এন্ড্রোনিকাস (Livius Andronicus) রোমান ট্র্যাজেডি লিখতে শুরু করেন । তাঁর ট্র্যাজেডিগুলি হল Aকাইলেস (Achilles), অগাস্টাস (Aegisthus), অন্তিয়োপা(Antiopa) তেরেয়াস (Tereus) ইত্যাদি। এছাড়া নাম করা যায়। গ্নীয়াস নীভিয়াস (Gnaeus Naevius), কুইন্টাস এন্নিয়াস (Quiutns Ennius), মারকাস পাসুভিয়াস (Marcus Pacuvius) এবং লুকিয়াস অক্কিয়াস (Lucius Accius)।

ইংরেজি সাহিত্য জুড়ে আছে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির ইতিহাস। যদিও তার আগেই টমাস ম্যাকভিল সেনেশান জাতীর ট্র্যাজেডি 'গরপেডাক' (Gorboduc)

লিখেছেন। এছাড়া অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে আছেন - টমাস কীড, ক্রিস্টোফার মারলো প্রমুখরা। কীড এর 'দ্যা স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি' (The spanish Tragedy) এবং মারলোর তৈমুর লঙ, ড. ফস্টার ইত্যাদি বিখ্যাত নাটকগুলি পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীতে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারেরও (William shakespeare) আবির্ভাব এলিজাবেথীয়ান যুগে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলি হল - টাইটাস অ্যান্ডোনিকাস (Titus Andronicus), রোমি ও জুলিয়েট (Romeo and Juliet) , জুলিয়াস সিজার (Julius Ceasar), হ্যামলেট (Hamlet), ট্রয়লাস ও ক্রোসিডা (Trolus an Cressida), ওথেলো (Othello) কিংলীয়র (King Lear), ম্যাকবেথ (Macbeth), টিমোন অব এথেন্স (Timon of Athens), অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা (Antony and Cleopatra), কোরিওলানাস (Coriolanum)।

বাংলা মৌলিক নাটকের যাত্রা শুরু ট্র্যাজেডি দিয়ে। ১৮৫২ সালে যোগেশচন্দ্র গুপ্ত লেখেন 'কীর্তিবিলাস'। মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী'; দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' ; গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি'; উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'বীরবালা' ইত্যাদি বাংলার প্রথম যুগের বিখ্যাত ট্র্যাজেডি। বাংলায় উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি মূলত শেক্সপীরীয় ধারার নাটক লেখেন। এগুলি হল 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নুরজাহান' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'রাজা ও রাণী', 'মালিনী' - নাটকগুলি উৎকৃষ্ট বাংলা ট্রাজডির উদাহরণ। আধুনিক কালের উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডিগুলি হল - নিশিকান্ত বসুর 'দেবলাদেবী', মন্মথ রায়ের 'কারাগার'; যোগেশ চৌধুরির 'সীতা', তুলসী লাহিড়ির 'ছেঁড়া তার' শচীন সেনের 'গৈরিক পতাকা', বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'ক্ষুধা', সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন', বরদা প্রসন্নের 'মিশরকুমারী', কিরণ মৈত্রের 'চোরাবালি', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক', বুদ্ধদেব বসুর 'কলকাতার ইলেকট্রা' ইত্যাদি।

একটি বাংলা ট্র্যাজেডি : কৃষ্ণকুমারী :

মধুসুদন দত্ত বাংলা ভাষায় প্রথম সচেতন ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। কর্ণেল জেমস টডের গ্রন্থ 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থ থেকে কাহিনী চয়ন করে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি লেখেন। উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারী অপরূপ সুন্দরী। তার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষত্রিয়রাজারা ভীমসিংহের কন্যাকে বিয়ে করতে চান। জয়পুরের রাণা জগৎ সিং,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মহারাষ্ট্রের রাজা প্রমুখরা উদয়পুরের অধিপতির উপর চাপ বাড়াতে থাকেন। ভীমসিংহ কোনো একজনের প্রতি সদয় হলে অন্যরা আরো বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবেন। চারিদিকের শত্রুতায় উদয়পুরের শান্তি বিঘ্নিত হয়। স্বাধীনতা বিনষ্টির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। তখন ভীমসিংহ কন্যার প্রাণ নিতে নির্দেশ দেন ভাই বলেন্দ্র সিংহকে। কৃষ্ণকুমারী এই পরিস্থিতি আনুধাবন করে খড়গাঘাতে আত্ম বলিদান করে। কৃষ্ণার মাতা, ভীমসিংহের স্ত্রী অহল্যাও বিদায় নেয় চিরকালের মতো। পড়ে থাকে ভীমসিংহের হাহাকার।

এই নাটকটির একটি ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছ। কৃষ্ণকুমারীর কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও প্রাণত্যাগ করতে হয়। এ যেন নিয়তি তাড়িত দুর্ভাগ্য। সদগুণ থাকা সত্ত্বেও দৈব দুর্বিপাকে তার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। এ নাটকের নায়ক ভীমসিংহ উচ্চবংশীয়, অভিজাত চরিত্র ও সমৃদ্ধশালী। তার জীবন সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ। স্ত্রী - কন্যা - পরিজন প্রজা নিয়ে সুখী। এমন সুখের সময়ে দুর্ভাগ্য নেমে আসে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য ভীমসিংহ নিজে দায়ী নয়। সততা ও নানা গুণের অধিকারী হয়েও তার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। কণ্যা রূপে গুণে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাকে প্রাণদন্ড দিতে হয় পিতাকে দেশরক্ষা করার জন্য। কন্যাহারা পিতার হাহাকার ভেসে আসে - 'হা কৃষ্ণা ! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা!'। ভীমসিংহের এই ট্র্যাজেডি দর্শক ও পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় এবং গ্রীক নায়কদের মতোই তার জীবনে ভাগ্য বিপর্যয় নেমে আসে।

নাটকটি আদি - মধ্য - অন্ত্যযুক্ত সংহত কাহিনীবৃত্তের। অ্যারিস্টটল কথিত - "The arrangement of the incident' - এর সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। যদিও ভীমসিংহ কৃষ্ণাকুমারীর জীবনে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণ ঘটেছে, তবুও একে খুব একটা জটিল প্লটের ট্র্যাজেডি বলা চলে না।

ভীমসিংহের চরিত্রটির আচরণ ও অবস্থান দর্শকদের মধ্যে ক্রোধ ও করুণা জাগিয়ে তোলে ।দেশরক্ষার জন্য পিতার কন্যাকে প্রাণদন্ড দেওয়া ক্রোধের উদ্রেক করলেও কন্যাহারা পিতার বক্ষবিদীর্ন আর্তনাদ দর্শকদের মধ্যে সহানুভূতি, করুণা জাগিয়ে তোলে। শোকাভিভূত রাণার ভাগ্যবিপর্যয় দর্শকদের মানবজীবন সম্পর্কে ভীতি - আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে। ট্র্যাজেডি দেখার পর দর্শকদের মধ্যে Cathersis বা ভাবমোক্ষণ হয়। সবমিলিয়ে নাটকটি গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শ অনুসরণ করেছে এবং সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে।

নুরজাহান:

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক নুরজাহান। এটি একটি ট্র্যাজেডি। একে Tragedy বলা হয়েছে। শের খাঁর স্ত্রী আগ্রায় মীনাবাজারের ইরানী দোকানীর নাতনি মেহেরউন্নিসা অসাধারণ রূপসী। তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন যুবরাজ সেলিম। কিন্তু সম্রাট আকবর সেলিমের এই সম্পর্ক মেনে নেননি। তাই অসম সাহসী শের খাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় তার। পশ্চিমে শত্রুদমন করে শের খাঁ সম্রাট আকবরের কাছে বাংলার মনসবদারী চেয়ে নেন উপহার স্বরূপ। সেখানে সুখের দিন কাটানোর সময় খবর আসে মারা গেছেন সম্রাট আকবর আর সেলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সম্রাটের সিংহাসনে বসেছেন। তারপর দ্রুত ঘটনা ঘটতে থাকে। শের খাঁ একপ্রকার আত্মহত্যা করেন। নুরজাহান দিল্লি ফিরে যান। মেয়ে লয়লাকে নিয়ে। তার ভাইয়েরা মন্ত্রী হয়ে বসে নুরজাহানকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। একদিকে সৎ - সিংহপুরুষ শেরখাঁ,অন্যদিকে ভারতের সাম্রাজ্ঞী হওয়ার হাতছানি। এই দুইয়ের টানাপোড়নে নাটকের শেষ অবধি চলে। নুরজাহান জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করেন। কমে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন। মেয়ের বিয়ে দেন জাহাঙ্গীরের ছোট ছেলের সঙ্গে। তাকে সম্রাট বানাতে চাইলে খুরমের বুদ্ধিও সাহসের কাছে হারতে হয়। জাহাঙ্গীরের ভালবাসার সহায়তায় বারেবারেই ক্ষমতা ধরে রাখলেও জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নুরজাহানের সমস্ত ক্ষমতা চলে যায়। ইতিমধ্যে মারা গেছেন লয়লার স্বামী। নুরজাহান ক্রমে মানসিক ভারসাম্য হারান একসময়ে মায়ের সমালোচক লয়লা জানায় এই সময় তাকে মায়ের পাশে থাকতে হবে। একদা দেশের সবথেকে ক্ষমতাশালিনী মহিলটি কোনরকমে বেঁচে আছেন।

ট্র্যাজেডিতে আখ্যানবৃত্তের থেকে বড় হয়ে উঠেছে নুরজাহান চরিত্রটি। সুন্দরী - রূপসী মেহের উন্নিসার সহজ - স্বাভাবিক জীবন ক্রমে জটিল হয়ে উঠে তারমধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে। শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডিতে 'Character is desting' হয়ে ওঠে। 'নুরজাহান' নাটকটি নুরজাহান চরিত্রটি সর্বস্ব। এই চরিত্রটিই নাটকের Desting হয়ে উঠেছে। নুরজাহানের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য নিয়তি নয়। দায়ী নুরজাহানের উচ্চাকাঙ্খা। শের খাঁর সঙ্গে সহজ প্রেমপূর্ণ জীবনের থেকে তার কাছে বড় হয়ে ওঠেন সাম্রাজ্ঞী পরিচয়ের আকাঙ্খা। সেই আকাঙ্খা তাকে সিংহাসনের স্বাদ দেয় ঠিকই। কিন্তু তারপর আমরা দেখি এমন ক্ষমতাবান মহিলার পতন।এই পতন তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন করে তোলে। শেক্সপীয়র বলেছেন যে, চরিত্রের Flaw বা দুর্বলতার জন্য দুর্ভাগ্য নেমে আসে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নুরজাহান শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির মতো অন্তদ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বে (Internal & External Conplit) দগ্ধ হয়েছে। তার মানবিক ভারসাম্যহীনতা এই Conflict এরই কারণে ঘটেছে।

তাই এটি শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যকে মেনে গড়ে ওঠা নাটক। তবে নাটকে নায়ক নয়, নায়িকার জীবনের ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে। সেইজন্য নুরজাহান' কে ' She tragedy' বলা হয়েছে।

কমেডি (Comedy) :

কমেডি (Comedy) শব্দটির উদ্ভব গ্রীক শব্দ Komoidia থেকে। এই শব্দ থেকে লাতিন Comoedia এবং এখান থেকে Comedy এসেছে। Komoidia শব্দের আদি অর্থ হাসিতে সমাপ্ত নাটক অর্থাৎ মিলনান্ত নাটক। 'Kome' ও 'Oide' শব্দের সংযোগ সৃষ্টি Komoidia। Kome -র অর্থ গ্রাম (Village) এবং Oide এর অর্থ গান গাওয়া (Singing)। অর্থাৎ কমেডি মানে গ্রাম্য ভোজন উৎসবের আনন্দ গান অথবা একে বলা যেতে পারে জনপ্রিয় নাট্যকলা।

গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাসের পুজো উপলক্ষ্যে শীতকালীন যে উৎসব হত সেখান থেকে কমেডির উদ্ভব। ডায়োনিসাসের মৃত্যু উপলক্ষ্যে ট্র্যাজেডি ও পুনর্জন্ম উপলক্ষে কমেডির সৃষ্টি। এই আনন্দানুষ্ঠানে ফ্যালিক গান (Phalic Song) গাওয়া হত। গান - বাজনা সহকারে শোভাযাত্রার নাম 'কোমাস' (Comus)। কোমাস থেকেই কমেডির উদ্ভব।

কমেডি হচ্ছে মিলানন্তক নাটক। এম. এইচ. আব্রামস্. ও জি. জি. হারফাম তাঁদের 'A Handbook of Literary Terms' এ এর সংজ্ঞা হিসাবে বলেছেন - ".....a comedy is a fictional work in which the materials are selected and managed primarily in order to interest and amuse us the characters and their discomfitures engage our pleasurable attention rather than our profound concern, we are made to feel confident that no great disaster will occur, and usually the action turns ant happily for the chief charercter. The term "Comedy" is customarily applied only to plays for the stage or motion pictures.

অর্থাৎ, যে নাটক দর্শককে আনন্দ দেয় তাই কমেডি। অ্যারিস্টটল এ বিষয়ে বলেছেন - "Comedy is an imitation of man worse than the average ; worse however not as regards any and every sort of fault but only as regards particular kind ..... The ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others."

টিপ্পনী

অ্যারিস্টটলের মতে কমেডিতে ঠাই পায় মানুষের মধ্যে অসংগতি ও বৈসাদৃশ্য।

কমেডির বৈশিষ্ট্য :

প্রথমত, 'কমেডি হল নিম্নতর নরনারীর জীবনবৃত্তের অনুকরণ'। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ চিত্রিত হয় এখানে। দ্বিতীয়ত, অ্যারিস্টটলের মতে কোন জীবনাদর্শ নয়,সামাজিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন লেখ্য পরিবেশিত হয়েছে কমেডিতে। তৃতীয়ত, কমেডির প্রধান রস হাস্যরস। তবে হাস্যরসে অশ্লীল বা ভাঁড়ামি নয়। বরং সেখানে জীবনের অসংগতি প্রকাশিত। চতুর্থত, কমেডি কোনো জটিলতাকে ব্যক্ত করে না, বরং জীবনের উপরিতলশায়ী ভাব প্রকাশিত। পঞ্চমত, কমেডি মানুষকে আনন্দ দান করে। ফলে গুরুগম্ভীর ভাব নয়, মিলন প্রীতির ছবি দেখা যায়। ষষ্ঠত, অনেক কমেডির চরিত্র হয় 'টাইপ'।

কমেডির শ্রেণী বিভাগ :

নাট্যতত্ত্ববিদরা কমেডিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন - রোমান্টিক কমেডি, কমেডি অব হিউমার, স্যাটায়রিক্যাল কমেডি, কমেডি অব ম্যানারস, দার্স, কমেডি আব ইনট্রিগ, ট্র্যাজি, কমেডি এবং ব্ল্যাক কমেডি, জেন্টন কমেডি।

রোমান্টিক কমেডি বা কমেডি অব রোমান্স (Comedy of Romance) :

যে কমেডির মধ্যে থাকে রোমান্স অর্থাৎ কল্পনার উচ্ছ্বাস তাকে রোমান্টিক কমেডি বলা যায়। "Such comedy represts a love affair that involves a beautiful and engaging heroin; the course of this love does not run smooth, yet overcomes all difficulties to end in a happy union." [A Handbook of Literary Terms; M.H. Abrams]

শেক্সপীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'; রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'; দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' ইত্যাদি এই জাতীয় কমেডি।

টিপ্পনী

কমেডি অব হিউমার (Comedy of Humour)

হিউমার মানে নির্ভেজাল হাস্যরস। এই জাতীয় কমেডিতে বিশুদ্ধ হাস্যরস ব্যবহৃত হয়। একটি আবেগপ্রবণ প্রেক্ষাপট সৃজন করা হয়। বেন জনসনের 'এভরিম্যান ইন হিজ হিউমার' ও 'এভরিম্যান আউট অব হিজ হিউমার', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' - এই শ্রেণীর কমেডির উদাহরণ।

স্যাটায়রিক্যাল কমেডি বা কমেডি অব স্যাটায়ার (Comedy of Satire) :

এই শ্রেণীর কমেডিতে প্রকাশিত হয় সমাজিক অপরাধ এবং অপ্রাপ্তির কথা। এই অপরাধ সেই সব মানুষের যারা তাদের শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন। বলা যেতে পারে নাট্যকার বিদ্রুপের কশাঘাত চালান। এই ধরণের কমেডির উদাহরণ বেন জনসনের 'ভোলপোন' (volpone) বা 'সেরিডান স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল'; অ্যারিস্টো ফেনিস এর 'ক্লাউড'; 'বাউস' মধুসূদন 'একেই বলে সভ্যতা' ইত্যাদি।

কমেডি অব ম্যানারস (Comedy of Manners:

সামাজিক রীতিনীতি আচার-আচরণ প্রভৃতি যে কমেডির বিষয়বস্তু তাকে কমেডি অব ম্যানারস বলে। এখানে থাকে উইট বা বাগবৈদগ্ধ। এই জাতীয় কমেডির উদাহরণ শেক্সপীয়রের 'লাভস লাব লস্ট', বার্নাড শ - এর 'আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান', দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলে বুড়ো', অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধণ', রবিন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' ইত্যাদি।

কমেডি অব ইনট্রিগ বা ষড়যন্ত্রমূলক কমেডি (Comedy of Interigue) :

ষড়যন্ত্রের জাল, জটিলতা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় কমেডি অব ইনট্রিগে। প্রধান চরিত্র এই ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও শেষপর্যন্ত সমস্ত জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে।এই শ্রেণীর রচনা ড্রাইডেনের 'দ্যা স্প্যানিশ ফেয়ার', অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধন', রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ইত্যাদি।

ফার্স (Frace) :

ফার্স এর বাংলা প্রহসন। সমাজ ও চরিত্রের ভন্ডামী অসংগতি যে নাটকে প্রকাশিত হয় তাকে ফার্স বলা হয়। এই অসংগতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপসহ ব্যক্ত হয়। এটি লঘুস্তরের কমেডি। ফার্সের উদাহরণ শেক্সীপীয়রের 'কমেডি অব এররস' ও 'হেনরি কোর'; মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'; দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি।

ব্ল্যাক কমেডি (Black Comedy) :

যে কমেডিতে অসূয়া (Cynisism) ও মোহমুক্তি (Disillusionment) প্রতিফলিত তাকে ব্ল্যাক কমেডি বলে। মানব চরিত্র অজানা শত্রুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থাটাই জীবনের অসংগতিরূপে প্রকাশিত। তবে এ কমেডি মূলত ফরাসী দেখা মেলে। এগুলিতে অ্যাবসার্ড ভাবনা রয়েছে। যেমন - আয়েনেস্কোর 'লা চেয়ার' বা জেঁনের 'রাইনো', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত', বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস'।

এছাড়া কেউ কেউ জেন্টল কমেডি বা ক্ল্যাসিক্যাল কমেডি-র কথাও বলেছেন। জেন্টল কমেডির বিষয় চরিত্রের নৈতিকতা। ক্ল্যাসিক্যাল কমেডি মূলত অ্যারিস্টটলীয় ধ্রুপদী বা প্রাচীন কমেডি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সংস্কৃত নাট্যকাররা ট্র্যাজেডি লেখেননি, তাঁরা কেবল কমেডি বা মিলনান্তক নাটকে বিশ্বাসী ছিলেন। ভবভূতি 'উত্তর রামচরিত' লিখতে গিয়ে রাম-সীতার বিচ্ছেদকে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে চির মিলন দিয়েই নাটক সমাপ্ত করেছেন। প্রাচ্য অলংকারিকরা কমেডির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগোন জীবনে শেষ পর্যন্ত মিলনকেই দেখিয়েছেন।

সংস্কৃতে কালিদাস - ভবভূতি - শূদ্রকদের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'মালতীমাধব', 'উত্ত রাম চরিত্র', 'মহাবীর চরিত্র', 'মৃচ্ছকটিক' ইত্যাদি নাটক লেখা হয়েছে। পৃথিবীর সবদেশে সব ভাষার ট্র্যাজেডির মতোই কমেডিও রচিত হয়েছে। বাংলা তে প্রথম থেকে কমেডি রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ - জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র - অমৃতলাল বসু - বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ অসংখ্য নাটভকার কমেডি লিখেছেন।

ঐতিহাসিক নাটক (Historical Drama) :

ঐতিহাসিক নাটক অর্থে ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাটক। বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই শ্রেণিতে নাটক গড়ে ওঠে। .... any drama based mainly on historical materials' - কেই ঐতিহাসিক নাটক বলে।

"Historical drama is based upon historisal events and famous people' অধ্যাপক উজ্জলকুমার মজুমদার তাঁর 'সাহিত্যিক রূপরীতি গ্রন্থে ঐতিহাসিক

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নাটকের সংজ্ঞা হিসাবে বলেছেন - "নাট্যকার যদি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের কর্ম প্রচেষ্টায় বা বৈশিষ্ট্য অনুপ্রাণিত হয়ে তার জীবনের দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে নাটক লেখেন তবে তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। আবার বিশেষ চরিত্রের কোনো কাজ বা গুণের বিকাশের সন্ধান করতে গিয়ে নাট্যকার যদি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র ও পরিবেশের সন্ধান পেয়ে যান তাহলে সে নাটকও ঐতিহাসিক নাটক হতে পারে।"

হাডসন বলেছেন - "..... it is for more important that it should represent faithfully the manners, tone and temper of the age with which it deals"

ঐতিহাসিক নাটকের লক্ষণগুলি হল -

(ক) ঐতিহাসিক নাটকের কাহিনী সংগৃহীত হবে ইতিহাস থেকে।

(খ) সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিক নাটক গড়ে ওঠে।

(গ) বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা এই জাতীয় নাটকে স্থান পায়।

(ঘ) এই শ্রেণীর নাটকের চরিত্র বিশেষত প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি নেওয়া হবে ইতিহাস থেকে। তবে অনৈতিহাসিক চরিত্রও থাকবে।

(ঙ) নাট্যকার একটা বিশেষ সময়কে ফুটিয়ে তোলেন।

(চ) নাট্যকার বড় সত্য থেকে সরে আসেন না, কিন্তু ছোট ছোট ঘটনা নির্মাণ করে নেন।

(ছ) ঐতিহাসিক নাটক এই শ্রেণী বিভাগটি বিষয়ভিত্তিক। তবে এই নাটকেই ট্র্যাজেডি - কমেডি - ফার্স রচনা করা যায়।

(জ) নাট্যকার ইতিহাস ও কল্পনার সুমিশেল বিনি সুতোয় বয়নে কাহিনীকে বাঁধেন।

(ঝ) এই শ্রেণীর নাটকের রস ঐতিহাসিক হলেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আমরা ইতিহাসের সত্য জানার জন্য ইতিহাস পড়ব। আর উপন্যাস থেকে উপন্যাস রস গ্রহণ করব। তেমনি ঐতিহাসিক নাটক শেষ অবধি নাট্যরস উদ্ভূত করবে।

(ঞ) ছাত্রদের আজকের বিশ্বের সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বের অবস্থানের পরিচয় করিয়ে দেবার কাজ করে ঐতিহাসিক নাটক।

(ট) নাট্যকারের লক্ষ্য চরিত্রসৃষ্টি ও তার অন্তর্দন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলা।

(ঠ) নাট্যকার মানবচরিত্র কল্পনা করে ইতিহাসের আলোকে তার স্বরূপ সন্ধানী হল।

(ড) ঐতিহাসিক নাটক দেশ - কাল - নির্বিশেষে একটা বার্তা বহন করে।

টিপ্পনী

আমরা যে ইতিহাস পড়ি রতা রাজরাজাড়াদের কাহিনী তাকে আমরা ইতিহাসের কঙ্কাল বলতে পারি। প্রকৃত মানবেতিহাস ধরা থাকে আখ্যান-কাহিনীতে। ঐতিহাসিক মানুষ বাইরের আঘাতে মথিত হয়। কিন্তু এদর সঙ্গে কিছুটা অন্তদ্বর্ন্দ্বে দগ্ধ হয়। নাট্যকার সেই চরিত্রটির মানসিক চেহারার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। নাট্যকার সময়ের প্রেক্ষাপটে একটি মানুষকে রক্ত - মাংসের জীবন্ত করে তোলেন। চরিত্রে প্রাণ সৃষ্টি করার জন্য ঐতিহাসিক সত্যের পাশে কল্পনারও আশ্রয় নিতে হয়। পাশাপাশি অনৈতিহাসিক ঘটনা তৈরি করতে হয় লেখককে। কখনও কখনও বড় ঘটনাকে উপেক্ষা করতে হয় নাট্যকারের অভিপ্রেত উদ্দেশ্যকে তুলে ধরার জন্য। যেমন - 'সাজাহান' নাটকে সাহাজানের অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার দিলদারের মতো অনৈতিকহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।আবার 'মেবারপতন' নাটকে মানসী চরিত্রটি বিশ্বপ্রেমের প্রতীক স্বরূপ, তার মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক পরিবেশের অতীত এক ভাবসত্যে প্রকাশিত হয়েছে। 'নুরজাহান' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল নুরজাহানের যে টানাপোড়েনকে চিত্রিত করেছেন তা ইতিহাস ও কল্পনায় মিশ্রিত। একদিকে শের খাঁ, অন্যদিকে ভারত - সাম্রাজ্ঞী হবার উচ্চাকাঙ্খা - এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব নুরজাহানকে মানসিক ভারসাম্যহীন করে তোলে। এখানেই একটি ঐতিহাসিক চরিত্র নাট্যকারের মনের কারখানা ঘরে রসায়িত হয়ে স্বাধীন সত্যে পৌঁছে দেয়।

"An Introduction to the study of Literature' গ্রন্থে ডব্লু. এইচ. হাডসন - "..... A historical drama a work should not adhere to the literal path of history in such sort as to hinder proper dramatic life, that is the laws of the drama are here paramount to the facts of history which infers that where two cannot stand together the letter is to give way."

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

39

ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক নাটকের দৃষ্টান্ত মেলে। ক্রিস্টোফার মার্লোর 'এডওয়ার্ড' দ্যা সেকেন্ড'; শেক্সপীয়রের 'হেনরি দ্য ফোর্থ, 'হেনরি দ্যা ফিফথ', 'জুলিয়াস সিজার', 'কিং জন', 'রিচার্ড দ্যা সেকেন্ড', 'রিচার্ড দ্যা থার্ড',

হেনরি দ্যা সিক্সথ' ইত্যাদি।

বাংলায় প্রথম এই শ্রেণীর নাটকের রূপকার মধুসূদন দত্ত। তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' এক সচেতন প্রয়াস। এই নাটকেই প্রাচ্যরীতিতে অস্বীকার করে মধুসূদন পাশ্চাত্য নাট্যক্রিয়া প্রয়োগ করলেন প্রথম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' দেশপ্রেমের জন্য বলিদানের কাহিনী সমৃদ্ধ এবং তৎকালের প্রেক্ষাপটে যথোপযুক্ত নাটক। তাঁর 'অশ্রুমতী' ও 'স্বপ্নময়ী নাটক' ও যুগের বাণীকে বহন করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমকালীন অধুনা বিস্মৃত প্রমথনাথ মিত্র রাজপুতদের নিয়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন - 'নগনলিনী' বা 'জয়পাল' - এই জাতীয় নাটক। সমকালীন প্রখ্যাত নাট্যকার উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'হেমনলিনী', 'বীরবালা', 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক'; গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'যৌবনে যোগিনী', 'পাষান প্রতিমা'; মহেন্দ্রলাল বসু 'চিতোর রাজসতী পদ্মিনী'; সুরেশচন্দ্র মজুমদারের 'হাসির', রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তীর 'ভারতবিজয়' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক।

নাট্যচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটকের সব শাখাতেইও পল্লব ঘটিয়েছেন। পৌরাণিক নাট্যচর্চায় শ্রেষ্ঠ হলেও ঐতিহাসিক নাটকগুলি একটা সময়ের কথাকল্পকে বহন করে নিয়ে চলে। মূলত বঙ্গভঙ্গের সময় লেখা গিরিশচন্দ্রের নাটক গুলি একই সঙ্গে মঞ্চসফল ও সমসাময়িক কালকে তুলে ধরেছে। তাঁর এই জাতীয় নাটক গুলির মধ্যে আছে - সিরাজদৌল্লা, মীরকাশেম, ছত্রপতি শিবাজী, সৎনাম, অশোক ইত্যাদি। ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এর মতো বিখ্যাত নাট্যকারও ঐতিহাসিক লেখেন। তবে মঞ্চ সাফল্যের দিকে অধিমাত্রায় নজর দিতে গিয়ে এগুলি বেশিরভাগ ইতিহাস আশহরয়ী রোমান্টিক কাহিনী হয়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে আছে - পদ্মিনী, বঙ্গের প্রতাপাদিত্য, বাঙ্গালী মসনদ, পলাশী প্রায়শ্চিত্ত, চাঁদবিবি, নন্দকুমার, আলমগীর ইত্যাদি।

তবে বাংলার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর নাটকগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম ডি-কলোনাইজেশনের সুর শুনিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকারের ডেপুটি দ্বিজেন্দ্রলাল দেশ প্রেমকে উসকে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে আছে - 'তারাবাঈ', 'রাণা প্রতাপ সিংহ' 'দূর্গাদাস', 'মোবারুরন, 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সিংহলবিজয়', 'নুরজাহান', 'সাজাহান', 'সোরাব রুস্তম'। 'সোবার রুস্তম' ও 'তারাবাঈ' নাট্যকাব্য। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেতে পড়তে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে অপেরা দেখেছিলেন। তারাই দল সোরাব রুস্তমের মতো সংগীতবহুল অপেরাধর্মী নাটকের। প্রথম

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

নাটক 'তারাবাঈ' তেমন সাফল্য পায়নি। তবে পরবর্তীকালে তিনি সচেতন প্রচেষ্টায় ঐতিহাসিক নাটককে অন্যতম প্রধান ধারা করে তোলেন। কর্নেড জেমস টডের 'Annals and Antiquites of Rajasthan' গ্রন্থের থেকে উৎস সংগ্রহ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রাজপুত কাহিনী নির্ভর যে নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি মূলত পরাধীন দেশবাসীর মনে দেশ প্রেমকে জাগ্রত করবার জন্য। 'মেবার পতন' নাটকে বিশ্বপ্রেম - দেশপ্রেম - ভ্রাতৃপ্রেমকে চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার নিজে বলেছেন - "এই নাটকে আমি, একটি মহানীতির আলোচনা করতে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই মহানীতি মনুষ্যতের আদর্শবানী।" মনুষ্যত্ব জাগ্রত করবার নাটক 'মেবার পতন' অন্যদিকে 'দুর্গাদাস নাটকে অসামপ্রদায়িক ভারতবর্ষের এক সামগ্রিক সংহতির চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই নাটকে আবেগাচ্ছন্ন দুর্গাদাস বলেছে - "হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক। সেদিন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে যা সংসারে কেহ কখনও দেখে নাই।"

দ্বিজেন্দ্রলালের 'নুরজাহান' নাটকটির নায়িকা নুরজাহানের অন্তদ্বন্দ্ব নাটকটিকে অসাধারণ করে তুলেছে। শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির ধর্ম এখানে প্রকাশিত। মেহের উন্নিসার উচ্চাকাঙ্খা তাঁকে ভারত সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান করে তোলে। কিন্তু সেখান থেকে পতন তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ডেকে আনে, যাতে শেষ চরিত্রটি মানসিক ভারসাম্য হারায়। একজন দৃঠ - দৃপ্ত সাম্রাজ্ঞীর এই পতনের জন্য দায়ী তাঁর উচ্চাকাঙ্খা। এটি বাংলার বিখ্যাত She Tragedy। অন্যদিকে 'সাহাজান' নাটকটিতে শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়ারের প্রচ্ছন্ন ছায়া আছে। সম্রাট সাজাহানের পিতৃসত্ত্বা বনাম সম্রাটসত্ত্বার দ্বন্দ্ব নাটকীয় রস বাড়িয়ে তোলে। কন্যা জাহানারা ছোটপুত্র ঔরঙ্গজেবের বন্দী সম্রাট সাজাহানকে স্নেহের জন্য পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেন। এর উত্তরে সাজাহান বলেন, "আমার কোনো যুক্তি নাই। আমার কেবল এক যুক্তি আছে। সে স্নেহ।" এই অন্ধ স্নেহই তাঁর চরিত্রের Flaw। তাঁর জন্য তাঁর জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে আসে। তা দেখে দর্শকদের মধ্যে Pity and fear জেগে ওঠে। 'সাজাহান' নাটকটিতে নাট্যকার বড় ইতিহাস সত্য থেকে সরে আসেননি। তবে বেশ কিছু অনৈতিহাসিক কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা আছে। ঔরঙ্গজেব চরিত্রটিও তার খলতা, ক্ষমতালোভ নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সবমিলিয়ে 'সাজাহান' একটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটক।

আধুনিক সময়ে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ে আহুতি, রাখীবন্ধন, অযোধ্যার

টিপ্পনী

বেগম; যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী'; মন্মথ রায়ের 'অশোক'; শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদৌল্লা', 'ধাত্রীপান্না'; মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহল্যাবাঈ,; 'জাহাঙ্গীর', তান্তিয়াঁ মহারাজা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটকগুলি লেখা হয়েছে।

টিপ্পনী

পৌরাণিক নাটক (Mythical Drama) :

পুরানকাহিনীকে কেন্দ্র করে যে নাটক গড়ে ওঠে তাকে পৌরাণিক নাটক বলে। এই নাটক দর্শক ও পাঠকদের মধ্যে জ্ঞান ও ব্যক্তিকে জাগিয়ে তোলে। পুরাণের কাহিনীকে অবলম্বণ করে বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করে দেবানুগ্রাহী নাটকই পৌরাণিক নাটক। এই নাটক মিলনান্তক। এখানে অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটে। এ নাটক বাস্তবতাবর্জিত দেবমাহাত্ম্যমূলক।

আমরা পৌরাণিক নাটকের লক্ষণগুলি কী কী তা দেখে নিতে পারি -

(১) পৌরণিক নাটকের সর্বস্ব পুরাণ মহাকাব্য।

(২) নাটকের আখ্যান - উপ বা শাখা কাহিনী সবকিছুই পুরাণভিত্তিক।

(৩) পৌরাণিক কাহীনী বড় রকমের রদবদল করা হয় না। তবে ছোটোখাটো অদলবদল ঘটানো হয় নাটকের মূল আখ্যানের প্রয়োজনে।

(৪) নাটকের চরিত্রগুলি মূলত পৌরাণিক। তাদের নাম ও কাজ সব অপরিবর্তিত থাকে।

(৫) প্রধান ঘটনার পুরাণের বিচ্যুতি না ঘটলেও, পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বুনে দেওয়া হয় সমকালীন জীবনাদর্শকে।

(৬) পৌরাণিক নাটকের মূল রস ভক্তিরস। এর সঙ্গে থাকতে পারে বীর, করুণ রস।

(৭) পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে দেবচরিত্রের উপস্থিতি আবশ্যিক। তবে তাঁরা দেবতা হয়েও লৌকিক।

(৮) লৌকিক মানবপ্রেম নয়, বরং গুরুত্ব পায় ঈশ্বর প্রেম।

(৯) পৌরাণিক নাটকে কর্মফলবাদ বা নিয়তির উপস্থিতি অনিবার্য।

(১০) পাপ-পুণ্যের সংঘাতে ধর্মের জয় ঘোষিত।

(১১) দেবী অনুগ্রহ চরিত্র নানা সংঘাত - বিঘ্ন হয়ে শেষ অবধি জয়ী হয়।

(১২) ধর্মাদর্শই পৌরাণিক নাটকের মূল নিয়ামক শক্তি।

(১৩) নীতিকথা প্রচার করা হয় এই শ্রেণীর নাটকে।

(১৪) পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি যেহেতু দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত তাই শেষ অবধি ট্র্যাজেডি নয়, মিলনই ঘটে। এগুলি আঙ্গিকতভাবে কমেডি।

টিপ্পনী

অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার জানিয়েছেন - "ইতিহাস পুরাণের প্রভাব আমাদের দেশের জাতীয় জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে বলেই পৌরাণিক বিষয়ের নাটক আমাদের দেশের মানুষের কাছে লোকনাট্যের মতোই তীব্র আকর্ষণের বিষয়। এই জাতীয় নাটকে বিষয়বস্তু ও চরিত্র পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারত থেকে গৃহীত হয়। স্বভাবতই দেবতা ও দেবাশ্রিত মানবচরিত্র এই জাতীয় নাটকে প্রাধান্য পায়। ..... রামায়ণ - মহাভারতে- পুরাণ - কাহিনীর নাট্যরূপে কোনো মনস্তাত্ত্বিক কলাকৌশল অবলম্বন গৌ হয়ে পড়ে এইজন্য যে, মনের সহজ বিশ্বাসেই এই পৌরাণিক চরিত্রের 'নাটকীয়' কীর্তি গৃহীত হয়ে যায়।" (সাহিত্যের রূপরীতি)

চার্চে হাইম (Hymn), গ্রেগরিয়ান চান্ট (Gregorian Chant), মাস (Mass) ইত্যাদির দ্বারা সংগীত পরিবেশিত হত খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে ইউরোপে পৌরণিক নাটক গড়ে ওঠে। খ্রিষ্টধর্মের প্রধান উৎসব বড়দিন বা ক্রিসমাস ও ইস্টার উপলক্ষ্যে নাটক রচিত হয়। এই পৌরানিক নাটকগুলি প্রধান অবলম্বন যীশু খ্রিষ্টের জীবনকাহিনী। যীশুর জন্ম থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত নানান ঘটনা সামগ্রিক বা আংশিকভাবে পৌরাণিক নাটকে ফুটে উঠেছে। আদিযুগের নাটকগুলি লেখা লাতিন ভাষায়। পরবর্তীকালে ইংরেজিতে এই জাতীয় লেখা হয়। এগুলিকে বলা হয় মিস্ট্রিপ্লে (Mystery play)। "Mystery plays and miracle plays are among the earliest formally developed playes in medieval Europe. Medieval mystery plays focused on the representation of Bible stories in churches as tableax with accompanying antiphonal song. They told of subjects such as the creation, Adam and Eve, the murder of Abel, and the last judgement." - এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় মিস্ট্রি প্লে ছাড়াও 'মির‍্যাকল প্লে' ও লেখা হয়েছে যা এই শ্রেণীর নাটক। এর বিষয়বস্তু যীশু খ্রিস্টের জীবন। খ্রিস্ট সাধু - সন্তদের কাহিনী। এই নাটকও ধর্মীয়। অন্যত্র বলা হয় 'A religious play in the Middle Ages based on a story from the Bible."

টিপ্পনী

আমাদের দেশে আদিযুগ থেকে পুরাণকাহিনী ভিত্তিক নাটক লেখা হয়েছে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'। ভবভূতির 'মহাবীর চরিত্র', 'উত্তররামচরিত্র' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকগুলি পুরাণ - মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এগুলি সবই মিলনান্ত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতেই বাংলা মৌলিক নাটক রচনার শুরু। শুরু থষেকে পুরাণভিত্তিক নাটক লেখা হয়েছে। উনিশ শতক নবজাগণের শতক। এই সময় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছিল। সেইজন্য উনিশ শতক জুড়ে পৌরাণিক নাটক লেখা হয়েছে। তার উপর রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের ভক্তিবাদী আন্দোলনেদর জেদরেও ভক্তিমূলক নাটক তথা পৌরাণিক লেখা হয়। নাট্যতাত্ত্বিক অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "মধ্যনযুগের বাংলা সাহিত্যের আধ্যাত্মবোধের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্য হইতে আগত বাস্তব জীবনবোধের সংমিশ্রণের মুখ্যফলস্বরূপ বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির জন্ম হইয়াছে।" একথা ঠিকই যে আমাদের ধর্ম ভক্তিবাদ অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। তাই পাশ্চাত্য পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে বাংলা পৌরাণিক নাটকের পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের পৌরাণিক নাটক অপার্থিব প্রণয়রসের সজীব ধারা।

প্রথম বাংলা পৌরাণিক নাটক তারাচরণ শিবদাসেদর 'ভদ্রার্জ্জুন'। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান' ; মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'; কালিদাস সান্যালের 'নলদময়ন্তী', মুক্তাবলী নাটক' ; বিপিনবিহারী দের 'জাহ্নবীবিলাস'; হরিশচন্দ্র মিত্রের 'প্রহল্লাদ নাটক'; 'জয়দ্রথবধ' ইত্যাদি প্রথম যুগের বাংলা পৌরাণিক নাটক। কিন্তু এই নাটকগুলিতে পৌরাণিক নাটকের থেকেও গুরুত্ব পেয়েছে নারীর স্বতন্ত্র চেতনা। সেইজন্যই নাট্যতত্ত্ববিদরা মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটকটিকে প্রকৃতঅর্থে প্রথম বাংলা পৌরাণিক নাটক বলা যায়। গ্রাম্যতা বর্জিত করুণ রস নাটক 'রামাভিষেক'। আঙ্গিকটি গদ্য - পদ্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। আছে গান, মনোমোহনের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'সতী'। দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ, শিণিনিন্দা, পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতীর দেহত্যাগ এর কাহিনী নাট্যাকারে প্রকাশিত। কিন্তু করুণরসের নাটকটি বিয়োগান্তক। সেইজন্যই 'হর-পার্বতী' নামক মিলনান্তক একটি অঙ্ক পরবর্তীত নাটক যুক্ত হয়। মনে পড়ে যায়, ভবভূতিও তাঁর উত্তরামচরিত নাটকে রাম - সীতার বিচ্ছেদকে রামের স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে শেষ অবধি যুগলমূর্তির চিরমিলনের মধ্যে দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাট্যকার হলেন - ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও

গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটক 'নরনারায়ণ'। ধর্মীয় ভাবাবেগ ও পুরাণের উচ্ছাস প্রচারিত হলেও এ নাটক নিছক আধ্যাত্মিক ভাব পরিমন্ডিত নয়। এখানে আছে বস্তু সচেতনতা ও যুক্তিবাদী চিন্তন। এ নাটকের নাম ছিল 'কর্ণ' পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনয় করার সময় নাম দেন 'নরনারায়ণ'। নররূপী শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ রূপের প্রকাশ। কর্ণের কৃষ্ণ বিরোধিতার সূচনা অবিশ্বাস দিয়ে, সমাপ্তি বিশ্বাসপ্রাপ্তির আলোকে।

তবে বাংলা নাট্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম পৌরাণিক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য গিরিশচন্দ্র জানতেন, "হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্মে। মর্মাশ্রর করিয়া নাটক লিখতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। ওই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভাষণ তরবারির ধারে উচ্ছেদ হয় নাই।" (পৌরাণিক নাটক প্রবন্ধ)

তাই অন্যান্য শ্রেণীর নাটক লিখলেও তিনি কিন্তু পৌরাণিক নাটক রচনাতেই জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য - 'পান্ডবগৌরব', 'রাবণবধ', 'অভিমন্যু বধ, 'লক্ষণ বর্জন', 'রামের বনবাস', 'সীতাহরণ' 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস'; 'দক্ষযজ্ঞ', 'ধ্রুবচরিত্র', 'নলদময়ন্তী', 'চৈতন্যলীলা, 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'বিল্বমঙ্গল', বুদ্ধদেবচরিত্র', 'শ্রীবৎসচিন্তা' প্রভৃতি। রামকৃষ্ণ নিষ্কাম ধর্ম, সবধর্মসমন্বয় ও অদ্বৈতবাদের আদর্শ এই জাতীয় নাটকের বিশেষ সম্পদ। আছে দৈবানুগ্রহ ও অদৃষ্টবাদ। দবতা ও মানুষের সরাসরি সংগ্রামে কৃষ্ণের প্রভাব দর্শকদের সামনে বড় করে ব্যক্ত হয়েছে। কর্মকে গৌণ করে ভক্তি, বিশ্বাস ও লীলার প্রাধান্য প্রকাশিত।

একটি বাংলা পৌরাণিক নাটক :

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা' নাটকটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক। নাট্যকার 'জৈমিনী মহাভারত' থেকে কাহিনীটি নিয়েছিলেন। পান্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াটিকে আটক করেছিল নীলধ্বজপুত্র প্রবীর। ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে অসমযুদ্ধে প্রবীরের মৃত্যু হয়। নীলধ্বজ প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ। তিনি পান্ডবদের সঙ্গে বিরোধে যাননি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী জনা পান্ডবদের বিরোধিতায় পুত্র হত্যার প্রতিশোধের জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হন। নাটকটিতে একদিকে আছে নীলধ্বজের মতো ভক্তিমান পুরুষ, যিনি প্রথম থেকে শ্রীকৃষ্ণমহিমা সম্পর্কে অবণত। অন্যদিকে প্রবীর ও জনার দেশপ্রেম, বীরত্ব, মাতৃভক্তি ইত্যাদি। পুত্রহত্যার প্রতিশোধপরায়ণ জনার যে যন্ত্রণা তা অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি।

টিপ্পনী

বরং শোকদগ্ধ মৃত্যুতে নয়, নাট্যকার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন প্রশান্ত জগতে এক অলৌকিক দৃশ্যে স্থাপন করে শেষ পর্যন্ত ভক্তির জয় ঘটে।

নাটকটিতে শ্রীকৃষ্ণ, পান্ডব, নীলধ্বজ, জনা, প্রবীর, বৃষকেতু, অগ্নি প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহ ইত্যাদি টপকে প্রধান হয়ে উঠেছে ভক্তিভাব। নাটক ধরে মূল রস ভক্তিরস। দেশপ্রেম -মাতৃহৃদয়ের হাহাকার - প্রতিহিংসার জ্বালা - সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ভক্তিরস। তাই এটি সার্থক পৌরাণিক নাটক।

টিপ্পনী

সামাজিক নাটক (Social Drama)

সাহিত্যের উপজীব্য মানুষ। কোন মানুষ ? সামাজিক মানুষ। সুতরাং যে কোনো নাটকেরই উপজীব্য সমাজ। তাই যে কোনো নাটকটি সামাজিক নাটক। কিছু নির্দিষ্টভাবে সামাজিক নাটক বলতে বোঝান হয়, যে নাটকে সমকালীন মানবজীবন বাস্তবকে রক্ষাকরে সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত হয় আছে সামাজিক নাটক বলতে পারি। এই নাটকে রাজনৈতিক, ধর্মীয়,অর্থনৈতিক, জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়- বর্ণ - পরিবারগত বিরোধ - দ্বন্দ্ব, মিলন - বিচ্ছেদেরজনিত সংকট প্রকাশ পায়। কখনও ব্যাক্তির বিপরীতে থাকে পরিবার - সম্প্রদায়, জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ আবার কখনও অন্যরকম সামাজিক অবস্থা। সবমিলিয়ে সমাজ সংক্রান্ত সমস্যার প্রকাশ ঘটে যে নাটকে তাই সামাজিক নাটক।

ভিক্টর টিউডর সামাজিক নাটক বলতে বুঝিয়েছেন - "..... a sequence of socijal interaction of a conflictive, competitive, or agonistic type." এম, এইচ. আব্রামস্ ও জিওফ্রে হারফাম তাঁদের 'A Handbook of Literary Terms' গ্রন্থে Social Novel বলতে যা বলেছেন সেটাই আমারা Social Drama -র ক্ষেত্রে বলতে পারি - " The Social novel (drama) emphasizes the in fluence of the social and economic conditions of an era on shaping characters and determining events; often it also embodies an implicit or explicit thesis reomending political and social reform."

সামাজিক নাটকের লক্ষণগুলি -

(১) সামাজিক নাটক মূলত সমাজসমস্যামূলক নাটক। এই সমস্যা সমকালীন সমাজ থেকে নেওয়া হয়।

(২) সামাজিক নাটক বাস্তবনির্ভর। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন - "এই জাতীয় নাটকের প্রাথমিক লক্ষ্য বাস্তব জীবনের যথাযথ অনুসরণ"।

(৩) নাট্যকারের একটা সামাজিক দায় থাকে। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি সমাজের আঁধারময় দিকটিকে তুলে ধরেন।

(৪) অসহায় - নিপীড়িত - লাঞ্ছিত - বঞ্চিত মানুষগুলির ভাষারূপ পায় সামাজিক নাটকে।

(৫) বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বিশেষ চরিত্রের গভীর জীবন সমস্যা সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে। আসলে ব্যক্তি বিশেষ থেকে নির্বিশেষে পৌঁছে যান নাট্যকার।

(৬) আঞ্চলিক বা পারিবারিক সমস্যাও সামাজিক নাটকের বিষয় হতে পারে।

(৭) যেহেতু বাস্তবই প্রধান তাই কল্পনার স্থান খুব কম। এই কল্পনা বিশ্বাস্যভাবে পরিবেশিত হয়।

(৮) এই জাতীয় নাটক বক্তব্য প্রধান। সামাজিক দিক বক্তব্যে প্রাধান্য পায়।

(৯) সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ - সমাজের পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের ফলে সামাজিক নাটকেও পরিবর্তনের প্রভাব ফেলে।

(১০) কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক নাটকে সমাজ সংস্কারের আগ্রহ প্রকাশ পায়। তবে শিল্পরসকে ব্যাহত কচরে শুধু উদ্দেশ্যমূলক নাটক সার্থক হতে পারে না।

(১১) নাট্যকারের সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি সামাজিক নাটকে ব্যক্ত হয়।

(১২) সামাজিক নাটক এই শ্রেণীটি বিভাগটি বিষয়ভিত্তিক তাই আঙ্গিকগতভাবে সামাজিক নাটক ট্র্যাজেডি বা কমেডি হতে পারে। এমনকী প্রহসনের বিষয়বস্তু ও সমাজসমস্যাভিত্তিক।

(১৩) ট্র্যাজেডি বা কমেডি বা প্রহসণ - এই আঙ্কিগত শ্রেণীভেদ অনুযায়ী নাটকের নাটকীয় রস করুণ, হাস্য বা কৌতুকময় হতে পারে।

(১৪) এই জাতীয় নাটকে আএগের থেকেও বুদ্ধিবৃত্তইর উপর জোর দেওয়া হয়।

সামাজিক নাটকে অধ্যাপক নাট্যতত্ত্ববিদ দ. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় চারটি বিভক্ত করেছেন। -(ক) সাধারণ সামাজিক নাটক (খ) সমস্যামূলক সামাজিক নাটক (গ)

টিপ্পনী

ব্যাক্তি সমস্যামূলক সামাজিক নাটক (ঘ) পারিবারিক সামাজিক নাটক - এই শ্রেণীবিভাগ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে কোনটি কোন ধরণের নাটক।

টিপ্পনী

জীবন যত আধুনিক হচ্ছে তত তার জটীলতা বাড়ছে ল বাড়ছে আদর্শহীনতা, ব্যাক্তিসংঘাত, মানবিকতাহীনতা। এর ফলে যে সংকট তৈরি হচ্ছে সেখান থেকেই সামাজিক নাটকের সৃষ্টি। জীবনের যথাযথ অণুসরণ যেহেতু করা হয় তাই সঞ্চেও সেই নিখুঁত বাস্তবের অভিনয় করা হয়। ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের মতে - "যে বাস্তব দৈনন্দিন, স্থূলল এবং কুৎসিত, বিশেষ করে সেই বাস্তবকে এ পর্যন্ত নাটকে গ্রাহ্য করাহয়নি বলে বাস্তববাদীরা নাটকে তাই দেখাতে চান। মজুর, মিস্ত্রী, দালাদ, দোকানদার, প্রবঞ্চক, পতিতা ইত্যাই সমাজের তথাকথিত অবহেলিত চরিত্রই এই জাতীয় ভীড় করে বেশি।" (সাহিত্যের রূপরীতি)

একইসঙ্গে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন - এই বাস্তববাদের চরম রূপ হলো ন্যাচারালিজম বা অতিবাস্তবতা।

এই বাস্তববাদের সমর্থক ঔপন্যাসিক এমিল জোলা সামাজিক নাটকে পরিবেশের সঙ্গে কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ওপর নজর রেখেই ম্যাক্সিম গোর্কি লিখলেন - 'দ্যা লোয়ার ডেপ্হাস' এবং 'ও কেসি লিখললেন - 'দ্যা প্লাউ অ্যান্ড দ্যা স্টারমা'। এই দুটো নাটকেই অসামর্জিত পরিবেশের মানুষগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

নারীর প্রচলিত সতীত্বের তথাকথিত পবিত্র আদর্শের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে নোরা হেল্মার। নারী স্বাধীনতাহীনতা সমস্যাটি অসাধারণভাবে ফুটে উঠল হেনরি ইবসেনেয় 'এ ডলস্হাউম' (A Doll's House) নাটকে। তাঁর ঘোস্টয় (Ghosts), অ্যাজ এবিমি অব দ্যা নিপল (An Evemy of the people), দ্যাওয়াটল্ড ডাক(The Wikd Duck) -প্রভৃতি এই জাতীয় নাটক। আরেক বিখ্যাত সামাজিক নাটকের রূপ জর্জবার্নান্ডস। শ' এর নাটকগুলির মধ্যে আছে 'উইডোয়ারস্ হাউস (Widowers' House), মিসেস ওয়ারলেস্ প্রফেশনন (Mrs. Warren's Profession), 'ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান (Man and Superman) ইত্যাদি। জন গণসত্ত্বয়াদির নাটকও এই শ্রেণীর অংতর্ভুক্ত। যেমন - আ ফ্যামিলিম্যান (A Familyman), অ্যাবরাকা ভাবরা (Abracadabra), দ্যা স্নো (The Snow) ইত্যাদি।

বাংলা নাট্যধারা সূচনা থেকে সামাজিক নাটক লেখা রামায়ণ তর্করত্ন তৎকালীন

কৌলিন্যপ্রথার বিরোধিতা করে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি লেখেন। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'; দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী'; 'জামাইবারিক'; গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল'; 'বলিদান, 'মায়াসাজ', 'হারানিধি'; মীর মোশাররফ হোসেফের 'জমীদার দর্পণ' ইত্যাদি উনিশ শতকের সামাজিক নাটক । বিশ শতকের মধ্যে উল্লেখযোগভ দিনিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তুলসী লাহিড়ির 'দুঃখীর .....", "ছেঁড়া তাঁর'; বিজন ভট্টাযার্য্যের 'নবান্ন', 'দেবীপর্জন'; 'কৃষ্ণপক্ষ' ইত্যাদি । পরবর্তীকালে উৎপল দত্ত্ মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, তীর্থংকর চন্দ্র, ব্রাত্যবসু প্রমুখরা এই জাতীয় মঞ্চ সফল নাটক লিখেছেন।

একটি সামাজিক নাটক :

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকটি শুধু নাট্যকারের নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক । উনিশ শতকে কলকারা শহরের একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের ভাঙনের আঁচ লেগেছিল । সেই ভাঙনের ছবিই ধরা পড়েছে পাঁচ অঙ্কের 'প্রফুল্ল' নাটকে।

বয়স্কল যোগেশ যৌথ পরিবারের কর্তা ও বড়ছেলে। সে উদারমনা, সৎ ও সম্পন্ন ব্যবসায়ী । মা উমাসুন্দরী, স্ত্রী জ্ঞনদা, মেজ ভাই রমেশ ও তার স্ত্রী প্রফুল্ল, পুত্র যাদব, অবিবাহিত ছোট ভাই সুরেশকে নিয়ে তার সুখের সংসার।

একজন যময় খবর আসে রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল করেছে। যোগেশের জীবনের যাবতীয় সম্পদ জমানো ছিল এই ব্যাঙ্কে। দলে শুরু অর্থ কষ্ট । পাওনাদারেরা তাগাদা বাড়ায়। আর যোগেশ অসহায় হয়ে পড়ে ও মদ্যপানের মাত্রা বাড়ায়। অন্যদিকে মেজভাই উকিল রমেশের জন্য সম্মানহানি হতে থাকে। যোগেশ যখন সংসার বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে তখন মেজভাই রমেশ ষড়যন্ত্র করছে নিজসম্পত্তই বাড়াবার। যোগেশকে দিয়ে সব সম্পত্তই লিখিয়ে নেয় নিজেদর নামে। ভাই সুরেশকে জেলে পাঠায় মিথ্যা অভিযোগ। লোভের বশে ভাইপো যাদবকে হত্যা করতে গেলে বাধা দেয় স্ত্রী প্রফুল্ল। ভাগ্যের পরিহাস যে, রমেশের হাতে নিহত হতে হয় প্রফুল্লকে। মা পাগলিনী হয়ে যায়। যোগেশের হাহাকার ভেসে আসে - "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল"।

উনিশ শতকের যৌথ পরিবার ভেঙে যাবার সমস্যা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তৎকালীন বাস্তব জীবনকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন নাট্যকার। কলোনীয়াল জীবনের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মূল্যবোধহীনতা 'প্রফুল্ল' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। যোগেশ - রমেশের পরিবার একটি বিশেষ পরিবার নয়, তৎকালীন একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিনিধি স্বরূপ। একটি পরিবারের ভাঙন থেকে তৎকালীন সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। মৃত্যু - উন্মাদ হয়ে যাওয়া জেলবন্দী হওয়া - এসবের উপস্থিতি নাটকটিকে অতিনাটকীয় করে তুলেছে। তবে একটি সার্থক সামাজিক নাটক হিসাবে 'প্রফুল্লকে' অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রহসন :

সে স্বল্পায়তন নাটকের স্থূল রুচির লঘু রসের প্রকাশ ঘটে তাকে প্রহসন বলে। প্রহসন শব্দের ইংরাজী পরিভাষা 'Farce'। শব্দটির উৎপত্তই লাতিন farsus থেকে farsus এর অর্থ হল Stuffed অর্থাৎ লঘু কল্পনাসিঞ্জ অতিরঞ্জিত এক ধরনের হাস্যোজ্জ্বল নাটক। ইংরেক সমালোচকদের ভাষায় -

"The Type of drama stuffed with low humour and extra vagant wit."

আচার্য ভরত নাট্যশাস্ত্রগ্রন্থে 'দৃশ্যশ্রব্যক্রীড়নীয়ক' এ যে দশটি ভাগের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অণ্যতম প্রহসন।

"হাস্যোদ্দীপক কাব্যন্তু প্রহসনম ইতি স্মৃতম্।"

অর্থাৎ সামাজিক অপোকৃতির উদসার্চণ ও শোধনার্থে যে ব্যাঙ্গাত্মক নাটক রচিত হয় তাই সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে প্রহসন নামে আখ্যায়িত।

অজিতকুমার ঘোষ প্রহসন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন -

"ঐশী শক্তি না থাকিলে সে প্রকার প্রকৃত কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনাশক্তি ও রসবোধ এবং প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব না থাকিলে সেইরূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করা দুষ্কর।"

এবারে আমরা প্রহসনের বৈশিষ্ট্য গুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

১. প্রহসনে জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতির চিত্র আঁকা হয় সএই চিত্র প্রহসনকারের সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম দুর্বলতম কলঙ্কময় স্থানগুলি নিয়ে অঙ্কিত হয়। তাই প্রহসনের বিষয়বস্তু হয় বহু আলোচ্য।

২. সমকালীন বহু আলোচ্য কাহিনী হলেও কল্পনার অতিরঞ্জনের মাধ্যমে প্রহসনের কাহিনী

বাস্তব হয়েও কিছুটা অবাস্তব হবে।

৩. প্রহসনের কাঠামো এক অঙ্কে বিন্যস্ত হওয়া প্রবোজন। সর্বোচ্চ তিন অঙ্ক পর্যন্ত হতে পারে। প্রহসন সর্বদাই ছোটো হবে।

৪. প্রহসনের চরিত্রগুলি হয় মূলত টাইপধর্মী। সমাজে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে তারা।

৫. অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রহসনের বিন্যাস হয় নকশাধর্মী। খন্ড খন্ড কতকগুলি চিত্র রচনার মাধ্যমে প্রহসনকার প্রহসনকে পূর্ণাতা দেন।

৬. প্রহসনেদর চরিত্রগুলি তার নিজের ভাষায় অর্থাৎ বিশেষ অঞ্চলের ভাষাগত বৈচিত্র রক্ষা রে কথা বলে।

৭. নাটিকদ্বন্দ্ব সৃষ্টির বিশেষ অবকাশ না মিললেও চাতুর্য পূর্ণ নাট্য Situation সৃষ্টির প্রহসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৮. অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি প্রহসনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৯. সামাজিক, ধর্মীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির চিত্র নিয়ে প্রহসন রচিত হলেও এই শ্রেণীর রচনায় কোনো নীতিবাদ উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

১০. ঘটনা ও চরিত্রের অতিরঞ্জন ও রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে জীবনের খন্ডাংশের এক উপভোগ্য নাট্যাল্লেখ্য পরিবেশন করা হয়।

১১. ভাবরসের গভীরতা এখানে অনুপস্থিত।

১২. আদর্শবাদ স্থান পায় না।

প্রহসনের গঠনগত দিক আলোচনার পরিশিষ্ঠে এই শ্রেণীর নাটকের রসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া আবশ্যক। লঘু কমেডির মতো প্রহসনেদর রসগত দিক ধেকে বিভাগ তিনপ্রকার -

১. হিউমার প্রধান (umour), ২. উইট প্রধান (Wit), ৩. স্যাটায়ার প্রধান (Satira)। আদিরসাত্মক কিংবা অঙ্গভঙ্গ যুক্ত প্রহসন আধুনিক সংস্কারে অপাংক্তেয় আধুনিক বাংলা প্রহসন নাটকের মতো সংবদ্ধ কল্পনার সঙ্গে অনেকটা সম্পর্ক রেখে চলে।

বাংলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও আধুনিক ধর্মী প্রহসনের ইতিহাস একেবারে নতুন। মোটাদাগের হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস ত্যাগ করে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মধুসূদন রচনা করেন কালজয়ী দুটি প্রহসন।

- "একেই কি বলে সভ্যতা?"

- "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।"

এরপর আমরা দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশীর সঙ্গে বিখ্যাত প্রহসনটি পেয়েছি। তারপর বাংলার প্রহসন নানান দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে। আধুনিক কালের মনোজ মিত্রের 'নরকগুলজার' একটি উল্লেখযোগ্য প্রহসন।

একটি বাংলা প্রহসন :

মধুসূদন দত্তর 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' বাংলা ভাষার অণ্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন। আমরা প্রহসন এর সার্থকতা বিচার করতে পারি।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' দুই অঙ্কের মাত্র চারটি গর্ভাঙ্কের ছোট নাটক, প্রহসনের আয়তনকে অস্বীকার করে না।

মধুসূদন গ্রাম্য জমিদার ভক্তপ্রসাদের ব্যাভিচার ভন্ডামিকে প্রকাশ করেছেন। ভক্তপ্রসাদ বাইরে সাধুপুরুষ। মালা জপ করা, ঠাকুরের নামকীর্তন, মন্দিরে দেবদর্শন, সন্ধ্যাহ্নিক, প্রতি সোমবার হবিষ্যি পালন করা তার নৈমিত্তিক কাজ। অথচ এই লোকটি জোর করে খাজনা আদায় করে, ব্রাহ্মণের দেবোত্তর জমিন কৌশলে আত্মসাৎ করেন। আবার ভক্তপ্রসাদের নারীলোলুপতার প্রবল। কোনো সুন্দরী নারীর কথা শুনলে তাকে পাবার জন্য সে উতলা হয়ে ধওঠে। পীতম্বর তেলীর মেয়ে পঞ্চীর রূপযৌবন দেখে আকুল হয়। আবার হানিফের স্ত্রী সুন্দরী শুনে তাকে করায়ত্ব করার জন্য গদা ও পুঁটিকে নিয়োগ করে। অথচ এই মানুষটি পুত্র যাতে ধর্মপরায়ন থাকে সেদিকে নজর রাখে। মধুসূদন এরকম মানুষের ভন্ডামি ও কপটতাকে তুলে ধরলেন প্রহসনটিতে। এটি প্রহসনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সামাজিক অনাচারী প্রহসনের সে অণ্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটাই মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' তে দেখা যায়।

প্রহসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হাস্যরস। সে হাস্যরস যেমন হিউমার আবার তা 'Extra xvegant wit' - ও। অর্থাৎ নির্মল হাস্যরস ও ব্যাঙ্গকৌতুকের বিদ্রুপ দুই আছে এখানে। ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে দেখা যায় ভক্তপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে তার চাকর গদা নরম বিছানায় গা ডুবিয়েছে। কর্তাবাবুর হুকোয় অম্বুরী তামাক খেয়েছে, চাকর রামকে দিয়ে গা টিপিয়েছে। এই অংশে নির্মল হাস্যরস ফুটে উঠেছে। আবার ভক্ত প্রসাদের

পোশাক - তামাক, তার কাব্যরস রোধ বিদ্রুপাত্মক হাস্যরসের সঞ্চার করেছে। পরম হিন্দু বৈষ্ণব ভক্তপ্রসাদ মুসলমান নারীর প্রতি উতলা হয়ে বলেছে - ' স্ত্রী লোক তাদের আবার জাত কী ?" ভক্তপ্রসাদের এ উত্তরের প্রত্যুত্তরে আমাদের মনে যে কথাটা আসে সেটাই গদা বলেছে। 'নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায় ; কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না, বাঃ! বাঃ! কত্তাবাবুর কি বুদ্ধি !" এগুলি বিদ্রুপাত্মক ব্যাঙ্গকই প্রকাশ করেছে।

তৎকালীন সামগ্রিক জীবন চিত্র কিন্তু প্রহসনটিতে ফুটে ওঠেনি । বরং গ্রাম জীবনের সামগ্রিক খন্ডাংশের ছবি চিত্রিত হয়েছে, যা প্রহসনের একটি বৈশিষ্ট্য। ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের অতিরঞ্জন ও রঙ্গব্যঙ্গ প্রহসনটিকে বীশিষ্ট করে তুলেছে।

আবার রাতে শিবমন্দিরে হানিফের হঠাৎ করে উপস্থিত হাস্যরসের সঞ্চার করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তপ্রসাদের নারীলোলুপতার দিকটি জনসাধারণের সম্মুখে আসে । ভূত হিসেবে তার উপস্থিতি, অদ্ভূত অঙ্গভঙ্গি ও রহস্যমোচন প্রহসনটিকে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' সার্থক করে তুলেছে।

রূপক - সাংকেতিক নাটক :

ইংরেজি 'allegory' শব্দটি গ্রীক 'allegoria' শব্দ থেকে এসেছে। এর বাংলা প্রতিশব্দ 'রূপক'। রূপকে একটি গল্প থাকে সে গল্প গদ্য অথবা পদ্যে রচিত হয়। গল্পের দুটো মুখ থাকে। এক মুখে আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত গল্প কথিত হয়। আর অন্য মুখে এই গল্পের সমান্তরাল অন্তর্নিহিত ভিন্ন বিষয় অর্থবান হয়ে ওঠে। সুতরাং রূপকের আড়ালে রচয়িতা অন্য কথা বলেন - ভিন্ন তাৎপর্য উদঘাটন তিনি করেন। আর পাঠক তার বুদ্ধি দিয়ে এই তাৎপর্য অণুধাবন করেন। কিন্তু সঙ্কেত ? একটি শিলাখন্ড বিরাট ও ভূসার ব্যাঞ্জনা বহন করে। একটি শালগ্রাম শিলাকে আমরা ভুবনবভাপ্ত ঈশ্বর জ্ঞান করে থাকি। সকালে সুস থেকে উঠে আমরা যখন ছোট ওঠোনটকুর মাটি ভিজে দেখি তখন বুঝতে পারি রাতে বিরাট আকাশ ধেকে বৃষ্টি হয়েছে। এই বিরাটের উপলব্দি আমাদের এনে দেয় সংকেত বা সিম্বল। আমাদের অনুভব ও বোধের সঞ্চারে তাই সংকেতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এই জাতীয় নাটকের উদাহরণ জজ অরওয়েলের 'অ্যানিম্যাল ফার্ম', সি. এস লুইসের 'দ্যা গ্রেট ডিভোর্স' ইত্যাদি । বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'রাজা' ইত্যাদি নাটকগুলি এর উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকে রূপক ও সংকেত যুগপৎ জড়িবে আছে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নাটকের তত্ত্বকথা ও তাৎপর্য নাট্য-রূপক নিষ্কাশন করে পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকে আরও বড় কিছু, বিরাট কিছু আছে যা রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। তখনই সংকেত অনিবার্য ও জরুরি হয়ে ওঠে। নাট্য অভিপ্রায় -এর লক্ষ্যভেদে তখনই সংকেতের প্রয়োগ হয় । তবে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর একখানি নাটকে সমানুপাতিকভাবে যে রূপক সংকেতের প্রয়োগ হয়েছে তার নয়। - কোনো নাটকে কোনোটি বেশি বা কম।

রবীন্দ্রনাথের রূপক - সাংকেতিক নাটকে সাধারণভাবে আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত কোনো গল্পই থাকেনা। গল্পের নিরূপিত ছক এ জাতীয় নাটকে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। গল্পের কিছু ভাগ অংশ ও আভাসকে আমরা সাজিয়ে নিতে পারি মাত্র।

খুব নিটোল না হলেও গল্পের একটা গড়ন 'মুক্তধারা' নাটকে আছে উত্তরকূটের রাজা রনজিৎ তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত শিবতরাইয়ের প্রজাদেদর সর্বস্ব লুট করার নিপুন কাঠামো গড়ে তুলেছেন । যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়ে তিনি মুক্তধারা ঝর্ণাকে বেঁধে দিয়েছেন । ফলে শিবতরাইয়ের মানুষের তৃষ্ণার জল রনক তাদের চাষের ক্ষেত ও শুকিয়ে গেছে। উৎপাদন নেই তবুও রাজা প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে ছাড়েন না। উপরন্তু উত্তরকুটের নদিসংকটের পথ তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। এর ফলে শিবতরাই বাণিজ্য ও বন্ধ। এইভাবে রাজা শিবতরাইয়ের অর্থনীতি পঙ্গু করেছেন - তাদের ভাতে মেরেছেন, তাদের প্রাণে মারতেও তিনি উদ্যত। যন্ত্রবাঁধ নির্মাণে তো কত তরতাজা যুবকের মৃত্যু ঘটেছে। নাট্যগল্পের আড়ালে যন্ত্রের অপব্যবহার করে যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে তারই একটা বিশ্বস্ত ছবি আমরা পেয়ে যাই। এটা যে-কোনো দেশে, যে কোনো কালের ছবি। তবে অনেকে এটা আমাদের দেশে কালগত ছবি বলেই মনে করেছেন । সাম্রাজ্যবাদী শোষক ইংরেজের বিরুদ্ধে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন হিসেবে তাঁরা এটিকে দেখতে চেয়েছেন। যদিও স্বয়ং নাট্যকারের কাছে এরকম দেখাটা ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। আসলে শোষক ও সাম্রাজ্য লোলুপ শক্তির হাতে যন্ত্রের অপব্যবহার মানবিকতার পক্ষে কতখানি ভয়ংকর হতে পারে নাট্যগল্পের আড়ালে, রূপকের মোড়কে এই তত্ত্বটিই। এই তাৎপর্য ই একাগ্র হয়ে উঠেছে । যন্ত্রলালিত সভ্যতার এই অন্ধকার অধ্যায়টিই নাটকে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

'মুক্তধারা' নাটকে অমাবস্যার অংধকারের ব্যাপ্তি আছে। নাটকের শুরুতে ভৈরব মন্দিরের সমুচ্চ ত্রিশুল একদিকে, উল্টোদিকে যন্ত্রবাঁধ ঔদ্ধত্বের প্রতীক হয়ে আকাশকে ছুঁতে চেয়েছে। যন্ত্রের এই স্পর্ধা ভৈরব সহ্য করবেন কেন ? কারণ তা মানুষের পক্ষে

কল্যাণের নয়। তাই তিনি জাগেন - ভৈরবপন্থী সন্ন্যাসীদের গানে তিনি তুষ্ট। তিনি জাগেন। মুক্তধারার বাঁধে অভিজিৎ আঘাত হানলে জলস্রোতে তাঁর ডমরুধ্বনি শোনা যায়। তাই মুক্তধারা শুধু রূপক নয় সাংকেতিক ও নয় - রূপক ও সাংকেতিক দুয়েরই মিলিত নাটক। এখানেই রচণাটি অপূর্ব শিল্প সার্থকতা লাভ করেছে।

একাঙ্ক নাটক :

একাঙ্ক নাটকের আবির্ভাব সর্বপ্রথম ভারতবর্ষেই ঘটে। সংস্কৃত সাহিত্যে ভান, ডিম ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের একাঙ্কক নাটকের উল্লেখ ও উদাহরণ আছে। সানিতপরিসরে সামান্য একতি কহিনীর নাট্যরূপকেএকাঙ্ক নাটক বলে। নাট্য সাহিত্য ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন -

ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখন্ডতা, ঘণীভূত রসময়তা একাঙ্ক নাটকের অবিচ্ছেদ্য লক্ষ্যণ। আবার অধ্যাপক সাধন কুমার ভট্টাচার্যর মতে -

দেশকালের অবিচ্ছেদ বা ঐকান্তিক এককত্বকে আমরা একাঙ্কিকার অপরিহার্য লক্ষ্যণ বলে মনে করবো। স্থান - ঐক্য, কাল-ঐক্য এবং কার্য ঐক্যের আদর্শ সমন্বয়ের মধ্যেই একাঙ্কিকার বিশেষত নিহিত।

একাঙ্ক নাটক নাটকের ঐতিহ্যধারা মেনে চলে।একে Dramatic Work of single act বলা হয়। ছোটো গল্পের মতো একাঙ্ক নাটকও এই শতকে বিশেষভাবে চর্চিত ও সমাদৃত সাহিত্যের শিল্পরূপ। একাঙ্ক নাটক আদি, মধ্য, অন্ত সমন্বিত একটি বৃত্ত। দৃশ্যান্তর এই নাটকের রস নিবিড়তাকে ক্ষুন্ন করে বলে একটি বিশেষ ঘটনাকে আশ্রয় করে একটি বা দুটি চরিত্রকে একটি বিশেষ দৃষ্টি কোন থেকে বিশ্লেষণ করে স্বল্প পরিসরে একাঙ্ক নাটক তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়।

একাঙ্ক নাটকেদর এইসব আলোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্নয় থেকে আমরা একাঙ্ক নাটকের কিছু প্রধান লক্ষ্যণ খুঁজে পাই। সেগুলি হল - (১) তীব্র একমুখিনতা (২) সংবদ্ধতা ও বাহুল্য বর্জণ (৩) ত্রিবিধ ঐক্যের আদর্শ সমন্বয় (৪) ঘটনার দদ্রুতবিন্যাস (৫) নাটকের মৌলিক স্য অক্ষুন্ন রেখে প্রচুর স্বাধীনতা (৬) একটি মাত্র বিষয়ের প্রতি আনুগত্য।

এই সমস্ত লক্ষ্যণ সমন্বয় করে একাঙ্ক নাটকের একটি সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা পাওয়া গেছে তা হলো -

একাঙ্ক নাটক এক দৃশ্যে অভিনয় যোগ্য, দ্রুত ঘটে যাওয়া, বাহুল্যবর্জিত এমন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এক সংবদ্ধ নাটক যার প্রধান বৈশিষ্ট্য তিব্র একমুখিনতা অথচ নাটকের মৌল বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণ করা।

একাঙ্ক নাটকে অবান্তর বিন্যাস বাদ দিয়ে নাট্য পরিস্থিতিকে চরম কৌতুক হলোদ্দীপক করে কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে হলচে তা ক্লাইমেক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। একাধিক দৃশ্য নিয়ে একাঙ্ক রচনা হলেও বর্তমানে এক দৃশ্যেই একাঙ্ক সৃষ্টি হয়। অনেক সময় একটি মাত্র চরিত্রেই একাঙ্ক গঠন দেখা যায়। যেমন - গিরশংকরের 'শেষ সংলাপ' বা নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস'।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভার্সই প্রথম একাঙ্ক নাটক সূচনা করেন। তাঁর দূত ঘটোৎকচ, মধ্যম ব্যায়োগ, কর্নভার, উরুভঙ্গ ইত্যাদি নাটক একাঙ্কের দৃষ্টান্ত । বররুচির 'উভয়াভিসারিককা', শূদ্রকের 'পদ্ম প্রাভৃতক' ইত্যাদিও স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে প্রথম একাঙ্ক কোনটি বিতর্ক রয়েছে। ড. সুকুমার সেন অজ্ঞাত নাট্যকারের 'বল্লালী ঘাত নাটক' (১৬৫৮) প্রথম বাংলা একাঙ্ক বলেছেন। 'সাহিত্যসন্দর্শন' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র দাস উল্লেখ করেছেন গিরিশচন্দ্রের 'কৃষকেতু' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকদুটোর কথা গিরিশচন্দ্রেই বাংলা একাঙ্কর পথিকৃত একথা সমস্ত বাংলা নাট্যলোচকই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। বাংলা একাঙ্ক নাটক লেখেন বনফুল, শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ। একাঙ্ক নাটক এবং ছোটগল্পের স্বভাবগত ঐক্য রয়েছে। ভারতে একাঙ্ক ধারা সুপ্রাচীন হলেও বর্তমানের তীব্র আবেদনাত্মক একাঙ্কর যে ধারা প্রবাহিত তা পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবমুক্ত নয়। একাঙ্ক ও ছোটোগল্প উভয়েই আধুনিক যুগের সম্পদ।

'বিভাগ - খ

ছোটগল্প :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

মানুষের গল্প শোনার ইচ্ছা সেই প্রাচীনকাল থেকে। গুহাচিত্র বা শিলালিপিতে সেই গল্পেরই নিদর্শন। রূপকথা, উপকথা, পঞ্চতন্ত্র - এই গল্পশোনারই অঙ্গ। একটা সময় মজ দাদু, গাঁও বুড়োরা গল্প শোনাতেন। সাহিত্যেও সেই আখ্যানেরই পদধ্বনি। কিন্তু আখ্যানের ছোটগল্প নামক রূপটিকে আমরা পেয়েছি আধুনিককালে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক উইলিয়াম হেনরি হাডসন

তাঁর 'An introduction to the Study of Literature গ্রন্থে বলেছেন "A Short story must contain one and only to its logical conclusion with absolute singleness of Method."

ঐ একই আলোচনায় হাডসন আরও বলেছেন - " .....singlenes of aim and singleness of effect are therefore, the two great caunous by which we have to try the value of a short story as a piece of art ."

এম. এই. আব্রামস্ ছোটগল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ব্য করেছেন - "A Short story is a brief work of prose fietion, and most of the tedrms for analyzing the component, the types, and the narrative teehnques of the novel are applicable to the short story as well." [A glossary of Literary terms]

এইচ. জি. ওয়েলস বলেছেন - "A short story is, or should be, a simple thing, it aims at producing are single vivid effect; it has to seize the attention at the ont set, and never relaring, gather it together more and more until the climax is reached."

ছোটগল্প সম্পর্কে বাংলার লেখক - সমালোচকরাও আলোচনা করেছেন। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও ছোটগল্পকার। তিনি 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে বলেছেন - "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐকভ - সংকটের মধ্যে দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।" সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যথার্থই বলেছেন - "কবিতা যেমন হৃদয়ের একটি ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে ছোটগল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে।" (সাহিত্য)

তবে রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্পে লক্ষ্মণসহ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন -

ছোট প্রাণ ছোট কথা ছোট ছোট দুঃখ ব্যাথা
নিতান্তই সহজসরল।
স্ম্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

টিপ্পনী

তারি দু-চারটি অশ্রুজল

তারি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘন ঘটা

নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ

অন্তরে আতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ।

সবমিলিয়ে আমরা বলতে পারি - যা আয়তনের দিক থেকে ছোট, অনুভূতির দিক থেকে বিচিত্রমুখী, ভাবের দিকে থেকে সম্পূর্ণ / পূর্ণাঙ্গ গদ্যে লিখিত কাহিনীকে আমরা ছোটগল্প বলতে পারি।

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য :

(১) ছোটগল্প তাকেই বলা যায় যা একেবারে বসে পড়া শেষ করে ফেলা যাবে। অর্থাৎ এর আয়তন হবে ছোট। অবশ্য এই একবারে বসে পড়াটা এক পৃষ্ঠারও হতে পারে আবার একশ পৃষ্ঠার ও হতে পারে। বনফুল পোষ্টকার্ডের এক পৃষ্ঠায় একটি ছোতগল্প পর্যন্ত লিখেছেন।এরজন্য এম. এইচ. আব্রামস্ বলেছেন - "A Short story is a brief work of prose fiction"।

(২) ছোটগল্প আবর্তিত হয় একটিমাত্র ভাব (Impression) কে কেন্দ্র করে সমালোচক হাডসনের মতানুযায়ি - "Singleness of aim and singleness of effect ....."

(৩) ছোটগল্প পূর্ণাঙ্গ জীবনকে ধরে না ধরে জীবনের খন্ডাংশকে । এইজন্য ছোটগল্পে কোনো শাখাকাহিনী বা উপকাহিনী স্থান পায় না । কোনো কোনো সমালোচকবলেন, বুলস আই এর মধ্যে দিয়ে আলো ফেললে যেমননির্দিষ্ট স্থান আলোকিত হয়, তেমনই ছোটগল্প নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গড়ে ওঠে।

(৪) ছোটগল্পের চরিত্র সংখ্যা একদম প্রয়োজনমতো হয়ে থাকে। কখন কখনও গল্প মাত্রদুটি, এমনকী একটিমাত্র চরিত্র নিয়েও গড়ে ওঠে। চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও বিস্তার এখানে ঘটে না।

(৫) ছোটগল্প ঋজু টানটান - তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন । যেন জ্যামুক্ত তীরের শুরুথেকে শেষ অবধি ছুটে চলে। নিটোল ভাবকে গল্প ব্যক্ত করে।

(৬) ছোটগল্পেওর সমাপ্তিতে নাটকীয় হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাঙ্গ করি মনে হবে / শেষ হয়েও হইল না শেষ।'

(৭) ছোটগল্পের ভাষা ইঙ্গিতময়। প্রতীক -সংকেতের মাধ্যমে গভীর ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটে। শব্দচয়ন ও অলংকার প্রয়োগ ছোটগল্প বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে।

টিপ্পনী

(৮) ছোটগল্পে বিষয়বৈচিত্র্যের প্রাবাল্য দেখা যায়। যেকোনো বিষয় নিয়েই ছোটগল্প গড়ে উঠতে পারে। বাংলা গল্পও নানান বিষয়ে পা বাড়িয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে পারি - প্রেমবিষয়ক (রবীন্দ্রনাথের একরাত্রি); সামাজিক (শরৎচন্দ্রের অভাগীর স্বর্গ); মনস্তাত্ত্বিক গল্প (নারায়ন গাঙ্গুরির হাড়); পারিবারিক বা গার্হস্থ্য (রবীন্দ্রনাথের শাস্তি), অতিপ্রাকৃত (রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাল); সাংকেতিক (প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতা আবিষ্কার); ঐতিহাসিকল (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুয়াচন্দন); গোয়েন্দা (শরদিন্দুর পথষের কাঁটা); প্রকৃতিকেন্দ্রিক (বিভূতিভূষণ মৌরিফুল); রাজনৈতিক (মানিক ন্দ্যোপাধ্যায়ের হারানের নাতজামাও); দারিদ্র্যকেন্দ্রিক (তারাশঙ্করের তারিনী মাসি); বিজ্ঞাননির্ভর গল্প (সত্যজিৎ রায়ের বঙ্কুবাবুর বন্ধু); মনুষ্যতের প্রাণী (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিনী) ; হাস্যরসাত্মক (পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবা) ইত্যাদি।

বিশ্বসাহিত্যে আখ্যান ধর্মী কবিতা - গদ্য - রূপকথা উপকথা চিরকাল ছিল। উপন্যাস থেকে আলাদা হয়ে ছোট গল্প রূপরীতিটি স্বতন্ত্রভাবে এলো বলা যেতে পারে। উনিশ শতকে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল নেভেলেট (উপন্যাশিকা) এর মাধ্যমে। গ্রেট ব্রিটেনে প্রথম ছোটগল্পটির দাবিদার বোধহয় রিচার্ড ক্যাম্বারল্যান্ড (Richard Cumberland)। তাঁর 'রিমেকেবল ন্যারেটিভ', 'দ্যা প্রয়জেনার অব মন্ট্রেমস' ইত্যাদি গল্প এই জাতীয় নিদর্শন। তবে উনিশ শতকে ফরাসী গী দা মোপাসাঁ, ভিক্টোর হুগো, রাশিয়ান আন্তেন চেখভ, ইংরেজ রুইয়ার্ড কিপলিং, মেক্সিকানম্যানুয়েল গুইটিরেজ, নিকরাগুয়ান রুএন দারিও প্রমুখরাই বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের চর্চা শুরু করেন। এর সঙ্গেই নাম করতে হয় আমাদেদর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম ছোটগল্পের সার্থক প্রয়োগ ঘটালেন । এর আগে বঙ্কিমচন্দ্রে মেজদাদা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মধুমতী' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১২৮৪ বঙ্গাব্দ)। সেটাই প্রথম সার্থক বাংলা ছোটগল্প।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্পটি হল 'ঘাটের কথা' (১২৯১ বঙ্গাব্দ) । এর মধ্যে পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর দু-একটি লেখা। বীশ শতকের সূচনালগ্ন

থেকে বাংলা ছোটগল্প বহু বিচিত্র ধারায় বয়ে চলেছে। শরৎচন্দ্র - বিভূতিভূণ - তারাশংকর - মাণিক - সতীনাথ - নরেন্দ্রনাথ - কমলকুমার - মহাশ্বেতা প্রমুখ লেখক হয়ে আজও বহুদূরে বাংলা ছোটগল্প লেখা হয়ে চলেছে।

টিপ্পনী

একটি ছোটগল্প :

রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্প একটি কিছোর মনস্তত্ত্বের গল্প । প্রকৃতিপ্রেমী একটি বালকের গল্প। ফটিক চক্রবর্তী গ্রামের বালক বালিকাদের সর্দার। তার মাথা থেকে উদ্ভট সব খেলার আইডিয়া বেরোয়। সেইজন্য মাস্তল হবার জন্য রাখা কাঠের গুঁড়ি খেলা শুরু হয়। যদিও মাখন তা ভেস্তে দেয়। এরপর আগমন ঘটে বহুদিন প্রবাসে থাকা মামা বিশ্বম্ভরের। স্বামীহারা বোন জানায় ফটিক তাকে আতঙ্কে রাখে আর ছোট ছেলে মাখন সুশীল - সুবোধ। বিশ্বম্ভর ফটিকে কলকাতার নিয়ে যেতে চান। মাখনের জন্য মাও এই প্রস্তাব মেনে নেয়। আর ফটিক আনন্দে নেচে ওঠে। এতে মা একটু ক্ষুন্ন হলেও ফটিক মামাকে উত্যক্ত করে তোলে কলকাতা যাবার জন্য । মাখনকে তার ঘুড়ি লাটাই মার্বেলের মতো সম্পত্তই ভাইকে সত্ব ছাড়া দিয়ে যায় । কিন্তু কলকাতায় মামী এই অনাবশ্যকপরিবার বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হন। ফটিক কলকাতার স্কুলে ভর্তি হয়। কিন্তু ইট - কাঠের খাঁচা তার ভাল লাগে না । মনে পড়ে গ্রাম জুঈবন ও অবিচারিনী মাকে। ভালোলাগে না ক্লাসের পড়া। ফলে পড়া তৈরি হয় না । মাস্টারমসায়দের কাছে মার খায় এবং এতে মামাতো ভাইয়েরা অন্যদের থেকে বেশি বেশি আমোদ প্রকাশ করে। বাড়ির টানে এবং মামীও মামাতো ভাইদের অপমানের হাতথেকে বাঁচতে ফটিক গ্রামে ফিরতে চায়। পুজোর ছুটির ঢের দেরি দেখে সে আসুস্থ হলে পালাতে চায়। কিন্তু পথ খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত গুরুতর অসুসথ হে ফটিক প্রলাপ বকতে থাকে। জীবনের অকূল পাথার সে পার হতে চাইছে তার তল যেন পাচ্ছে না। এষ পর্যন্ত মা এসে পৌছায়। ফটিক তাকে বাড়ি যাবার কথা বলে পাশ ফেরে শোয়।

গল্পটি একটি মাত্র ভাবের - গ্রামের বা প্রকৃতির কলে বড় হয়ে ওঠা একটি ছেলে শহরের ইট- কাঠের খাঁচায় নিজের প্রাণস্বত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলে । শহরের অবহেলা - প্রকৃতিহীনতা - অপমান গ্রামজীবনের উচ্ছলতা - সজীবতাকে নষ্ট করে দেয়। ফলে প্রাণ হারায় কিশোর মন। গল্পটি একেবারে বসেই ড়তে হয়। চরিত্র ও প্রয়োজননুসারে সামান্য কয়েকটি মাত্র। মূলত এ গল্পটি ফটিক চক্রবর্তীর। গল্পটির প্রথমাংশ যেরকম দ্বিতীয়াংশে তার অভিমুখ বদোলাতে থাকে এবং সবশেষে নাটকীয় হয়ে ওঠে। পঠকের ফটিকের বেঁচে থাকা না থাকা এবং তার মা - ভাইকে নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও গল্পটি এখানেই সমাপ্ত হয় ল

গল্পটিতে টানটান গতিবেগ আছে । ফটিক গ্রামবাংলার সাধারণ ছেলে, রবীন্দ্রনথ বড়মানুষের ইতিহাস বিবৃত না করে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনীকে গল্পাকারে ব্যাক্ত করলেন। এখানেই গল্পটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত আমরা উপন্যাস ও ছোটগল্প - এই দুই আখ্যানের আঙ্কিত কিছু পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি।

প্রথমত : উপন্যাস একটি সমগ্র জীবনকে, জীবনের আদর্শকে তুলে ধরে । ছোটগল্প জীবনের খন্ডাংশকে চিত্রায়িত করে।

দ্বিতীয়ত : উপন্যাসে থাকে গল্পকাহিনী - উপকাহিনী। যেখানে ছোটগল্প একদমই মেদবর্জিত।

তৃতীয়ত : উপন্যাস শ্রথ হতে পারে। ছোটগল্পে স্লথতার কোনস্থান নেই। টান টান গতি ও ঋজুতা প্রাধান্য পায়।

চতুর্থত। উপন্যাস হল চরিত্র চিত্রশালা। ছোটগল্প অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠে, এমনকী একটি - দুটি চরিত্রেও গড়ে উঠতে পারে।

পঞ্চমত : উপন্যাসের থাকে চরিত্রের বিকাশ - প্রতিষ্ঠার ইতিবত্ত্। ছোটগল্পে সে সময় সুযোগ নেই। ..... দক্ষ কলমের আঁচড়ে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

ষষ্ঠত , উপন্যাসের ছোটগল্পের মতো চমকময় সমাপ্তি বা নাটকিয়তা না থাকাটাই সমীচীন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস :

"Some realistic novels make use of events and personages from the historical past to add interest and picturesed ueness to the narrative. What usually specify as the historical novel. - ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে এমন সংজ্ঞাই দিয়েছেন এম. এইচ., আব্রামস ত২আর 'A Handbook of Literary Terms' গ্রন্থে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইতিহাসের কাহিনী ও চরিত্রের আশ্রয় করে তাঁর অতীতচারী কল্পনায় ঔপন্যাসিক রচনা করেন ঐতিহাসিক উপন্যাস । ইতিহাসের অন্তলোকে উঁকি দিয়ে একটি বিশেষ যুগ ও তার কিছু নির্বাচিত ঘটনা তথা বিশেষ

টিপ্পনী

ব্যাক্তিত্বের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশা -নিরাশার ছায়াছন্ন দর্পনে ঔপন্যাসিক দেখে নেন নিজের ভাবভাবনা ও সম সময়ের মুখটিকে।

তথ্য বিশেষ তথ্যকে প্রকাশ করাই ইতিহাসের লক্ষ্য। ইতিহাস বিশেষ কে গ্রহণ করে ও ব্যাক্ত করে। সাহিত্য বিশেষকে দেয় ;নির্বিশেষ বা সামান্য' সত্যের মর্যাদা। অ্যারিস্টটল এই কারণে কাব্য ও সাহিত্যিকে ইতিহাসের চেয়ে উচ্চতর অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই পার্থক্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে উপন্যাসে ইতিহাসের নিছক যান্ত্রিক ও তথ্যনির্ভর কাহিনী ও চরিত্রের বিবরণ বাঞ্ছনীয় নয়। ইতিহাস ও সৃজনশীল সাহিত্যের এই চমকপ্রদ পরিণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষ অর্থবহ। "ইতিহাস পড়িব না আইনভানহো পড়িব ? ইহার উত্তর অতি সহজ দুই-ই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইনভানহো পড়ো। ..... কাব্যে যদি ভুল শিখি, ইতিহাসে তাহা সংশোধন করয়া লইব।" ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাস হওয়াটা প্রাথমিক নয়, তার উপন্যাস হয়ে ওঠাটাই বেশি জরুরি। তবে ইতিহাসের তথ্য সত্যকে অগ্রাহ্য বা বিকৃত করলেও তার চলে না।

এবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করা যাক -

বৈশিষ্ট্য :

(ক) সমসাময়িক জীবনের বিষয়বস্তু ও বাস্তব চরিত্র সমূহের পরিবর্তে ঐতিহাসিক উপন্যাসে উপন্যাসক বেছে নেন অতীত ইতিহাসের কোনো একটি বিশেষ সময় পর্ব যার প্রকাশ পায় লেখকের বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও প্রেমমুগ্ধতা।

(খ) উপন্যাসে বর্ণিতব্য যুগ তথা ঘটনা কাহিনীর প্রতি ঔপন্যাসিকে বিশ্বস্ত থাকতে হয়।

(গ) ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক, নায়িকা তথা প্রধান কুশীলব সকলেই ইতিহাসে সুপরিচিত, ব্যাক্তিত্ব। তাঁরা কেউ আপন কীর্তির বলে কীর্তিমান; আবার কেউ অপকীর্তির দরুণ অপযশপ্রাপ্ত নিন্দিত এইসব চরিত্রের রূপায়নে ঔপন্যাসিককে ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়।

(ঘ) মহাকাব্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই হৃদ্যতার কারণেই তার ভাষাকে হতে হয় গম্ভীর ও ধ্রুপদী যাতে করে বিশেষ দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়িয়ে কল্পনার আবিশ্ব স্পন্দিত বিস্তার মন্ত্রিত হয়ে ওঢে।

(ঙ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে থাকে মহাকাব্যিক বিস্তার, চরিত্রগুলি তাদের নিছক ব্যাক্তি পরিচয়ের পোশাক খুলে ফেলে মহাকালের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, একটি বীশেষ স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে উপন্যাস পায় বিশ্বজনীন ব্যাঞ্জনা।

(চ) ইতিহাসাশ্রিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণ অখুন্ন রেখেও তাদের যথেষ্ট প্রাণবন্ত করে তোলা ও উপন্যাসে জীবনভাবনা ব্যাক্ত করার ক্ষমতাই ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের কাছ ধেকে প্রত্যাশিত।

(ছ) বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত - উপন্যাসে লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন 'ইচ্ছামত অভীষ্ট- সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। ইতিহাসের কাহিনীর পাশে তাই স্থান পায় কাল্পনিক কাহিনী।

(জ) ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনা ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে আর্বতিত জীবনের উত্থান পতন নিয়ে। ইতিহাসের সামাজিক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আবেগ আলোড়ন এই জাতীয় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী দেয় বিস্তৃতি। কখন বা অতি মানবিক উচ্চতা।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদাহরণ :

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী রচিত হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সার্থক রচয়িতা ওয়ালটার স্কট। তাঁর কবিকল্পনা ও শিল্পবোধের সমগ্রতায় দূরবর্তী এবং নাতিদূর অতীতের সে প্রাণবন্ত ও বিশহবাসযোগ্য পূর্ণনির্মাণ সম্ভব করে তুলেছিলেন তা ছিল অভূতপূর্ব। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড তথা মহাদেশীয় অতীত ইতিহাসের রোমাঞ্চকর অভিযান, মধ্যযুগীয় দূর্গ-প্রাসাদ-গির্জা-সমাধিক্ষেত্র তথ গিরিপ্রান্তর পরিখার ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর উপন্যাসে। স্কটে ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'Wereth' স্কটল্যান্ডে সামরিক দায়িত্বে বৃত্ত এডোওয়ার্ড ওয়েভারলির প্রেম, বীরত্ব ও সংঘাতের এক চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান, বিশাল ও বিশদ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এক চমকপ্রদ ও গতিময় কাহিনী। তাঁর আর এক বহু পঠিত উপন্যাস 'Iranhoe' যার ঘটনাস্থল মধ্যযুগীয় ইংল্যান্ড। সময়কাল সিংহ হৃদয় রিচার্ডের রাজত্ব - ইউরোপীয় ক্রুসেডের যুগ, মধ্যযুগের ইতিহাস এখানে মিশেছে অতিকথা ও রোমান্সের সঙ্গে, দ্বাদশ শতকে স্যাকসন - নরম্যান সংঘাতের বিবরণে ঘটেছে কালানৈতিক দোষ, তবু আইভান হো -র বীরত্ব এবং আইভান হো - রেবেকা - রাত্তত্রনার ত্রিকোণ প্রেম এই উপন্যাসকে

টিপ্পনী

দিয়েছে এক আশ্চর্য চৌম্বকশক্তি।

পাশ্চাত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে স্থায়ী আসন অলংকৃত করে আছে। বুলওয়ার লিটনের - 'The last days of Pomepeli', থ্যাকারের 'Henry Esmond'।

টিপ্পনী

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম উপন্যাসের দুর্গেশনন্দিনীর পটভূমি ছিল ঐতিহাসিক। এরপর মৃণালিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান তথা ঐতিহাসিক চেতনার কিছু মৌল তাগিদের খোঁজ মেলে। তবে এরই মধ্যে বঙ্কিম আমাদের উপহার দিয়েছিলেন তাঁর যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' যাতে ইতিহাস উপন্যাসের স্বাভাবিক ধর্মকে বিঘ্নিত করেনি। এই উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপণে জানিয়েছেন - 'রাজসিংহ উপন্যাসে ঐতিহাসিক অংশ প্রধান, ব্যাক্তিগত, জীবনসমস্যা ইতিহাসের অণুবর্তি ও প্রভাবাধীন, এই উপন্যসের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র - রাজসিংহ ও নায়ক ঔরঙ্গজেব - ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যাক্তিত্ব।'

সামাজিক উপন্যাস :

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সুতরাং যেকোন ধরণের সহিত্যে সমাজের উপস্থিতি অনস্বীকার্য তবে যে উপন্যাস সমাজ বা পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়েওঠে তাকে সামাজিক উপন্যাস বলে। সমাজ সমস্যা, দ্বন্দ্ব, সংকট এই জাতীয় উপন্যাসের উপজীব্য। বাস্তবতার চিত্রণ এই উপন্যাসে করা হয়ে থাকে।

সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(ক) সামাজিক-পারিবারিক-বৈবাহিক ইত্যাদি সমস্যা তুলে ধরা হয়।

(খ) সমাজের যথাযথ ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়।

(গ) সামাজিক উপন্যাসে অর্থনৈতিক সংকট ও প্রতিফলিত হয়।

(ঘ) আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা সামাজিক উপন্যাসের বিষয় হয়।

(ঙ) এই জাতীয় উপন্যাসে কোন একটি সমস্যা স্থান পায়। কিন্তু সে সমস্যা নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ছাপিয়ে সর্বজনীন হয়ে ওঠ।

(চ) ওপন্যাসিক স্বাভাবিকভাবেই এই জাতীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে সহানুভূতিপ্রবণ

এবং মানবতাবাদী।

(ছ) সামাজিক উপন্যাস সর্বদা বাস্তবতার চিত্র উপহার দেয়।

গবেষণাধর্মী, প্রচারমূলক, শিল্পসচেতন, শ্রমজীবী, বয়ঃসন্ধির সমস্যামূলক, বেঁচে ধাকার সংগ্রামমূলক, অর্থনীতি সচেতন উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস হিসাবে পরিচিত হতে পারে। সর্বহারা সংগ্রাম বা রাজনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক উপন্যাসের বিষয় হতে পারে।

বাংলা ভাষার প্রথম সামাজিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা'। এছাড়া তাঁর লেখা 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'যোগাযোগ'; শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয় আসয়' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাএর প্রায় সবকটি উপন্যাস সমাজিক উপন্যাসের তকমা পেতে পারে। তাঁর 'পল্লীসমাজ', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'বড়দিদি', 'রামের সুমতি' প্রভৃতি এই জাতীয় উপন্যাসের উদাহরণ।

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের গ্রামবাংলার নগ্নদিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। পিতা তারিনী ঘোষালের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শহরবাসী পুত্র এসেছে গ্রামে। তারা গ্রামের জমিদার বংশের ছোট তরফ। রমেশ গ্রামের প্রতিটি পদে কুসংস্কার, দারিদ্র, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা, অশিক্ষা, উন্নয়নহীনতা, সাম্প্রদায়িকতাকে লক্ষ্য করে। এসব যেন গ্রামীণ জীবনধারাই অঙ্গ। সে অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে এইসব গ্রামবাসীদের অবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। কিন্তু বড় তরফ বেনি ঘোষাল তা পন্ড করতে চায়। কারণ সে জানে প্রজাদের বিভেদ থাকলে তার সুবিধা। তাই দলাদলি-গোষ্ঠী বাজির উপর সে জোর দেয়। এমনকি অন্যায় করতে তার হাত কাঁপে না। লাঠালাঠি - মারামারিফতে সিদ্ধহস্ত। রমেশকে মারবার জন্য মুসলিম প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলে। এর একদিকে আছে রমা, অণ্যদিকে ঝ্যেঠিমা বিশহবেশ্বরী। গ্রাম্য ভেদাভেদ রমা-রমেশকে এক হতে দেয়নি। তাদের ভালবাসা পরিণতি লাভ করেনি। রমা বেণী ঘোষালের পক্ষ অবলম্বণ করেছে। অণ্যদিকে বেণীর মা হয়ে ও বিশ্বেশ্বরী রমেশকে অনুরোধ করেছে - 'আলো জ্বেলে দে রে'। রমেশের আলো জ্বালার প্রচেষ্টা বারেবারেই নানান আঘাতে নিভে গেছে। বেণীর ষড়যন্ত্রে, রমার মিথ্যা সাক্ষ্যে রমেশকে জজেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছে। সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারা যায়নি।

উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক সমাজের এক সংকটকে তুলে ধরেছেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ক্ষতগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। শরৎচন্দ্র গ্রামজীবনকে খুব নিবিড়ভাবে চিনতেন - জানতেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা তাঁকে সমাজের যথাযথ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে উপন্যাসে ঠাঁই পেয়েছে। কুঁয়াপুর গ্রাম একটি গ্রাম থেকে নির্বিশেষ গ্রামে পরিণত হয়ে আঞ্চলিকতা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। কুঁয়াপুর গ্রামের ছবি আসলে গ্রামজীবনের বাস্তব ছবি। শরৎচন্দ্র মানুষের মুখে ভাষা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর মানবিকতাবোধ-সহানুভূতিশীলতা তাঁর লেখনীকে সমাজমনস্কতায় সমৃদ্ধ করেছে। তাই 'পল্লীসমাজ' উপ্যাসটিকে সার্থক সামাজিক উপন্যাস বলা চলে।

আঞ্চলিক উপন্যাস :

সাহিত্যের একটি আঙ্কিক হচ্ছে উপন্যাস। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে Narative বা আখ্যান পরিবেশিত হয়। ঔপন্যাসিক তাঁর কাহীনিকে নানা ভাবে ব্যাক্ত করেন। এরকই একটি রূপ হল আঞ্চলিক উপন্যাস। এর সংজ্ঞা হিসেবে আমরা বলতে পারি -

"যে উপন্যাসে কোনো এক বিশেষ অঞ্চলের মানুষের কথা, পরিবেশ, জীবনচর্যা সহ শিল্পসম্মতরূপে পরিবেশিত হয় তাকে বলা হয় আঞ্চলিক উপন্যাস।

স্বাভাবিক ভাবেই একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় পূর্ণাঙ্গভাবে এ ধরণের উপন্যাসের স্বরূপকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই আমরা এর কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের কথা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করতে পারি।

(ক) কোনো এক বিশেষ অঞ্চলের কথা এই শ্রেনীর উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়।

(খ) এই শ্রেণীর উপন্যাসে কোথাও কোথাও ভৌগলিক চৌহদ্দিয় নির্দেশ করা থাকে।

(গ) বিশেষ অঞ্চলেদর জনগুষ্ঠী মূল্যবোধ, লোকধর্ম, লোকবিশ্বাস এই শ্রেণির উপন্যাসে থাকে।

(ঘ) এই উপন্যাসের ভাষা মূলত সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা মাফিক হয়ে থাকে। চরিত্রগুলির মুখের ভাষাই শুধু নয় অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোনো প্রবাদ প্রবচন বা বিশেষ শব্দের প্রয়োগ এ উপন্যাসে করা হয়ে থাকে।

(ঙ) অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছদ স্ববৈশিষ্ট্য নিয়ে আঞ্চলিক উপন্যাসে উপস্থিত।

(চ) স্থানীয় ক্রীড়া বা বিশেষ বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট উপন্যাসে স্থান পায়।

(ছ) অনেকক্ষেত্রেই নায়কত্তকম চরিত্র থাকলেও প্রকৃত নায়ক হয়ে ওঠে জনগোষ্ঠী বা স্থানীয় প্রকৃতি।

(জ) আঞ্চলিক উপন্যাসে নিসর্গ কখনো উপস্থীত হয়েছে পশ্চাদপঠ রূপে কখনও বা চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে আবার ককনও নিসর্গ নিজের হয়ে উঠে চরিত্র।

(ঝ) একটি অঞ্চলের জীবনকথাকে অবলম্বন করে রচিত হলেও স্বার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বেশ কালউত্তীর্ণ হয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর 'কয়লাকুঠী'। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ বাংলা উপন্যাস হল তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব পার্বতী', সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ'।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস :

আধুনিক সাহিত্যের সুস্পষ্টধারা হলো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। মননের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক, মানসিক আবহের আধুনিক সময়োচিত আবহ এ উপন্যাসে পাওয়া যায় বলেই আধুনিক চিন্তাবিদদের মনচিন্তার নিত্যসঙ্গী এই সাহিত্যধারা। ভার্জিনিয়া উলফ এ উপন্যাসের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন -

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে বাহ্য ঘটনা থাকবে না। মস্তিস্কের চিন্তাচেতনা ও আত্মিকভাবা নিয়ে গঠিত হবে এ উপন্যাস।

আজকের পৃথিবী, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়া আধুনিক মানুষকে বোঝা দুঃসাধ্য ও অসম্ভব। তাই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নির্যাস নির্হিত আছে মানুষের মনের অন্তর্লোকের ক্রিয়াকলাপে। এ উপন্যাস সার্বিক বিষয়কে বাদ দিয়ে মানবাণূভূতির স্বতন্ত্র এক মুহূর্তকে ব্যাক্যা করে। বিশ্বযুদ্ধপ্রভাবিত সমাজব্যবস্থায় যে একা মানুষের জগৎ তৈরি হলো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস তারই মূর্ত প্রকাশ।

এ উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব উপন্যাসের সঙ্গে অভ্রান্তভাবে জড়িত কিন্তু মনস্তত্ত্বই কেন্দ্রীয় শক্তি এবং তার সমস্ত জটিলতা ও ঘটনাবিবর্তনের নেপথ্যে নাও হতে পারে।

টিপ্পনী

উপন্যাসের প্রধান সমস্যাটি মনস্তাত্ত্বিক কিনা সে কথা অবশ্য বিচার্য।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে লেখক একটি চরিত্রকে এক বিশেষ পটপরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়ে তাঁর মানসলোকের পর্বপর্বান্তরকে প্রকাশ করেন। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র মানস অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে পাঠককে এনে লেখক তাঁর রচনা প্রেক্ষিতকে বিস্মৃত করেন এবং শিল্পকলার নতুন আস্বাদনে নিয়ে যেতে থাকেন।

টিপ্পনী

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস :

লেখক আসলে সারাজীবন ধরে নিজের জীবনকেই নানাভাবে লিখে চলেন। ঔপন্যাসিকের ব্যাক্তিগত জীবন যেখানে প্রতিফলিত হয় সেই জাতীয় উপন্যাসকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে। তবে ব্যাক্তি জীবনকে ঔপন্যাসিক নৈর্ব্যক্তিক করে দেখাতে চেষ্টা করেন। নিজের জীবনের বিশেষ সত্য থেকে তিনি নিবর্বিশেষ সত্যে পৌঁছতে চান। ব্যাক্তিগত শোককে বিশ্বাতিগ করে তোলেন। প্রাবন্ধিক সরোজ দত্ত 'সাহিত্যকোষ ; কথাসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন, "যাঁরা পরম মমতায় হারানো দিনগুলোকে ধরে রাখেন, সনির্বন্ধ পরিচয় করেন পাঠকের সঙ্গে, তাঁদের উপন্যাসগুলিরও একটি নাম পরিচয় আছে - আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস। এইসব উপন্যাসে তাঁদের মত্ত ব্যাকুলতার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘটে, স্মৃতি বিহ্বলতার মৌসুমী গন্ধ বইতে থাকে এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে।"

ড্যানিয়েল ডিফোর উপন্যাস 'রবিনসন ক্রুশো' বা চার্লস ডিকেন্সের 'ডেভিডকপার ফিল্ড' স্কট ফিটনজেরাল্ডের 'দিস সাইড অব প্যারাডাইস' বিশ্বসাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। বাংলায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চার পর্বের সুবিশাল উপ্যাস 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। শ্রীকান্ত যদি শরৎচন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে 'আরণ্যকে'র সত্যচরণ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'গণদেবতা' উপন্যাসের শিবনাথ; তারাশঙ্করের প্রতিনিধিত্ব করেছে। তবে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে লেখকের জীবনের পুরোটা পাওয়া সম্ভব নয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

তবে মনে রাখতে হবে আত্মজীবনী ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। আত্মজীবনীতে সত্যই সব। কিছু উপন্যাসে কাল্পনিক চরিত্র থাকবেই। গল্পের মোড়কে জীবনের ঘটনাকে সেখানে উপস্থাপিত করতে হয়।

কাব্যধর্মী উপন্যাস :

কবিতা যখন উপন্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয় একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করে তাকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলে। উপন্যাসে মানবজীবন ধরা পড়ে। সেই মানবজীবন পাঠকের ভাবজগতের দ্বার উন্মোচিত করে লাবণ্য ও লালিত্যে মাধ্যমে তখন তা কাব্যধর্মী উপন্যাস হয়ে ওঠে। চরিত্রচিত্রণের চেয়ে বর্ণনা প্রধান স্থান পায়। অধ্যাপিকা আলো সরকার 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন, "কাব্যধর্মিতা উপন্যাস রচয়িতার একটি বিশেষ গুণ এবং এই কাব্যময় উপস্থাপনা রীতির মূল লক্ষ্যই হল উপন্যাসের চরিত্রগুলির অন্তরতম জগতকে সংগীত ও চিত্রকল্পময় ও গভীর বভঞ্জনাপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করা। মানুষের মনোজগতের সত্য বা 'Inner reality' -র রহস্যয় চেতনা যখন উপন্যাসের শিল্পরূপ গড়ে তুলতে সাহায্য করে তখন ঔপন্যাসিককে এক ধরণের কাব্যিক পরিবেশের আশ্রয় নিতে হয় এবং বলাই বাহুলভ এই কাব্যসুলভ পরিমন্ডল উপন্যাসের বিষয় বিন্যাসের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।"

সমস্ত লেখকের লেখায় এই কাব্যিক পরিবেশের দেখা মেলে। তবে এই জাতীয় উপন্যাস রোমান্স নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটিকে এই ধরণের উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। ক্ষেত্রগুপ্ত এটিকে অভিহিত করেছেন - 'ঘটনা বিরল কাব্যধর্মী উপন্যাস' রূপে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে কবিত্ব সর্বব্যাপী। বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর', 'রাতভরে বৃষ্টি', বনফুলের 'লক্ষ্মীর আগমণ' মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' - এ জাতীয় বাংলা উপন্যাস।

প্রশ্নমালা ও অনুশীলনী :

১. মহাকাব্য কাকে বলে ? মহাকাব্য কয় প্রকার ও কী কী ? যে কোন একটি ধারা মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো।

২. বাংলা সার্থক মহাকাব্য কোনটি এবং কেন ?

৩. গীতিকবিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

৪. সনেট এর সংজ্ঞা দাও ও এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ? বাংলা ভাষার সনেট সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫. ট্র্যাজেডি কাকে বলে ? ট্র্যাজেডি বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ? বাংলা ভাষার একটি সার্থক ট্র্যাজেডির পরিচয় দাও।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৬. কমেডি কাকে বলে ? কোন নাটককে আমারা কমেডি বলব ? বাংলা ভাষায় লেখা একটি কমেডি নাটক সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭. ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে ? এই জাতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য কী ? বাংলার একটি ঐতিহাসিক নাটকের সার্থকতা বিচার করো।

৮. পৌরাণিক নাটক কাকে বলে ? কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে পৌরাণিক নাটক বলা যাবে ? বাংলা ভাষার একটি সার্থক পৌরাণিক নাটকের সার্থকতা বিচার করো।

৯. সামাজিক নাটক কাকে বলা হয় ? এই জাতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ? বাংলা ভাষার একটি সামাজিক নাটকের সার্থকতা বিচার করো।

১০. প্রহসনের সংজ্ঞা দও। প্রহসনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ? বাংলা ভাষার একটি প্রহসনের সার্থকতা বিচার করো।

১১. ছোটগল্প কাকে বলা যেতে পারে ? ছোটগল্প ও উপন্যাসের পার্থক্য কী ?

১২. ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য কী কী ? বাংলা ভাষার একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা বিচার করো।

১৩. কী কীবৈশিষ্ট্য থাকলে উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যাবে ? বাংলা ভাষার তিনটি আঞ্চলিক উপন্যাসের উল্লেখ করে যে কোন একটির সার্থকতা বিচার করো।

১৪. সামাজিক উপন্যাস কাকে বলব ? এর লক্ষণগুলো কী ? বাংলার একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করো।

১৫. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো - সাহিত্যিক মহাকাব্য, আদি মহাকাব্য, আখ্যান কাব্য, একাঙ্ক নাটক, প্রহসন, রূপক - সাংকেতিক নাটক, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, কাব্য - উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

দ্বিতীয় একক - কমলাকান্তের দপ্তর (নির্বাচিত)

প্রাবন্ধিক বঙ্কিম :

টিপ্পনী

সাধরণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নাট্য মঞ্চের গণতন্ত্রীকরণ যদি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৭২ সালের অন্যতম প্রধান পরিচয় হয়ে ওঠে তাহলে ঐ বছরের আরও একটি মাইলফলক হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' এর আত্মপ্রকাশ যার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আকাশে ধ্রুবতারার মতো আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের। ঐ প্রসঙ্গে 'আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধগ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয় -

> " বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনি'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী - নির্ধারিনী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদ পত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখকরিত করিয়া তুলিল । বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই যৌবন অবস্থার জন্য যে ব্যক্তির প্রভাব ছিল অপরিসীম তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।আমরা পেয়েছি শ্রীরামপুর মিশন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু বা রামমোহন রায়ের মত গদ্য লেখকদের। রবীন্দ্রনাথের মতে

> " 'কী রাজনীতি' কী বিদ্যাশিক্ষা, 'কী সমাজ' কী ভাষা - আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বচ্ছন্দে যাহার সুত্রপাত করিয়া যান নাই।" (বঙ্কিমচন্দ্র / আধুনিক সাহিত্য)

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

আর রামমোহনের প্রবন্ধ সাহিত্যের সেই বাল্য অবস্থাকে যৌবনের রাগে উদ্‌বেলিত করে তুলেছিলেন বঙ্কিম।

> "রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া বিপজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ চালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপন করিয়া

গিয়াছেন । আজ বাংলা ভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যমলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের আদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত দেশমুখো গ্রামের আদি নিবাস ছেড়ে চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁধালপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। পিতা যাদবচন্দ্র ফার্সী ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইংরেজ সরকারের অধীনে ডেপুটি কালেক্টরের হিসেবে কর্মরত ছিলেন। যাদবচন্দ্রের তৃতীয়পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ সালের ২৬ শে জুন (১৩ই আষাড়, ১২৪৫), কাঁঠালপাড়ায়। পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরেই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বঙ্কিমের বাল্য শিক্ষা শুরু হয়েছিল । ১৮৪৯ সালে তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন । এই কলেজে পড়াশুনার সময়েই বঙ্কিমের সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে ১৮৩৫ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' এর কবিতা প্রতিযোগিতায়, যোগ দিয়ে তিনি পারিতোষিক লাভ করেন। কবিতাটি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয় ঐ বছরই। এরপরে তিনি আইন পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন হিন্দু কলেজে ১৮৫৭ সালে কিন্তু সেই পাঠ অসমাপ্ত রেখে ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ সালেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। আর 'বঙ্গদর্শন' এর মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জীবনে অনুপ্রবেশ ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' এর পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন যে-

"এই পত্র আমার কৃতিবিদ্যা সম্প্রদায়ের হস্তে আর ও এই কামনায় সমর্পন করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক । তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।"

এই পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তথা অশিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে যোগাযোগের তথা অনুভবের আদানপ্রদন ঘটতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়ে ১৮৭২ সালের ১৪ই মার্চ লেখা একটি চিঠিতে 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজীন' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন -

" I have myself projected a Bengali Magazine with the

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and uneducated classes".

'বঙ্গদর্শন' এর পত্রসূচনাতেও তিনি এভাবেই লিখেছিলেন -

"আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।"

সেকালের বাঙালী যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয় ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর পাল্লায় পড়ে বাংলা ভাষাকে ভুলতে বসেছিল সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' এর পত্র সূচনায় তিনি জানিয়েছেন -

"এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজেই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরেজিতে, সাধারণের কার্য, মিটিং লেকচার, এসে প্রিসিডি সমুদয় কার্য ইংরেজিতে, যদি উভয় পক্ষ ইংরেজি জানেন তবে কথোপকথন ও ইংরেজিতে হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরেজি। ...."

এই ভাষা সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনি বাঙালীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন -

"আমরা যত ইংরেজি পড়ি যত ইংরেজি কহি বা যত ইংরেজি লিখি না কেন, ইংরেজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্ম - স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরেজ তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটি পিতল অপেক্ষা খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্য নারী, জীবন যাত্রার সুসহায়। নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী সহনীয়। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা ভাষায় আপন আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

এই মনোভাব নিয়েই বাংলা প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র -

গ্রন্থাকারে প্রকাশের সাল অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি হল -

(১) লোকরহস্য (১৮৭৪)

(২) 'কমলাকান্ত' (১৮৭৫) পরিবর্ধিত (১৮১৫)

(৩) 'বিজ্ঞানরহস্য অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ' (১৮৭৫)

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(৪) 'সাম্য' (১৮৭৯)

(৫) 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪)

(৬) 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬ ও ১৮৯২)

(৭) 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম খন্ড) (১৮৮৭)

(৮) 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (অনুশীলন) (১৮৮৮)

(৯) 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দ্বিতীয় খন্ড) (১৮৯২)

তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত গ্রন্থ দুটি হল 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম'।

তিনি যে কয়েকটি সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন সেগুলো হল -

(১) 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা।

(২) 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব'

(৩) 'বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র'

(৪) 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী'

তাঁর সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এবং পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত', 'জাতিবৈর', 'মানস - বিকাশ', 'বৃত্রসংহার', 'জ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিক মত', 'পলাশির যুদ্ধ', আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' প্রমুখ।

'বঙ্গদর্শন' থেকে সংকলিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্ণ রচনা 'লোকরহস্য' ১৮৭৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন -

> "এই গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়া পুনমুদ্রিত হইল। এতৎ সম্বন্ধে একটি কথা বল আবশ্যক, বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে রহস্য মাত্র গালি; গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যাক্তিবিশেষকে গালি দেওয়া মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হয় নাই - তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

প্রথম সংস্করণে আটটি রচনা সংকলিত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন' থেকে। ২য় সংস্করণে (১৮৮৮) প্রচার থেকে চারটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছিল।

'লোকরহস্য' - এর আলোচিত প্রবন্ধ সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাস লিখেছেন -

> "সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যে লোকরহস্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধে মানব -চরিত্র সম্বন্ধে লঘু কৌতুকের মধ্যে দিয়া যে বিদ্রূপবান নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা অনেক স্থলে Swift এর তিক্ত মধুর ব্যঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের' রস উচ্চলতা স্বার্থান্ধ মানব পশুর চরিত্রের উপর নির্মম কষাঘাত, গর্দভের ব্যাঙ্গোক্তিতে তাহাই আরও নির্মম 'দাম্পত্য দন্ডবিধি আইনে' তিনি যে লঘু কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনিয়েছেন, তাহাই 'বসন্ত ও বিরহে' ও বিবিধ প্রবন্ধের 'প্রাচীনা ও নবীনা'য় কৌতুক স্নিগ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছে। 'বাবু' প্রবন্ধটি 'লোকরহস্যে' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। জনমেজয় - বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের মুখে প্রবন্ধটির বিস্তৃতি সাধন করিয়া বঙ্কিম ইহাকে একটি সুগভীর প্রাচীনত্বের কাঠামো বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।"

'কমলাকান্ত' র তিনটি অংশ (১) 'কমলাকান্তের দপ্তর' ; (২) 'কমলাকান্তের পত্র'; (৩) 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। 'কমলাকান্ত' এর সমস্ত রচনা 'বঙ্গদর্শন' এ প্রকাশিত হয়েছিল এযার মধ্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর' ১৮৭৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে 'কমলাকান্ত' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে।

১৮৭৫ সালে বিজ্ঞান রহস্য অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকাস্বরূপ 'বিজ্ঞাপন' এ বঙ্কিম লেখেন -

> "এই সকল প্রবন্ধ প্রধানত হক্সলী, টিন্ডল, প্রকটর লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে। তবে টিন্ডল সাহেবের 'Dust and Disease' নামক প্রবন্ধের সারমর্ম ধূলা গ্রসর সাহেবের গ্রন্থ হইতে 'গগনপর্যটন'; হক্সলীর 'Lay Sermonos' হইতে 'জৈবনিক' এবং লায়েল সাহেবের 'Antiquity of Man' হইতে 'কতকাল মনুষ্য' নামক প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।"

টিপ্পনী

লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙালী পাঠক, বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকের এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী শ্রী বুঝিতে পারেন।

'সাম্য' ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবিতাবস্থায় এই গ্রন্থ আর পুনমুদ্রিত হয় নি। 'বঙকিম প্রসঙ্গ' তে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন -

> "বঙ্কিমবাবু বলিলেন - এক সময় মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সেসব গিয়াছে। নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্যটা খুব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।"

'সাম্য' আর না ছাপালেও 'বিবিধ প্রবন্ধ' র জন্ম হয় ভাগে 'বঙ্গ দেশের কৃষক' অন্তভুর্ক্ত হয়েছিল।

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ১৮৮৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । অক্ষয়কুমাচর দত্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' এ লেখেন -

> "তিনি নিজ সার্বিসে এবং হয়ত নিজ স্টেশনেই নিজের পার্শ্বে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকললাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল । মুচিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্যই ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।"

১৮৮৬ সালে 'কৃষ্ণচরিত্র-প্রথমভাগ' এবং ১৮৯২ সালে সম্পূর্ণ 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লেখেন -

> "বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রথমত মহাভারতের ঐতিহাসিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন - তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস...."

'কৃষ্ণচরিত্র' এর দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লেখেন -

> "কৃষ্ণের ঈশ্বরতত্ত্বে প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানব চরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।"

'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম খন্ড ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল । সংকলিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় হল 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপোতি ও

জয়দেব', 'সেকাল আর একাল', 'শকুন্তলা', মিরন্দা এবং দেসদিমোনা', 'ভালোবাসার অত্যাচার', 'জ্ঞান', 'সাংখ্যদর্শন', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'ভারতকলঙ্ক' প্রমুখ। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ সালে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধের সমাহার। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -

টিপ্পনী

> "এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল। বিগত অর্ধ শতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারের ও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থাপিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি মহাজন উক্তির মত বলিয়া যান নাই; এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইয়া যত্ন করি, তিনিও তেমনি সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।"

'ধর্মতত্ত্ব' অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' এর প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৮৮ সালে। গুরু শিষ্যের কথোপকথোনের মধ্যে দিয়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে 'অনুশীলন ধর্মবিষয়ক' আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

উপসংহারে বলা যায় যে বিরাট বিষয়সমূহকে বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন - যার ফলে "বঙ্কিম নিজে দেশব্যপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন (রবীন্দ্রনাথ / আধুনিক সাহিত্য / বঙ্কিমচন্দ্র) - "রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের তার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

কমলাকান্তের দপ্তর :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাস থেকে ১২৮২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস পর্যন্ত ইংরেজির ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' এ ১৪ টি লেখা প্রকাশিত হয় কমলাকান্তke নিয়ে - ভূমিকা সরূপ বঙ্কিম লিখেছেন -

> "তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না, দেখিতেই তাহাতে কি মাথামুন্ডু লিখিত কিছু বুঝিতে পারা

যাইত না। কখন কখন আমারে পড়িয়া শুনাইত - শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখন্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়ে গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখ্‌শিশ করিলাম।"

টিপ্পনী

'বঙ্গদর্শন' - এ কমলাকান্ত নিয়ে যে ১৪ টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো হল - (১) একা কে গায় ওই (ভাদ্র ১২৮০), (২) মনুষ্যফল (আশ্বিন ১২৮০), (৩) ইউটিলিটি বা তদরদর্শন (কার্তিক, ১২৮০) (৪) পতঙ্গ (অগ্রাহয়ন, ১২৮০), (৫) আমার মন (মাঘ, ১২৮০), (৬) চন্দ্রালোক (ফাল্গুন, ১২০), (৭) বসন্তের কোকিল (চৈত্র, ১২৮০) (৮) স্ত্রীলোকের রূপ (জৈষ্ঠ, ১২৮১), (৯) ফুলের বিবাহ (আষাড়, ১২৮১), (১০) বড়বাজার (আশ্বিন, ১২৮১), (১১) আমার দুর্গোৎসব (কার্তিক, ১২৮১), (১২) একটি গীত (ফাল্গুন, ১২৮১), (১৩) বিড়াল (চৈত্র, ১২৮১), এবং (১৪) মশক (বৈশাখ, ১২৮২)।

কমলাকান্তকে নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে 'চন্দ্রালোক' ও 'মশক' অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এবং স্ত্রীলোকের রূপ' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। ১৮৭৫ সালে 'কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশকালে বঙ্কিমের লেখা ১১ টি রচনাই বইটিতে স্থান পেয়েছিল।

বইটি পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে তখন 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছাড়াও 'কমলাকান্তের পত্র' ও কমলাকান্তের জোবানবন্দী' এতে সংকলিত হয়েছিল এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' এ পূর্ব উল্লিখিত ১৪ টি প্রবন্ধই সংকলিত হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংসকরণের সম্পাদক যুগল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস 'কমলাকান্ত' জন্মের ইতিহাস' একটি মনোজ্ঞ ভূমিকায় লিখেছেন -

"সোজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচ বলিতে পারিতেন এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যাঙ্গের শর্করা মন্ডিত কাব্য, পলিটিক্স, সমাজ - বিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া সম্পাদক এবং প্রচারক বঙ্কিমন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত জন্মের ইহাই ইতিহাস। (কমলাকান্ত - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ)

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র' তে লিখেছিলেন -

> "কি ভাষার মাধুর্যে কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শুভ্র সংযত সরস রসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব, কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক, অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিক আড়ম্বর, সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিক কল্পনাহীনতা, স্বদেশ প্রেমিকের গোঁড়ামি নাই, হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সঙ্গে মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তাত্ত্বোধের, ভাবুকতার সঙ্গে বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সঙ্গে উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে?"

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট কমলাকান্তের মৌলিকতা প্রসঙ্গে অক্ষয়বাবু মন্তব্য করেছেন -

ইংরেজ লেখক De Quincey (ডি কুইন্সি) লিখেছিলেন Confessions of an Opium Eater' নামক একতি গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত হয়ত আদিমখোল। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই আলাদা। কলোনয়োল শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিম অভিজ্ঞ পাঠক। তিনি শুধু ডি. কুইন্সিয়া পড়েছিলেন স্যার ওয়াল্টার স্কতের 'আমার ভূস্বামীর গল্প'। কমলাকান্ত - ভীষ্মদেব খোশনবীস - চরিত্রগগুলো গঠনে হয়ত এদের প্রভাব আছে। হবত মনে পড়বে চার্লস ল্যাম্সের। 'Essays of Elia' গ্রন্থের কথা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত স্বতন্ত্র। হয়ত আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি ঋণগ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিষয় বৈচিত্র্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর' অভিনব। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে জোয়ার এনেছিলেন তার একটা নতুন ধারা এটি।

এই প্রসঙ্গে 'বঙ্কিমসরণি' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য স্মরণীয় -

> "বঙ্গদর্শন ও কমলাকান্তের দপ্তর প্রায় সমার্থক। দুয়েরই সূচনা একই সময়ে সম্পাদক ও কমলাকান্ত দুজনেই বহুভাবের ভাবুক, বহু চিন্তার চিন্তক, দেশাত্মবাদী ও আদর্শনিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকল্প কমলাকান্ত। অনেকে কমলাকান্তের দপ্তরে ডিকুইন্সির অফিসারের জবানবন্দীর ছায়া দেখেছেন। এ ধারণা ছায়ার মতোই অলীক। কেননা কমলাকান্ত বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। ডিকুইন্সির রচনা খেয়ালের সমষ্টিমাত্র।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কমলাকান্ত বিবাহ করেনি। একটি খাপছাড়া ধরনের জীবনযাপন করে। আফিম তার একমাত্র নেশা এই নেশা তার দিব্যদৃষ্টি এনে দেয় আর সেই দৃষ্টিতে সে উনিশ শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরে। সুবোধকান্ত সেনগুপ্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন -

> "কমলাকান্ত নিজের সীমা সম্পর্কে সচেতন, অথচ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সে খাপছাড়া। আমরা যেমন তাহাকে লইয়া কৌতুক করি, সেও তেমনি আমাদিগকে লইয়া কৌতুক করে। প্রসন্ন গোয়ালিনী ও অহিফেন - ইহা ছাড়া সংসারে তাহার আর তৃতীয় বন্ধন নাই। প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে কাব্যরস অপেক্ষা গব্যরসের সংস্রব বেশী, আর অহিফেন দিব্যদৃষ্টি লাভের উপায় মাত্র। কমলাকান্তের এই বন্ধনহীনতা আমাদের কাছে হাসির সামগ্রী। পাকা খেলোয়াড় যেমন দর্শকের সমালোচনা কৌতুকের সহিত গ্রহণ করে, আমরা ও কমলাকান্তের 'উদরদর্শন', রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ক বক্তৃতায় তেমন আমেজ অনুভব করি কিন্তু তহার দ্বারা চালিত হই না। কমলাকান্ত পার্থিব সাফল্য লাভ করে নাই, কিন্তু ইহার অন্তরস্থিত শূন্যতাকে যে চিনিয়াছে। সুতরাং আমাদেদর ব্যঙ্গকে সে ব্যাঙ্গের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের অবজ্ঞাকে ও সে অবজ্ঞা করিতে পারে।"

'কমলাকান্তের দপ্তর' এর দ্বিতীয় রচনা 'মনুষ্য ফল'।

> "আফিমের মাত্রা একটু বেশি চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফলবিশেষ মায়াবৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে.....
>
> কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, প্রথম পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এখনকার বড়মানুষ দিগের মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁঠাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁঠাল কতকগুলি বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়ি সার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে....."

এভাবেই কমলাকান্ত মানুষের মধ্যে ফলত্ব আরোপ করেছেন। কমলাকান্ত দেশহিতৈষীদের শিমূল ফুল বলে ভেবেছেন। সে ফুল দেখতে ভাল কিন্তু কাজে নয়।

কমলাকান্তের মনে হয়েছে অধ্যাপক ব্রাহ্মণরা হল "সংসারের ধুতরা ফল; লেখকরা তেঁতুল - "ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়ে ভাল।" রজনীকান্তকে কমলাকান্তর মনে হয়েছে নরিকেল। কেননা অন্যফল নিচ থেকে আকশি দিয়ে পারা যায়, কিন্তু নারকেল গাছে না উঠলে পারা যায় না।

সমস্ত রচনার মধ্যেই হাস্যরসের একটা ধারা ঠিক ফল্গু নদীর মত প্রবহমান। আর সব শেষে কমলাকান্ত বলে ওঠে - "দেশি হাকিমেরা কোন ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন। আমি স্পষ্ট কথা বলিব ইঁহারা পৃথিবীর কুষ্মান্ড।" আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লেখক আত্মবিশ্লেষণ করে হাসির ছটায় জীবনকে দেখেছেন, সমালোচনা করেছেন। আফিমের নেশায় কমলাকান্তের যেন তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে।

'আমার মন' প্রবন্ধে মনচোরের সন্ধানে পথে বের হয়ে কমলাকান্ত এক যুবতীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। যুবতি প্রশ্ন করল -"ওকি ও? সঙ্গ নিয়েছ কেন? কমলাকান্ত জানাল - "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।" যুবতি কটুক্তি করে গালি দিয়ে কমলাকান্তকে বলল - "চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর কষিয়া আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।"

এই প্রবন্ধে একদিকে যেমন রয়েছে সরস কৌতুক অন্যদিকে রয়েছে কমলাকান্তর উপলব্ধি -

> "পরের জন্য আত্মবিসজর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ীমসুখের অন্য কোন মূল নাই।"

ইংরেজ জাতি যে বাহ্য সম্পদের পূজা করে সেই "মেটিরিয়েল প্রস্পেরিটি" কমলাকান্তর পচ্ছন্দ নয় -

> "ইংরেজ জাতি বাহ্যসম্পদ বড় ভালোবাসেন ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন - তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত - আমরা তাহাই ভালোবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি।"

বস্তুতপক্ষে কমলাকান্ত যে বঙ্কিমেরই অনুকল্প তা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' এ লিখেছেন -

> "কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমের মনস্বিতা, চিন্তাশীলতা ও পান্ডিত্যের পরিচয় যে খুব অকিঞ্চিৎকর তাহা নহে , কিন্তু উহা অনেকখানিই

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

আমাদের উপরিপাওণা। আসল পাওনা সাহিত্য সৃষ্টির ভিতর দিয়া সাহিত্য স্রষ্টার গভীর স্পর্শ। গদ্য রচনাও যে একটা সাহিত্য বা সৃষ্টির কতখানি উচ্চস্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে, 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই কথাটাই আমাদিগকে প্রথম সচকিত করিয়া দিয়াছে।"

টিপ্পনী

উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অনুপ্রেরণায় নব্য বাঙালী যুবসম্প্রদায় বাহ্য সম্পদের প্রতি তাড়িত হয়েছিল। কমলাকান্ত এর পরিণাম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তাই 'পতঙ্গ' প্রবন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত যে, 'মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গ'।

" সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে - সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে - কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান - বহ্নি, ধন বহ্নি, মান - বহ্নি, রূপ - বহ্নি, ধর্ম - বহ্নি, ইন্দ্রিয় - বহ্নি, সংসার বহ্নিময়।"

'আমার মন' এ কমলাকান্ত জানতে চেয়েছে যে বাহ্যসম্পদের এত ঘনঘটা সেই "রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে ? কাহার ও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? .... অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? .... তোমার এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়বৃদ্ধির জন্য কিও একটা কিছু কল হয় না ?"

একই ভাবে 'বসন্তর কোকিল' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কমললাকান্ত সেই সব মানুষদের কষাঘাত করেছে যারা বিপদের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়ায় সুখের সময়ে বন্ধু হয়ে আসে।

"তুমি বসন্তের কোকিল, শীত, বর্ষার কেহ নও। রাগ করিও না - তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ - কোকিলে তাহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায় .... আর ননি বাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

আবার 'বিড়াল' প্রবন্ধে মার্জারে যখন বলে -

"আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও নইলে চুরি করিব।

আমাদের কৃষ্ণচর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুন মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না ? চোরের দন্ড আছে নির্দ্দতার কি দন্ড নাই ? দারিদ্র্যের আহার সংগ্রহের দন্ড আছে, ধনির কার্পন্যের দন্ড নাই কেন ?"

বিড়ালের এই সব অভিযোগ শুনে তাকে চুরি করা থেকে নিবৃত্ত করে কমলাকান্ত যখন বলে :

"এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব।"

তখন বোঝা যায় যে এই 'সোসিয়ালিস্টিক' বিড়াল এর প্রতি তার প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত রয়েছে। সবশেষে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধগ্রন্থে যে কথা বলেছেন তা স্মরণে আনা যেতে পারে -

"শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' কে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করিতেন । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বহু সরস । কৌতুককোজ্জ্বল বর্ণনা আছে, গজপতি বিদ্যাদিগজ প্রভৃতি দুই একটি কমিক চরিত্র ও আছে, কিন্তু তবু কোন উপন্যাসেই হাস্যরসের প্রাচুর্য নেই। উপন্যাসের বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্য হাস্যরস স্ফূর্ত্তি -পায় নাই। এই বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি দাবীকেও অনেক সময় উপেক্ষা করিতে বাধ্য হওয়াএন। তিনি লোক শিক্ষক ছিলেন; কিন্তু নীতিপ্রচারকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে পারেন নাই । উপন্যাসের প্রধান উপাদান গল্প ও চরিত্র। আখ্যায়িকাকে সকল দিক দিয়া সম্পূর্ণ করিতে হইবে, চরিত্রের গূড়তম রহস্যকে প্রকাশ করিতে হইবে। তারপর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে কল্পনার প্রকাশ ও মতের প্রচারেদর মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করা যায় না, সুতরাং যে মতকে কল্পনার সাহায্যে রূপ দেওয়া যায় না তাহা অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। উপন্যাসের এই অসুবিধা অতিক্রম করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের সৃষ্টি করিয়াছেন । কমলাকান্ত একটি শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র, সেই দিক দিয়া বিচার করিলে কমলাকান্ত অনন্যসাধারণ, কিন্তু তাহার মারফতে বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবন সম্পর্কে মত প্রচার করিয়াছেন।" ('বঙ্কিমচন্দ্র' সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

টিপ্পনী

গদ্যরীতি :

কমলাকান্তের দপ্তর এর গদ্যরীতি বাংলা প্রবন্ধের গদ্যরীতির এক বিশেষ দিককে চিহ্নিত করে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধগ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি স্মরনীয় যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখখেছেন -

> "মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবমালিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চির স্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই । তৎপূর্বে বাংলাকে কেউ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না । সংস্কৃত পান্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজি পন্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ..... অসম্মানিত বঙ্গভাষা ও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কাল যাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।
>
> এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অণুরূপ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিত বঙ্গভাষার চরণে সমর্পন করিলেন, তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।"

'কমলাকান্তের দপ্ত' এর গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যকে কিভাবে উচ্চশিখরে স্থাপন করেছে তা একটি নমুনা দিলেই ভালোভাবে বোঝা যাবে -

> "অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বলিত, কি করিত তাহার স্থিরতা ছিল না । লেখাপড়া না জানিত এমন নহে । কিছুট ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা ? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই । কত বড় বড় মূর্খ কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে, তাহারা

তালুক মুলুক করিল - আমার মতে তাহারাই পন্ডিত । আর কমলাকান্তের মত বিদ্যান, যাহারা কেবল - কতকগুলা বহিপড়িয়াছে, তাহারা আমার মত গন্ডমূর্খ।"

যাকে কাব্যধর্মী গদ্য বলে উপরের উদাহরণ একেবারেই তা নয়। তাহলে এই গদ্যের প্রধান ধর্ম কী ? এই গদ্যের প্রধান ধর্ম হল তার বাক্য সজ্জা - সবকটি বাক্য মিলে যে বাক্যবন্ধের মালাটি গাঁথা হয়েছে সেই সমাহারের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, যেখানে বিষয় ও বিষয়ী অর্থাৎ Content ও form মিলেমিশে এমন একটি বাক্যসমহার তৈরি করেচে যার মধ্যে রয়েছে একটি দ্বন্দ্বিকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্যগঠন সম্পর্কে 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব' গ্রন্থে শিশিরকুমার দাস লিখেছেন -

"তিনিই বুঝে নীয়েছিলেকন গদ্য যদি পদ্যেদর প্রতিস্পর্ধী হতে চায়, তাকে খুঁজে নিতে হবে নিজস্ব শক্তি আর তার নিজস্ব শক্তি বাক্যের গঠনে ও বাক্যে বাক্যে সংঘর্ষনে ও সম্মিলনে।

বঙ্কিম সম্ভবত এ কথা ও বুঝেছিলো যে কবিতার একটা জগৎ আছে একটা অন্যবক্ত রহস্যময় জগৎ। সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব গদ্যের মধ্যে দিয়েই তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, "আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী।"

বঙ্কিম যখন গদ্যে কাব্য লেখার কথা বলেছেন তখন কিন্তু তিনি মনে করেননি যে গদ্যেদর অন্বয়ের কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।"

'প্রথম সংখ্যা একা' - 'কে গায় ওই?" - 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর এই রচনা গদ্যরীতিতেই যেন পদ্যকে ছোঁয়ার প্রয়াসী -

"বাহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপনের স্মৃতির ন্যায় ঐমধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন ?"

এই গীতিময়তা বা রোমান্টিক উচ্ছাস আনার জন্য গদ্যরীতির পাদবন্ধনে কোন পরিবর্তন আনেনি বঙ্কিম তবে তিনি যেটা করেছেন সেটা হল -

"একটা বাক্যপুঞ্জের আবর্তনের বিরুদ্ধে আরেক ধরনের বাক্যপুঞ্জের আবর্তন। যে মুহূর্তে এই দ্বান্দিকতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন তখন হয়ত পুনরাবর্তিত হয়েছে প্রথম বাক্যপুঞ্জ। আবার কখনও কখনও সম্পূর্ণ অ্য গঠনের, অন্য দৈর্ঘ্যেদর বাক্য দিয়ে ভেঙে দিয়ষেছেজন প্রত্যাশিত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এক্সাকে। একথা বলব না যে, বঙ্কিম বাংলা বাক্যের অন্বয় কৌশলকে কোথাও সচেতনভাবে ভাঙতে চেয়েছেন, এমনকি বদলাতে চেরয়েছেন। তিনি যা চেয়েছেন তা হল, অন্বয়ের সম্ভবনাকে ব্যবহার করতে এবং বাক্যের চেয়েও তিনি জোর দিয়েছেন বাক্যের সমাহারে।" (গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব' শিশিরকুমার দাশ)

'এমি একা' এই দুটি শব্দ বন্ধকে বারবার ব্যবহার করে বঙ্কিম যে ছন্দবন্ধনের সৃষ্টি করেছেন নিটোল গদ্যরীতিতে এনেছেন এক অন্যসুর নীচের উদাহরণ তা পরিস্ফুট হবে -

"আমি একা তাই এই সংগীতে আসার শরীর কন্টাকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরী মধ্যে এই আনন্দময় অনন্ত জনশ্রোতা মধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অণন্ত জনস্রোতমধ্যে মিশিয়া। এই অনন্ততরঙ্গ তাড়িত জলবুদ্ধু সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্ভুদ না হই? কিন্তু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভোগী না হইল তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণ কর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না - ঘ্রানেন্দ্রিয় বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরেদর জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।" (কে গায় ওই)

উপরের দুটি অনুচ্ছেদ অনেক শব্দালঙ্কার আছে কিন্তু তবে থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে বাক্যসজ্জা, ক্রিয়াপদের প্রয়োগ এবং তাদের পারস্পারিক ঐক্য ও বৈপরীত্যে ঠিক যে পদ্ধতিতে পদ্যের স্তবক গড়ে তোলা হয় সেই পদ্ধতিতেই গড়ে তোলা হয়েছে গদ্যের অনুচ্ছেদ, যেকানে প্রতিটা বাক্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গড়ে তুলেছের একটি বৃহত্তম ঐক্য।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

আবার এই ঐক্য আর একটা নতুন মাচত্রা এনে দিয়েছে 'বিড়াল' প্রবন্ধে যখন ;মাজ্জারী' কমলাকান্তকে বলে - "এসংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দহি, মৎস, মাংস সকলই তোমরা খাইবে আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে - আমাদের কি নাই?"

প্রশ্নচিহ্নের আবর্তন এবং হ্রস্ব -দীর্ঘ বাক্যের সমাহার কি অনায়াসে 'বিড়াল' এর

গদ্যকে এক নতুন বাক্যবিন্যাসের দিকে নিয়ে গেছে। বাক্য সমাহারের আরওও একটি নতুন নক্সা দেখতে পাওয়া যায় 'ঢেঁকি' প্রবন্ধে -

> "দেখিতে দেখিতে দেখিলাম - আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি কমলাক্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি ; নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল এমন চাউল তো কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখনই ইচ্ছা হইল এ চাউল মানুষ লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম "অশ্বমনোরথে"।"

উপসংহারে বলা যায় বঙ্কিম বাংলা গদ্য রীতিকে গদ্যপদ্যের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে, উনিশ শতকীয় গদ্যের বাল্যবস্থা কাটিয়ে তাকে যৌবনের জয়টীকায় অভিষিক্ত করেছিলেন যে কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

> "বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য শ্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।" (বঙ্কিমচন্দ্র / আধুনিক সাহিত্য)

চরিত্র :

কমলাকান্ত চরিত্রায়ন বঙ্কিমচন্দ্রের এক অভিনব সৃষ্টি। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে কমলাকান্ত সম্পর্কে বলেছেন -

> "কমলাকান্ত নিজের সীমা সম্পর্কে সচেতন, অথচ অসাধারণ বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ও সে খাপছাড়া। আমরা যেমন তাহাকে লইয়া কৌতুক করি, সেও তেমনি আমাদের লইয়া কৌতুক করে। প্রসন্নগোয়ালিনী ও অহিফেন - ইহা ছাড়া সংসারে তাহার আর তৃতিয় বন্ধন নাই। প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে কাব্যরস অপেক্ষা গব্যরসের সংস্রব বেশী, আর অহিফেন দিব্যদৃষ্টিলাভের উপায় মাত্র।"

কমলাকান্তের দপ্তর এদর ভূমিকা স্বরূপ 'শ্রীভিষ্মদেব খোসনবীস' এর জবানী থেকে জানা যায় যে -

> "অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন্ কি বলিত কি করিত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত এমন নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্থৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না,ন সে বিদ্যা কি বিদ্যা ? তবে কমলাকান্ত কোনদিনই চাকরি করেনি তা নয়। কোন এক ইংরেজ সাহেব তার ইংরেজি শূনে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কেরানীপদে অভিষিক্ত করিয়েছিল কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিত পারিল না। অপিসে গিয়া অপিসের কাজ করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত অপিসের চিঠিপত্রের উপরে শেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার রচনা তুলিয়া লিখিয়া রাখিত; বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। মাসকাবারেদ পে বিল - এ কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাইছে অফিসের উর্ধ্বতন সাহেবের কাছে - এই ছবি আঁকার ফলে তার চাকরি চলে যায়। এর পর সে ভীষ্মদেব খোসনবীস এর বাড়িতে মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করত দুমুঠো ভাত আর এ আধ ভরি আফিম এর থেকে বেশি তার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। আর একটি কাজ ছিল, সে যেখানেই ছেঁড়া কাগজ দেখত সেখানেই তা কুড়িয়ে নিয়ে কি সব লিখত -

"তাহার একট দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না ; দেখিলেই তাআতে কি মাথামুন্ডু লিখিত, কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না।"

সেই লেখা শুনে ভীষ্মদেবের ঘুম পেত।

কমলাকান্ত দার পরিগ্রহ করেনি একদিন সকালে ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া ধারণ করে সে কোথায় যেন চলে গেল আর যাওয়ার আগে মসীচিত্রিত পুরনো, জীর্ন বস্ত্রখন্ডে বাঁধা - ছিন্নপত্রের সমাহার স্বরূপ তার ঐ দপ্তরটিকে সে ভীষ্মদেবের হাতে তুলে দিয়েছিল বখশিশ স্বরূপ। ভীষ্মদেব প্রথমে 'কমলাকান্তের দপ্তর' টি অগ্নিদেবের কাছে আহুতি দিতে চেয়েছিলেন পরে লোকহিতৈষিকতার কারণে মনে হয় যে -

"যে লোকের উপকার না করে তাহার বৃথাই জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে - যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিন্দ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।"

যে কমলাকান্ত ভিষ্মদেবের কাছে তার দপ্তর তুলে দিয়ে বৈরাগ্যসাধনায় চলে গেল কোন এক সময় সে কিন্তু ছিল কামিনীভক্ত -

> "আমিও এককালে কামিনীভক্ত বা বিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। .... বলিতে কি বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভালোবাসিতাম, বর্ষার উচ্ছসিত সলিল চিররঙ্গী তরঙ্গিনী অপেক্ষাও রসমতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষনে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে।"

'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে কমলাকান্তের এই অকপট স্বীকারোক্তির সঙ্গে আমার মন' প্রবন্ধের আত্মকথা যোগ করলে দেখা যাবে সেখানে তিনি অত্যন্ত সচেতন ভাবে জানিয়েছেন যে -

> "ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখন নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে । যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্যচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বস, অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যাদি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতিশিক্ষা হয় না, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।"

কারণ ততদিনে সে বহুজন হিতকর পন্থাকেই নিজের পথ বলে মেনে নিয়েছে তাই তার মনে হয়েছে বিবাহের মাথ্যমে শুধু নিজের পরিবারের হিতসাধন হয় সমগ্রের উপকার হয় না -

> "যদি আত্মোপরিবারকে ভালোবাসি তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালোবাসিতে না শিখিয়া যাক , তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ।" (আমার মন)

অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' এ লিখেছেন -

> "কমলাকান্ত একা ধারে দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক, অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজ শিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিক কল্পনাহীনতা, স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের অদ্ভুতের সঙ্গে

টিপ্পনী

সত্যের, তরলতার সহিত মর্মদহিনী জ্বালায় নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাকুমতায় সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত তদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে?"

কমলাকান্ত সৌন্দর্যপিয়াসী 'কে গায় ওই' প্রবন্ধ থেকে তার সৌন্দর্য দর্শনের নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে -

" রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী নদী সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ শরীরা নীল সলিলা তরঙ্গিনী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন ; রাজপথে কেবল আনন্দ - বালক, বালিকা, যুবক, যুবতি, পৌড়া, বৃদ্ধা, বিমল, চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে।"

কমলাকান্ত 'সুখ' কে এক অনন্যরূপে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম - পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবত নিতান্ত আত্মপ্রিয় তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পন করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।"

কমলাকান্ত বারবার যে পরের উপকার সকলের হিতসাধনার কথা বলেছেন, তা যে পাশহচাত্য হিতবলী দর্শনেরই নামান্তর সেকথা স্বীকার করতেও দ্বিধা করেনি। 'ইউটিলিটি বা উদরদর্শন' প্রবন্ধে কমলাকান্ত জানায় যে -

"বেন্থাম হিতবাদী দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমি এই হিতবাদ মতে অমত করি না ; বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নতুন দর্শনশাস্ত্র প্রনয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নতুন ব্যাখ্যামাত্র।"

কমলাকান্তের কাছে বাহ্যস্পদ অপেক্ষা মানবসম্পদ অণেক বড় 'আমার মন' -এ সে বলে -

টিপ্পনী

"ইংরেজি জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালোবাসেন ইংরেজ সভ্যতার একটি প্রধান চিহ্ন তাঁহার আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত আমরা তাহাই ভালোবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্তি সকল মন্দিরচ্যুত হহইয়াছে - সন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হহিয়াছে। .... পূজা কর, ক্ষতি নাই কিন্তু আমাকে গোটাকতক কথা বুঝাইয়া দাও । তোমার বাহ্য সম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে ? কয়জন আশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে, ? কয়জন অধার্মিক ধার্মিক হইয়াছে ? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে ? এক জনও না ? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমরা চাহি না - আমি হুকুম দিতেছি এই ছাই ভারতবর্ষ হইতে ওঠাইয়া দাও।"

ইংরেজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্টএট ওও ডেপুটি কালেক্টর রূপে কর্ম করার জন্য যে কথা তিনি নিজে বলতে পারেন নি, সেকথা লেখার জন্য - "অর্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরনাপন্ন হওয়া ছাড়া" তার আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

"সেজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসেদর পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যাঙ্গের শর্করামন্ডিল কাব্য, পলিটিক্স সমাজ - বিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশের উপায় সৃষ্টি করিয়া সম্পাদক এবং প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন । কমলাকান্ত জন্মের ইহাই ইতিহাস।" ('কমলকাকান্ত' - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ভূমিকা)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কমলাকান্তের যে জন্মবৃত্তান্ত পেশ করেছেন তার সূত্র ধরে বলা যায় যে কমলাকান্ত লেখকরই Alter ego হিসেবে হাস্যরসের আধারে তৎকালীন সমাজের প্রকৃত রূপটি উদ্ঘাটিত করেছে।

সমাজ দর্শন ও রাজনৈতিক দর্শন :

সমাজমনস্ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে হাস্যরসের আধারে অতি নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন কমলাকান্তের দপ্তর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- এ। ইংরেজের অধীনস্থ ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর হওবার জন্য তিনি নিজমুখে যে সব কথা বলতে পারতেন না তা নির্দিধায় তুলে ধরেএন কমলাকান্তের মত একজন আফিমখপোর খাপছাড়া এরিত্রের জবানীতে। এই প্রসঙ্গে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধগ্রন্থে বলেছেন -

> "কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টি আমাদের সভ্যতার আবরণ ভেদ করিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেইখানে যে ক্ষুদ্রতা ও নীচতা দেখিতে পাইয়াছে তাহার অবিকৃত রূপ আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছে। কমলাকান্ত প্রথমে দেখাইয়াছে যে, যে বাহ্য সম্পদের আমার পূজা করি তাহাতে কাহার ও সুখবৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহার কোন মূল্য নাই। কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদাৎ হিহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, আমরা সামাজিক জীবনে য জাতিবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকি তাহা একেবারেই অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে যাহা দিগকে আমরা পৃথকন শ্রেণীভুক্তমনে করি তাহারা সবাই সমশ্রেণীভুক্ত এবং যদি তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করিতে হয় তাহা হইলে নতুন কোন মাপকাঠি সৃষ্টি করিতে হইবে।"

বিড়াল প্রবন্ধে মার্জার কমলাকান্তকে যখনন বলে -

> "তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেননা আফিমখোর তুমিও কি দেখিতে পাওনা যে ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজন পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল তবে সে তাহারা খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন ? যদি না দেয় তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে না।"

তখন বিডাল - এর এই কথা শুনে অতিষ্ট কমলাকান্ত বলে ওঠে -

> "যাম ! যাম মার্জ্জার পন্ডিতে ! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়্যালিস্টিক ! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল ! ....."

আপাতভাবে এটা এক সোশিয়্যালিস্টের সঙ্গে এক ক্যাপিট্যিলিজমের সমর্থকের কথা বলে মনে হতে পারে যখন কমলাকান্ত বলে যে -

"সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যাতীত সমাজে উন্নতি নাই।"

কিন্তু তারপরে 'মার্জারী মহাশয় বলিলেন -

"চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচার বা চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দেবেন।

এই সব 'নীতিবরুদ্ধ' কথা শৌনা পরে ও যখন কমলাকান্ত পরের দিন বিড়ালকে তার জলযোগের সময় আসতে বলে -

"এক্ষনে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কালে কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব । অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও এবং সরিষাডোর আফিঙ্গ দিব।"

কমলাকান্তের সুদ্দরপ্রসারী কল্পনায় দুধ চুরি করা বিড়াল সোস্যালিষ্ট এবং কমলাকান্তের কথোকথোনে সেই সোস্যালিষ্ট বিড়ালের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ফুটে ওঠে। আর এই কারণেই সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন যে -

"কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টি আমাদের সভ্যতার আবরণ ভেদ করিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেইখানে যে ক্ষুদ্রতা ও নীচতা দেখিতে পাইয়াছে তাহার অবিকৃত রূপ আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছে । কমলাকান্ত প্রথমে দেখাইয়াছে যে, বাহ্য সম্পদের আমরা পূজা করি তাহাতে কাহারও সুখবৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহার কোন মূল্য নাই।"

'আমার মন' প্রবন্ধে কমলাকান্ত নির্দিধায় জানিয়ে দেয় যে -

"পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশ, ইন্দ্রিয়াদিলবদ্ধ সুখ আছে বটে। কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এসকল প্রথম পরে যে পরিমাণ সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে যে পরিমাণ হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না।"

বস্তুতপক্ষে বাহ্যসম্পদ যে কোনভাবেই সুখ এ দিতে পারে না সে বিষয়ে

টিপ্পনী

কমলাকান্ত অত্যন্ত সচেতন -

> "ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'মেটিরিয়াল প্রস্পেরিটির উপর অণুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

টিপ্পনী

এই কথা কমলাকান্ত দ্বিধাহীনভাবে জাইয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ইংরেজ এদেশে এসে থেকে বাহ্য সম্পদের পূজা শুরু করেছে। "টাকায় ঝনঝনানিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক ! মন ! মন আবার কি ? টাকা ছাড়া মন কি ? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই , টাঁকশালো আমাদের মন ভাঙে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ।"

আমার মন প্রবন্ধেই কমলাকান্ত তার সেই অব্যর্থ প্রশ্নবানে পাঠককে জর্জরিত করেছে -

> " আমাকে গোটাকতক কথা বুঝাইয়া দাও । তোমার বাহ্য সম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে ? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে ? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে ? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে ? একজ জনও না ? যদি না হইয়া থাকে তবে তোমার এই ছাই আমার চাঈ না - আমি হুকুম দিতেছি, এই ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।"

একইভাবে 'পতঙ্গ' প্রবন্ধেও ভোগবাসনার প্রতি উন্মত্ততাকে কটাক্ষ করে কমলাকান্তের সমাজ - মনস্কতার পরিচয় প্রকাশীত হয় -

> "সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে.... জ্ঞান বহ্নি, ধন বহ্নি, মান বহ্নি, রূপ বহ্নি, ধর্ম্ম - বহ্নি, ইন্দ্রিয় বহ্নি, সংসার বহ্নিময়।"

কাম্য বস্তুর স্বরূপ না জেনেই পতঙ্গের মত পুড়ে মরাকে নিবারণ করতে চেয়েছে কমলাকান্ত। একদিকে বঙ্গীয় যুবসমাজকে সুসংবদ্ধ করা অন্যদিকে ইংরেজদের যে দিকটা খারাপ তাকে বন্ধ করার হুকুম জারি করা, সমাজ ও রাজনীতিও মনস্ক বঙ্কিম কমলাকান্তের মাধ্যমে এক ঢিলে এই দুইটি পাখি মারতে চেয়েছিলেন । সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ওপনিবেশিক শাসনে দেশ কিভাবে উসন্নে যাচ্ছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কমলকান্ত বলেছে -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

94

> "দেখিলাম এ সংসার কেবল ঢেঁকিশষাল। বড় বড় ইমারত বৈঠকখানা রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা - তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া

খাড়া হইয়াছে। কোথাও জমিদাররূপে ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপিন্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখ রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে নসিদ্ধ করিয়া অন্নভোজন করিতেছেন, কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড় পিষিয়া, ভানিয়া বাঈর করিতেছেন - আইন, বিচারক সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন - দারিদ্র্য, কারাবাস - ধনীর ধনান্ত - ভাল মানুষের দেহান্ত।"

টিপ্পনী

জমিদার ঢেঁকি প্রজাদের এবং আইনরক্ষক ও বিচচারক ঢেঁকি ভাল মানুষকে শোষন করে চলেছে। কমলাকান্ত আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন থাকাটা একতা প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে, নেশার ঘোরে সে দিব্যদৃষ্টিতে যেন সবকিছু দেখতে পায়। বস্তুতপক্ষে সমাজনীতি ও রাজনীতির গভীর দর্শনকে জলবৎ তরল করে পাঠকের কাছে পেশ করায় এ যেন আর এক উপায়।

প্রমথনাথ বিশী 'বঙ্কিমসরনী' তে লিখেছেন -

"কমলাকান্ত একটি আইবিয়ার ঘনীভূত মানবমূর্তি। এখানেই অন্যান্য নরনারীর সঙ্গে তার প্রভেদ। নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দলাল বিশেষ পরিবারের লোক, দত্তবাড়ি বা রায়বাড়ি থেকে তারা বের হয়ে এসে পাড়া প্রতিবেশীর গৃহে যাতাযাত করে; কমলাকান্তের আগমন যেন শূন্যতা থেকে, যাতাযাত সকলের ঘরে ; আর সকললে বিশেষ থেকে নির্বিশেষ, সে নির্বিশেষ থেকে বিশেষ। তার নির্বিশেষ প্রকৃতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাকে চালচুলোহীন ভবঘুরে করা হয়েছে; নিবাস আর নসীরামবাবুর আটচালায়, অভাবে প্রসন্নর গোশালায়; পেশা তার ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।' তার মোহের মধ্যে ঐ আফিমটুকু, যা নাকি মোহচ্ছেদের কারণ। অনেক হিসেব করে এই বেহিসেবী লোকটিকে গড়তে হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

'আমারমন' প্রবন্ধে কমলাকান্ত যেভাবে ইংরেজের অণুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত বাহ্য বস্তুরপ্রতি অধিক প্রেমের নিন্দা করেছেন ঠিক সেভাবেই 'বড় বাজার' প্রবন্ধে কমলাকান্তেদর মনে হয়েছে -

"এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎবাজার - সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্যমূল্য প্রাপ্তি।

টিপ্পনী

সকলেই অণবরত ডাকিতেছে 'আমার দোকলানে ভাল জিনিষ - খরিদ্দার বলে আয়' - সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারেদর চোখে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোখানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।"

বস্তুতপক্ষে বিশ্বসংসারকে একটি বাজারে পরিণত করা ঔপনিবেশিক বানীজ্যনীতিরই একটি চাল। প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের কৃষিজীবী সমাজে যে ববাংলায় বা ভারতে বস্ত্র উৎপন্ন হত তা ম্যানেচেষ্টারের কাপড়ের থেকে কিছুমাত্রায় কম ভালো ছিল না কিন্তু সেই শিল্পকে সমূলে বিনাশ করে ঔপনিবেশিক ইংরেজ তার পসরা সাজিয়েছে -

"দেখিলাম অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে - অসংখ্য খরিদ্দার খরিদ করিতেছে দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ট দেখাইতেছে।" (বড় বাজার)

বিশ্ববাজারের ঘোর কোলাহল মুখর পরিবেশে দাঁড়ীয়ে কমলাকান্তের ছদ্মবেশে "বন্দেমাতরম' - সংগীতের উদগাতা বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সমাজ দর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিপথগামী বাঙালী সমাজকে একত্রিত করতে হবে তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে আহ্বান করেছিলেন -

"এস ভাই সকল আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে - চল! চল! অসংখ্য বছর প্রক্ষেপে এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যাস্ত করিয়া আনি। ভয় কি না হয় ডুবির, মার্তহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি,, বড় পূজার ধূম বাধিবে ..... কত ব্রাহ্মণ পন্ডিত লুচি মন্ডার লোভে বঙ্গপুজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে - কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিয়ে - কতদীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে।"

'আমার দুর্গোৎসব' এ কমলাকান্তর এই আহ্বান প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জাতীয়তাবাদের সূত্রপাতকে চিহ্নিত করে যা পরবর্তিকালে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে সমগ্র

ভারতবর্ষকে উদবোধিত করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাস চিন্তা,সমাজদর্শন ও রাজনৈতিক চেতনা উনিশ শতকীয় বাঙালী জীবনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর মাধ্যমে এক শাশ্বত রূপ লাভ করেছিল। বাঙালীর আত্মজাগরণ এবং পরাধীনতার গ্লানি মথিত, মননশীল সৃজনশীলতার আধার হিসেবে ১৮৭২ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকা যার অন্যতম রচনা হিসেবে উনিশ শতকীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জরিত বাঙালী মানসের রূপবয়ব কালের মাত্রায় অক্ষর হয়ে উঠেছে কমলাকান্তের মাধ্যমে।

হাস্যরস :

বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' এ তৎকালীন সমাজ জিয়নের অসঙ্গতিকে হাস্যরসের আধারে তুলে ধরেছেন। শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'বঙ্কিমচন্দ্র' তে লিখেছেন -

> "শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' কে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করিতেন । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বহু সরস, কৌতুককোজ্জল বর্ণনা আছে, গজপতি বিদ্যাদিগগজ প্রভৃতি দুই একটি কমিক চরিত্রও আছে, কিন্তু কোন উপন্যাসসেই হাস্যরসের প্রাচুর্য নেই। ... উপন্যাসের এই অসুবিধা অতিক্রম করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের সৃষ্টি করিয়াছেন। কমলাকান্ত একটি শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র; সেই দিক দিয়া বিচার করিলে কমলাকান্ত অনন্য সাধারণ, কিন্তু তাহার মারফতে বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবন সম্পর্কে বহু মত প্রচার করিয়াছেন। কমলাকান্ত ব্যাঙ্গপ্রিয় । .... শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের প্রধান লক্ষণ এই যে কৌতুককের পত্র তাহার মোহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন । সে যে কোথায় সীমা লঙ্গন করিয়াছে, কোথায় অভ্যস্ত পথ হইতে সরিয়া গিয়াছে, কোথায় বাস্তবের পোজ্জ্বল আলোক হইতে মায়ার কুহেলিকায় চলিয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে তাহার কোন চৈতন্য নাই। আমরা যখনই কাহাকেও লইয়া কৌতুক করি তখন লক্ষ্য করি যেন সেই ব্যাক্তি আমাদের মনোভাব এবং তাহার অপূর্ণতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, যুমের মধ্যে যাহার মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিয়াছি তাহার ভুত রূপ লইয়া ততক্ষনই মজা করা যায়, যতক্ষণ সে দর্পনের কাছে উপস্থিত হয়

টিপ্পনী

নাই।"

নিজের সম্পর্কে এই সেতনতার অভাব মনুষ্যজীবনে অফুরন্ত হাস্যধারার সৃষ্টি করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ উপাধি পাওয়ার সুবাদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৫৮ সালের ৬ই আগষ্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদাভিষিক্ত হন।কর্মজীবনে যশোর, খুলনা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, ভদ্রক প্রভৃতি নানাবিধ স্থানে বসবাসের সুবাদে বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পান। যার ফলে মনুষ্যচরিত্রের অন্তরতম স্থানে অনুপ্রবেশ করার এক অনায়াস অধিকার তিনি লাভ করেছিলেন, যা তাঁকে প্রতিনিয়ত মনুষ্যচরিত্রের অসঙ্গতি ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। আর মনুষ্যচরিত্রের অসঙ্গতি থেকেই যে হাস্যরসের জন্ম হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধগ্রন্থের কৌতুকহাস্য প্রবন্ধে বলেছেন -

> "আমাদের অন্তরে বাঈরে একটি সুযুক্তি সংগত নিয়মশৃঙ্খলায় আধিপত্য; সমস্তই চিরাভ্যস্ত, চিরপ্রত্যাশিত; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমি মধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না - ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারনা হয় তবে আমাদের চিত্ত প্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।"

আবার 'আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধগ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন -

> "বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসংগতি প্রকাশ হইয়া পড়ে হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কতদূর পর্যন্ত গেলে একটা ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া ওঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা হাস্যরসিক তাঁহাদের অন্তঃকরনে একটি বোধশক্তি আছে যারদ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্তা আচার ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে সুসংগতির সুক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন। নির্মম সূক্ষ্ম সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে

টিপ্পনী

আনয়ন করেন । .... বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণিতে উন্নীত করেন।"

কমলাকান্ত অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধির অধিকারী হয়ে ও কেমন যেন খাপছাড়া। প্রসন্নগোয়ালিনী এবং অহিফেন ছাড়া তার জীবনে আর কিছু নেই। সে যেন অনেকটাই বাধাবন্ধনহীন। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে "কমলাকান্ত এই বন্ধনবীনতা আমাদের কাছে হাসির সামগ্রী"। অন্যত্র বলেছেন "আমারা যামন তাহাকে লইয়া কৌতুক করি সেও তেমন আমাদিগকে লইয়া কৌতুক করে"।

'কমলাকান্তের দপ্তর' এর হাস্যরস মূলত হিউমার (Humour) ও উইট (Wit) এর এক অনন্য সাধারণ মিশেল। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -

> "উইট হইতেছে বুদ্ধির তরবারি খেলা, নিঃসম্পর্কিত বস্তু বা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় অতর্কিত সাদৃশ্য আবিষ্কার। Humon - এ বুদ্ধির তীব্র দীপ্তির সহিত সহানুভূতির করুণ শিতল স্পর্শেদর একপ্রকার অপরূপ সম্মিলন - মুখের হাসি ও চোখনের জল মিশিয়া একপ্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র সৃষ্টি। wit এ বুদ্ধির স্বচ্ছন্দ লীলা আমাদের চোখ বাঁধাইয়া দেয় ও সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে।"

কমলাকান্তের দপ্তর' এ হিউমারিস্টের হাসির খোঁচাই সবথেকে বেশি উল্লেখনীয়। যদি ও তার সঙ্গে সঙ্গে উইট এবং স্যাটায়ার এর প্রভাব ও আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় হল যে Satire হল শ্লেষ মিশ্রিত এক তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গ। এটি নির্মম ও কঠোর।

পজ্রসন্ন গোয়ালিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে 'পঞ্চম সংখ্যা - আমার মন' এ বঙ্কিম কিভাবে Human এর অবতারনা করেছেন তা নীচের উদাহরণ থেকে স্পষ্ট -

> "প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিশি হাসিভরা মুখ কপালের একটা ছোত উলকি টপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত আমি তাহা জড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোক আমাকে নিন্দা করিত ।পুজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুতিতে পায় না আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না নচেৎ গব্যদরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এভাবেই অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কমলাকান্ত প্রসন্নর পরিচয় ও তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে এক নিটোল হাস্যরসেদর পরিচয় দিয়েছেন। আবার সে যখন বলে যে -

> "প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা। একথা ও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া পাড়ার একটি নষ্ট বুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে প্রসন্ন আছেন এজন্য সৎ বা সতী বটে ল তিনি সাধু ঘোষের স্তরী, এজন্য সাধ্বী ; এবং বিধবাবস্থাতে ও পতিছাড়া নহেন ষএজন্য ঘোরতর পরিব্রতা।"

কল্পনাবিলাস ও সংযমের এই সমন্বয়ের ফলে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর প্রবন্ধসমূহ অপরূপ এক হাস্যকিরণে সদা দীপ্তমান। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয় -

> "বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বন্ধ নহে ; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার সৌন্দর্য এবং রমনীতার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশে প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যান হইয়া উঠে।"

গোত্রবিচার :

কমলাকান্তের দপ্তর এর চরিত্রগুলো হল কমলাকান্ত অর্থাৎ কমলাকান্ত চক্রবর্তী, ভিষ্মদেব খোসনবীশ, নসরামবাবু এবং প্রসন্ন গোয়ালিনি। এই সম্পর্কে 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা গ্রন্থে ড. অধীর দের মন্তব্য স্মরনীয় -

> "কমলাকান্তই প্রধান চরিত্র তাহারই চিন্তাভাবনা অন্যান্য চরিত্রগুলির সংলাপ সহযোগে প্রকাশ পাইয়াছে । আফিং নেশাগ্রস্ত ব্যাক্তি কমলাকান্তের বিবৃতি হইতে তাহার চরিত্র তথাকথিত সাধারণ নেশাগ্রস্ত বিকৃত মস্তিস্ক কোন ব্যাক্তি নহে, সেই সম্পর্কেও নিঃসন্দেহে হওয়া যায় । বরং কমলাকান্তের মধ্যে দিয়া একন প্রত্যুৎপন্নমতি, সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল পুরুষের পরিচয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে

সংকলিত বিবিধ বিষয়ক রচনার মাধ্যমে কমলাকান্তের একটি উজ্জ্বল চিত্ররূপ পরিস্ফূট হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনব গ্রন্থে চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ প্রভৃতি ঔপন্যাসিক উপকরণ সমূহ বর্তমান থাকায় কোন কোন সমালোচক ইহাকে উপন্যাসের বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ঔপন্যাসিক ধর্ম বা স্বরূপ প্রকৃতির কিছু কিছু বাহ্যিক লক্ষ্মণ ইহাতে প্রকাশ পাইলেও সার্বিক রসোত্তীর্ণ উপন্যাসের সর্বপ্রধান যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পরম্পরা সম্বলিত কাহিনী বা গল্প এবং উপন্যাসগত বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়া কাহিনীর রস পরিণতির অভিমুখে যে স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি, তাহা কোথাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অতএব কমলাকান্তের দপ্তর' রচনাটিকে উপন্যাস পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা স্বভাবতই সম্ভব হয় না।"

'কমলাকান্তের দপ্তর এর রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের মনন ঋদ্ধ। আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হল প্রবন্ধ 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত কিনা তা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। ড. অধীর দের মতে -

"উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য নান বিচিত্র অবস্থার ধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বর্তমানে একটি গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছে। এ কথা স্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যর অন্যান্য বিভাগেদর ন্যায় বাংলা প্রবন্ধের মধ্য দিয়া ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির একটি সুসপষ্ট ও অনন্য পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

ইংরেজি সাহিত্যে Easszy অর্থে যে বিশেষ সাহিত্যকৃতি বোঝায় - বাংলায় তার সমার্থক হিসাবে 'প্রবন্ধ' নাম প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজি Essay যেমন বিস্তৃত ও বিচিত্র, তেমনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিধি ও ব্যাপক ও বিশাল। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখকের রচনায় এমন কি, একই যুগে বিভিন্ন লিপ কুশল সাহিত্যিকের সাধনায় উভয় ভাষাতেই Easay বা প্রবন্ধ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।"

'দ্যা আমেরিকান পিপলস এনসাইক্লোপিডিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

"An essay way also be antically self centred, as are those of Macanlay and Methew Arnold; it may be closely

টিপ্পনী

resoned and angumentative, lixe loclis Essay concerting Human understanding; it may penetrate into every aspect of a subject, like Bunkers Essay on the sublime and Beautiful."

টিপ্পনী

ড. অধীর দের মতে -

"প্রবন্ধের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সাধারণত কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লেখক যখন কোন ভাব বা বিষয় যুক্তিযুক্ত ও সংযতভাবে বা পরিপাটিরূপে গ্রন্থন করেন এবং প্রধানত সরস গদ্যরীতিতে ও দীর্ঘ বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে তাহার প্রকাশভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করেন, তখনই তাহাকে প্রকাশভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তাহাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।"

প্রবন্ধ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল প্রকৃষ্ট বন্ধন। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য পদ্য উভয় রচনার ক্ষেত্রেই প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়বস্তুর সুষ্ট সম্বন্ধ রূপ বন্ধন থেকে শুরু করে ছন্দোগত বন্ধন অথবা সর্গ - পর্ব অধ্যায় এর বন্ধন এই সমস্ত কিছু বোঝাতেই প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবঋত হয়েছে। সস্কৃত অলঙ্কারিকগন 'রামায়ন', 'মহাভারত', 'মমালতীমাধব', 'রত্নাবলী' প্রমুখ কাব্য নাট্য সবকিছুকেই প্রবন্ধ আখ্যানে ভূষিত করেছেন -

"বর্ণরচনয়োরুদাহরিষ্যতে। প্রবন্ধে কথা মহাভারতে শান্ত :
রামায়নে করুন। মালতীমাধবরত্নবল্যাদৌ শৃঙ্গারঃ। এবন্যত্র।"

-এভাবেই 'সাহিত্য দর্পন' - এ বিশ্বনাথ কবিরাজ 'রামাসয়ন', 'মহাভারত', 'মালতীমাধব', 'রত্নাবলীর রস বিচার করেছেন আর সবকিছূকেই প্রবন্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।

বাংলা সাহিত্য প্রবন্ধ শব্দটি কৌশল বা উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (বড়ুচন্ডীদাস বিরচিত)

"এসব কাজের আক্ষো জানি এ প্রবন্ধ
এবেকেঁ তোমার তার হৈব নেহাবন্ধ।।"

শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ এর 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' -এ আবার প্রবন্ধ 'আরম্ভ' এবং 'পরস্পর অণ্বয়যুক্ত বাক্যাবলী' অর্থে ববহৃত হয়েছে।

"এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ

দ্বাদশ প্রবন্ধতাতে গ্রন্থ ষমুখবন্ধ।।"

উনিশ শতকে যে Essay রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল তা প্রথমে 'প্রস্তাব' নামে আখ্যাত হয়েছিল। ১৮৫২ সালে রঙ্গ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রবন্ধ শব্দটির ব্যবহার করেন - "বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিতহয়। প্রবন্ধেদর সমার্থক শব্দ হিসেবে 'প্রস্তাব' 'নিবন্ধ', 'সন্দভ', 'রচনা' প্রভৃতিরও প্রয়োগ হয়েছে।

ইংরেজি Essay র মত বাংলা প্রবন্ধকেও দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে Objective, Formal বা Impersonal Essay হল বস্তুনিষ্ট প্রবন্ধ আর Subject, Informal, personal বা Familiar essay হল ব্যাক্তিগত প্রবন্ধ।

এই প্রসঙ্গে আর্থার ক্রিস্টোফার বেনসনের মন্তব্য স্মরনীয় - তিনি 'দ্যা আর্ট অফ দ্যা এসেইসট (The Art of Essayist' by arthur Chirstopher Benseson) গ্রন্থে জানিয়েছেন -

> "An essay in a thing which some one does himself, and the point of the essay is not the subject, for any subject will suffice, but the charm of personality."

বিষয় যাই হোক না কেন ব্যাক্তিগত প্রবন্ধে বিষয় অপেক্ষা বিষয়ী বড় হয়ে ওঠে, বড় হয়ে ওঠে লেখকের ব্যাক্তিত্ব।

'কমলাকান্তের দপ্তর' এর 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধে বলা হয়েছে -

> "তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শি্রিয়া উঠে তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থর হরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার সাদা সাদা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকেষ ? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।"

প্রবন্ধের প্রথম অণুচ্ছেদে কমলাকান্তের বয়ান থেকেই বোঝা যায় যে এ রচনা বসন্তের কোকিল সম্পর্কিত কোন বস্তুনিষ্ঠ রচনা নয়, এ রচনা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত হয়েছে তাই এহল ব্যাক্তিগত প্রবন্ধ।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আমার মন :

"আমার মনকোথায় গেল ? কে লইল ? কই যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রেখেছিলাম, সেখানে নাই, কে চুরি করিল ? কই সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকে পাইলাম না। তবে কে চুরি করিল ?"

এই আত্মজিজ্ঞাসা নিয়েই শুরু হয়েছে 'আমার মন' এই রচনা সম্পর্কে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাগ্রন্থে ড. অধীর দে মহাশয় বলেছেন -

"জীবনের উদ্দেশ্য বা কাম্য কি - এই প্রশহনই রচনাটিতে উত্থাপিত হইয়াছে। প্রকাশভঙ্গী বা পরিবেশন কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র রচনাটিকে কৌতূহলী ও মনোগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। কমলাকান্তের মন কখনও কৌতুকী, কখন অশহরুমুখী আবার কখনও বা দীর্ঘশ্বাসে বেদনাগন্ধী সংসারে কোথাও তৃপ্তি মেলে না, মেলে না অর্থে না ধনবৃদ্ধিতে, মেলে না বিদ্যায় মেলে না ভোগে - একমাত্র ত্যাগে অর্থাৎ পরার্থে আত্মসমর্পনেদর মধ্যেই সুখের বা তৃপ্তির স্বার্থকতা, পরার্থে আত্মসমর্পনের মধ্যেই সুখের বা তৃপ্তির স্বার্থকতা, পরার্থপরতাই ভারতের শাশ্বত মন্ত্র। এই মন্ত্র অধুনা পাশ্চাত্য বাহ্যসম্পদের (Material Prosperity) প্রভাবে ভারতবাসী বিস্মৃত। কমলাকান্ত ওরফে বঙ্কিমন্দ্র তাহাতে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আশঙ্কজাতেই তিনি নিরস্ত থাকেন নাই। আশঙ্কা নিরসনের সূত্র ও আবিষ্কার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কেবল বস্তুবাদী অগ্রগতি বা সমৃদ্ধি এবং সামাজিক কল্যানসাধনই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য বা পরিণতি নহে। লক্ষ্য আরও সূদূরপ্রসারী। মানুষ অন্তরে অন্তরে সহৃদয়তার মন্ত্রেদীক্ষিত হউক বিশ্ব্যাপিনী প্রীতির প্রতিষ্ঠা হউক - ইহাই জীবনের স্বার্থকতা ও মনের সত্যকার তৃপ্তি - 'মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় - বৃদ্ধির জন্য কি একটা কলম হয় না ? মানব প্রেমেই মানবমুক্তি এই মর্মসত্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'আমার মন' রচনায় উদ্ঘাটিত করিয়াছে।"

কমলাকান্তের বন্ধু কমলাকান্তকে বলেছিল 'পপাকশালা' মন খুঁজে দেখাতে -

"যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফতার সুগন্ধ, যেখানে ডেকচি, সমারূঢ়া

অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুট বুটবুট তকবকোও ধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, মতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া মৃন্ময়, কাস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চাহে না। যেখানে মাংসযুক্ত সেই অস্তিতে কোরমা রূপ বজ্র নির্মিত হইয়া ক্ষুধারূপ বৃত্রাসূর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে, যেখানে পাচকরূপী বিষ্ণুকর্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়।"

এই আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই ব্যাক্তিগত প্রবন্ধ বা Personal Essay র সূত্রপাত ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যে। আধুনিক রম্যরচনার বীজ ও এর মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। ব্যক্তিগত রচনার সূত্র ধরেই কমলাকান্ত রামমনি ও প্রসন্ন গোয়ালিনীর কথা উত্থাপন করে।

"হালদার বাড়ীর রামমনি দেখিতে অতি কুৎসিতা এবং তাহার বয়ক্রম ষাটবৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশনে মুক্ত হস্ত বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল বামমনির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হোয়ায় এটি ঘতে নাই।"

একইভাবে কমলাকান্তর অকপট স্বীকারোক্তি -

"প্রসন্নর সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে কিন্তু সে প্রনয়টা কেবল গব্যরসাত্মক তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরামুখ, কপালের একটি ছোট্ট উলকি টিপের মত দেখাইত, সে রসের হাসি পথে ছাড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত।"

এভাবেই রন্ধনশালা থেকে কমলাকান্ত প্রসন্নের পিছু ধীবমান হল হারিয়ে যাওয়া মনের সন্ধানে। কিন্তু পাকশালার 'পলান্ন কোকতা প্রভৃতি অধিষ্ঠাত্রীদেবগণ যেভাবে কমলাকান্তকে নিরাশ করেছে কিন্তু না প্রসন্ন না তার মঙ্গলা গাই কেউই কমলাকান্তর মনের সন্ধান জানে না। পথের কলসী কাঁধে জল আনতে যাওয়া যুবতীও জানিয়ে দিল যে সে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কমলাকান্তর মন চুরি করেনি -

"চুরি করি নাই, তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর কষিআ আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।"

কমলাকান্ত বুঝতে পারল মনের বন্ধন না থাকলে মন উড়ে যায়।

"মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এই সংসারে আমার মন কোথাও নাই। .বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই, নাহলে মন উড়িয়া যায়।"

আত্মজিজ্ঞাস কমলাকান্তর মনে হয় -

"এসংসারে আমরা কি করিতে আমি, তাহা ঠিক বলিতে পারিনে - কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আমি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম - পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা সম্ভবত নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া৷ স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এজন্য তহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের কোন মূল্য নাই।"

কমলাকান্তর দৃঢ় বিশ্বাস পরসুর্বন ভিন্ন মানুষের সুখ খুঁজে পাওয়ার অন্য কোন রাস্তা নেই।

"আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছে। এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে মানুষের স্থায়ী সুখের অন্যমূল্য নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধনমান ভোগাদির প্রতিধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাববান হইবে। ..... সার্ধ্ব দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে শাক্য সিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না কিছুতেই আত্মদরেদর ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসক যে মেটেরিয়েল প্রস্পেরিটি" নিয়ে এসেছে, যার দিকে যুবসমাজ পতঙ্গ ছুটে চলেছে যা এই বিশ্বসংসারকে একটি বড় বাজারে পরিণত করেছে সেই বাহ্য সম্পদের আস্ফালন পরাধীন জাতির পক্ষে কোনমতেই ভাল হতে পারে না। তাই কমলাকান্ত বলে -

"ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালোবাসেন - ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত আমরা তাহাই ভালোবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ..... বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্পদ পত্রসকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গলা, সম্বদপত্র কাঁসিদর, শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি।"

এরপরে কমলাকান্ত প্রশ্ন করেছে -

"তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রনয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না?"

শেষ পর্যন্ত স্বদেশ প্রেমিক কমলাকান্ত বলে ওঠে -

"তোমার বাহ্য সম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? ..... যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমারা চাহিনা - আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।"

বিড়াল:

'কমলাকান্তের দপ্তর' এর একটি উল্লেখনীয় রচনা হল 'বিড়াল'। ১২৮১ বঙ্গাব্দেদর চৈত্র সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' এ রচনাটি প্রথম প্রকাশিতহয় এবং ১৮৭৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশ কালে তা ১১ টি পরবন্ধের একটি অন্যতম প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশত হয়। 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা' গ্রন্থে ড. অধীর দে এই প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন -

"সাধারণ প্রবন্ধ শিল্পের যে বিশেষ লক্ষণ অর্থাৎ নৈয়ায়িকল বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কোন প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থাপনা - তাহা এই রচনার প্রতিটি অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করা যায়। কূটতর্কবহুল বিষয়ের বিচার মিমাংসা হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করিবার অনন্য সাধারণ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। 'বিড়াল' নামক রচনা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই রূপকাত্মক রচনাচিত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ধনতন্ত্রবাদ এই দুইটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের বৈশিষ্ট্য যুক্তি যুক্তি-তর্ক সহকারে বিকৃত করিয়াছেন। চতুস্পদ জন্তু বিড়াল সাম্যবাদী সমাজের প্রতিনিধি এবং উকিল ও কমলাকান্ত পুঁজিবাদী ধনিকসম্প্রদায়ের প্রতিভূরূপে ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতাদর্শ অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বিশুদ্ধ একটি রাষ্ট্রনীতিমূলক বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব হইত, কিন্তু এখানে নিছক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া মূল উদ্দেশ্যে প্রকাশের অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। রাজনৈতিক জটিল মতবাদের অন্তগূঢ় তত্ত্ব শ্লেষাক্ত রেখাচিত্র আবরণে বঙ্কিমচন্দ্র দুগ্ধাপহারক বিড়াল ও আফিং সেবী কমলাকান্তের সরস সঙ্গতিপূর্ণ কথোপকথোনেদর মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। ফলে বুদ্ধিগ্রাহ্য রাষ্ট্রীয় মতবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র সর্বহারা ব্যাক্তিদিগের ব্যাথা -বেদনা এবং চুরি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সামাজিক দুর্নিতির মূল উৎস সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনামধ্যে যে বাস্তব সত্যের আলোকপাত করিয়াছেন, তারা যেন মর্মস্পোর্শী, তেমনি তাহা কৌতুকমিশ্র বিদগ্ধমনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছে।"

নাটকীয় ভঙ্গীতে রচনার সূত্রপাত -

"আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলোজ জ্বলিতেছে - দেয়ালের উপর চঞ্চল - ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই এজন্য হুঁকাহাতে, নিশীতিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটালু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময় একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, মেও !"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

প্রসন্ন কমলাকান্তের জন্য যে শুধু দুধ রেখে গিয়েছিল তা নিঃশেষ করে দিবেছে এই বিড়াল। এই এই দুধ কার?

"আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধো আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই, সুতরাং রাগ করিতে পারি না।"

ধনের সমান অধিকার সকলেরই রয়েছে ধনের অসম বন্টনের ফলেই সমাজে ধনী - দরিদ্রের ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে - এখানে দুগ্ধ ধনের প্রতীক। কিন্তু সামগ্রিক আলোচনায় কোন তত্ত্বের আড়ম্বর নেই। বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথোনে অনায়স ভঙ্গীতে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের নিগূঢ় কথা প্রকাশিত হয়।

"এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে আমরা কিছু পাইব না কেন ? .... দেখ আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? কাইতে পাইলে কে চোর হয় ? দেখ, যাঁহার বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষা ও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরেদর নহে - চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপন ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরেদর দন্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপন, তাহার দন্ড হয় না এন ?"

বিড়াল কমলাকান্তকে আরও বলে যে, যদি কোন ন্যায়লঙ্কার বা শিরোমণি মহাশয় এসে দুধ খেয়ে যেত তাহলে কে কিছু বলত না -

"তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ
-দারিদ্র্যের ক্ষুধা কেহ বুঝঝে না।"

আবার ধনীর পদলেহনকারীর কোন সমস্যা হয় না সেকথা বিড়াল কি সহজেই না লে দেয় -

"যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল, গৃহমর্জ্জার হইয়া বৃদ্ধের নিকট যুবতি ভার্য্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল - তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।"

ধনবৈষম্যের সঙ্গে বর্নবৈষম্যের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিড়াল -

"আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না ! এ পৃথিবীর মৎস মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও নইলে চুরি করিব।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সাধারণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না ? চোরের দন্ড আছে নির্দূয়তার কি দন্ড নাই? দরিদ্রেদর আহার সংগ্রহের দন্ড আছে। ধনীর কার্পন্যের দন্ড নাই কেন ?"

কমলাকান্ত এই সব প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না।বিড়াল বলে যায়-

"তুমি কি দেখিতে পাওনা যে ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয় ? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন ? যদি করিল তবে কে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন ? যদি না দেয় তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না অনাহাচরে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

এর উত্তরে কমলাকান্ত বিড়ালকে সোশিয়ালিস্ট বলে; বলে যে 'সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যাতীত সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি।" কমলাকান্ত বুঝতে পারে

"এ মার্জ্জার এবং সুতার্কিক ও বটে ....."

বিড়াল বলে-

"যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিস উপবাস পালন করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিনদন উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে ননীরাম বাবুর ভান্ডার ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

সবশুএ কমলাকান্ত বিড়ালকে বলে-

"এক্ষনে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব । অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি কাইও না।"

সবশেষে "একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিয়াছি - এই ভেবে কমলাকান্তের মনে বড় আনন্দ হল।

এই যৌবনে বঙ্কিম হনস্টয়ার্ট মিল, মেরেমি বেন্থাম, রবাট ভয়েন, সেন্ট সাইসন

প্রমুখ সমাজ তত্ত্ববিদদের রচনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যার প্রক্ষত্য ফলছিল প্রবন্ধগ্রন্থ 'সাম্য'। যা পরবর্তীকালে তিনি পরিহার করেছিলেন। তবে 'সাম্য'র বঙ্গদেশের কৃষ্ণরংএ তিনি বিবিধ প্রবন্ধ এর দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' এ তিনি বস্তু নিষ্টভাবে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের আলোচনা করেছিলেন 'বিড়াল' সেই সমাজ বৈষ্যমকেই ব্যাক্তিগত প্রবন্ধের আধারে পরিবেশিত হয়েছে। সামাজিক ধনবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজনের শ্রীবৃদ্ধি হয় অথচ বঙ্গদেশের কৃষকের কোন শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না, শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না বিড়াল এর।

ইংরেজ সাহিত্যিক লী হান্টের রচনা 'the Cat by the Fire side' এর সঙ্গে বিড়াল এর সাধর্ম বিষয়ে অনেকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই সাদৃশ্য শুধুমাত্রই বহিরঙ্গে বা বলা চলে মননবিশ্বে বহুবিধ রচয়িতার মধ্যে বিষয়গত সাদৃশ্য। লী হান্ট ও বঙ্কিম উভয়েই সমাজমনস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন স্ব স্ব রচনাক্ষেত্রে।

বসন্তের কোকিল :

বসন্তের কোকিল বঙ্কিমচন্দ্রের আরও একটি সমাজমনস্ক রচনা 'বসন্তের কোকিল এর মধ্য দয়ে কমলাকান্ত সেই সব লোকের কথা বলেছে যারা সুখের সময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় অথচ দুঃখের সময় তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না।

> "যখন ননীবাবুর তালুকের খাজনা আসে তখন মানুষ কোকিল তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায় - কত টিকি ফোঁটা, তেড়ি, দশমার হাট লাগিয়া যায় - কত কবিতা শ্লোক গীত, হেট ইংরেজি, মেঠো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে ননীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত কাকলি - সংকুল গৃসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘরবাড়ী আঁধার করিয়া তুলে - কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন ননী বাবু বাগানে যান, তখন মানুষ কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয় ল আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিও হইতেছিল, আর ননীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও 'অসুখ" এজন্য আসিতে পারিলেন না ; কাহারও বড় সুখ একটি নাতি হইয়াছে। এজন্য আসিতে

টিপ্পনী

পারিলেন না, কাহারাও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা সেদিন বর্ষা বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?"

টিপ্পনী

এভাবেই ননীবাবুর বাড়ীতে আশ্রিত কমলাকান্ত তার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে "ছেঁড়া কাগজ" এ গড়ে তুলেছে কমলাকান্তের দপ্তরখানা। কোকিলও পরের অন্নে প্রতিপালিত।

"তুমি নিজে কালো পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই 'কু' -

কমলাকান্তের মতে কোকিল বিশ্বনিন্দুক সে যখনই দেখে গন্ধরাজ ফুল সারিবদ্ধ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে আপনাদের গন্ধে নিজেরাই আত্মহারা অথবা "বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জল পত্ররাশির শোভা' অথবা নবমল্লিকার সদ্য শিশিরসিক্ত প্রস্ফুটিত মুখ তখনই সে কু উ ডাক ডাকবে।

"যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে আমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও 'কু - উ' কেন না তুমি সৌন্দর্যশূন্য, পরান্ন প্রতিপালিত।"

যখনই সে গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গনের দাড়িম্বগাছের শাখায় বলে দেখবে -

"সেই গৃহপুষ্পরূপিনী কন্যাগনে সেই লতার দোলানী, সেই গন্ধরাজ প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছাস, সেই মল্লিকার অমলতা একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম স্বরে গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া সবাইকে ডাকিয়া বলিও এতরূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা - এ 'কু-উ:: !' ঐটি তোমার জিত - ঐ পঞ্চম স্বর। নহিলে তোমার ও কু - উ কেহ শুনিত না।"

ইংলন্ডের দুই মন্ত্রী তথা পার্লামেন্টের সদস্য যাঁরা তাঁদের বক্তৃতার জন্য বিশ্ববিখ্যাত তাঁদের সঙ্গে কোকিলের তুলনা করেছেন -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

"এ পৃথিবীতে গ্লাডস্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায় তুই কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে নহিলা অত কালোচলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়াচাঁচা ভাল গলাবাজিতে এত গান না থাকিলে যিনি বাজে নবেল লিখেছিলেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন ? আর জন স্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেন্টে স্থান পাইলেন না কেন?"

বস্তুতপক্ষে জনস্টুয়াট মিল যাঁকে যৌবনে নিজের গুরু মেনেছিলেন বঙ্কিম তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্থান পেলেও নারী অধিকারের দাবী সংক্রান্ত যে অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে চেয়েছিলেন তা করতে পারেননি এবং পরবর্তী নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। অথচ নারীর স্বাধীকার বিষয়ক তাঁর দাবীগুলো ছিল যুগান্তকারী তাই কমলাকান্তের কণ্ঠে বঙ্কিম বলেন -

> "তবে কোকিল তুমি মহা পার্লিয়ামেন্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীল চন্দ্রাতপ মন্ডিত গিরিনদী নগর কুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভাগৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম স্বরে কু - উ বলিয়া দাক সিংহাসন হইতে হস্টিংস পর্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। 'কু - উ' ! ভাল তাই ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কুমানিক ,সু বলিলে সু মানিক, কু বৈ কি ? সব কু লতীয় কন্টক আছে, কুসুমে কীট আছে, গন্ধে বিষ আছে, পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রী জাতি বঞ্চনা জানে।"

কমলাকান্ত বোঝে গলাবাজি মানে শুধু চেঁচানো নয়।

> "যদি শব্দ মন্ত্রে সংসাচর করা হয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে।"

ঠিক যেভাবে সর জেমস ম্যাকিস্টস এর বকৃতার কড়ি মধ্যম ফিলজফির তান, মেকলের রিটরিকের পঞ্চম;

> "ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন -

কবিকঞ্চনের ঋষভস্বর কে শুনে ? কমলাকান্ত বুঝতে পারে না কেন স্বচর পঞ্চম কোন স্বর সপ্তম - কে মধ্যম কে গাঁন্ধার।

> "যদি কেহ শাখোয়াজ তানপুরা দাড়ি দাঁত লইয়া আমাকে সপ্তসুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জন শুনিয়া মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যপ্রসূতা বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে - তাহার পিতাবিশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যাস্ত হয় - সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞতা হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশির্ব্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।"

বোঝা যাচ্ছে নসীরাম বাবুর গৃহকুঞ্জ, গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গন, ইংলন্ডের পার্লামেন্ট সমাজবাস্তবতা থেকে কমলাকান্ত এক অন্যতর বাস্তবে চলে যাচ্ছে, তার সুর পাল্টে

টিপ্পনী

যাচ্ছে -

"এখন আয় পাখী ! তোতে আমতে একরাব পঞ্চম গাই। তুইও যে আমিও সে সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তাই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দ গাহিয়া বেড়াস - আমিও এই সংসার কাননে, গৃহে গৃহে আপনার আনন্দ এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই - আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই - আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা - ঐ গলা; আমার পুজিপাটা - এই আফিমের ডেলা।"

কমালকান্ত এবার যেন বুঝতে পারে সে ও ওই কোকিল দুজনেই সুন্দরের উপাসক, দুজনেই 'ভাল' কে ডাক দিয়ে যায়।

ড. শশীভূষন দাশগুপ্ত এই প্রবন্ধটির শেষাংশ সম্পর্কে বলেছেন -

"বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে একটি লিরিকধর্মী কবিচিত্র ছিল। তাহার পরিচয় যেমন ছড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার উপন্যাসগুলির আঁট বাঁধুনির খাঁচে খাঁচে, তেমনি রহিয়াছে কমলাকান্তের দপ্তরের ভিতরে। যে বসন্তের কোকিলকে লইয়া তিনি বারুণীর ঘাটে বকুলতলায় একদিন গদ্য ভাষার অপূর্ব কবিতা লিখিয়াছিলেন; সেই বসন্তের কোকিলকে উপলক্ষ্য করিয়া দপ্তরের সপ্তম সংখ্যায় লিখিয়াছেন - 'তুই এ সংসারে পঞ্চমস্বর ভালোবাসিস আমিও তাই, তুই পঞ্চমস্বরে কাকে ডাকিস ? আমিই বা কারে? .... অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্র দিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি।"

কমলাকান্তের আক্ষেপ কণ্ঠ নাই বলে তার আর মনের কথা বলা হল না -

"কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল দেখি রে ! কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে বলা হইল না - যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই অমানুষ ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি।"

পতঙ্গ :

উনিশ শতকে কমলাকান্ত চক্রবর্তী তার আশ্রয়দাতা ননীরামবাবুর বৈঠকখানায় বসযে দলাদলিচর গল্প শুনতে শুনতে আফিম এর মাত্রা একটু বেশী করে ফেলে আর

টিপ্পনী

তখনই দেখতে পেল যে -

> "একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারিপাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 'চোঁ -ও -ও - ও' 'চোঁ - ও - ও' করিয়া শব্দ করিতেছে, আফিমের জোঁকে মনে করিলাম পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না ? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, 'তুমি কি চোঁ চোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিমেদর প্রাসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম - শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, 'আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি - তুমি চুপ কর' আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে - দেখ আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে - পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপ শোভা পাইত আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই - প্রবেশ করবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।"

পতঙ্গ ইতিপূর্বে তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠে আলোয় পুড়ে মরেছে, পুড়ে মরাই তার জন্ম গত অধিআকার, সহমরণ নিষেধের আইনে যেমন হিন্দু বিধবরা পুড়ে মরা আটকেছে কাচ দিয়ে মুড়ে থাকা আলো ঠিক সেভাবেই পতঙ্গের পুড়ে মরার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। যদিও হিন্দু মেয়ের পুড়ে মরার সঙ্গে তাদের পুড়ে মরার একটা তফাৎ আছে -

> "হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দু মেয়েরা আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না - আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে । আমরাই কেবল সকল সময় আত্মবিসর্জন ইচ্ছুক।"

পতঙ্গ জানায় যে স্ত্রী জাতি রূপের শিখা দেখলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বটে -

> "আমরা ও পুড়িয়া মরি, তহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ সেই দাহতেই তাদের সুখ - আমাদের কি সুখ ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি।

বনির জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালতে পারলে -

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

টিপ্পনী

'কেন এ শরীর ? লইয়া কি করিব ? নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি - তাহাতে কি সুখ ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা।

আগুনে পুড়ে মৃত্যুতে পতঙ্গের সুখ। সে বহ্নির স্বরূপও জানতে চায় না -

> "তুমি কি ? তা আমি জানি না আমি জানি না কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু আমার জাগ্রতের ধ্যান নিদ্রার স্বপ্ন জীবনের আশা মরণের আশ্রয়।"

পতঙ্গ জানতে চায় না - "কাম্য বস্তুর স্বরূপ"

বহ্নিতে আত্ম বিসর্জন দিতে পতঙ্গের মরনপণ সংগ্রাম শুরু হয় -

> "তোমাকে কি পাইব না ? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে ? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না ? ভাল থাক আমি ছাড়িব না - আবার আসিতেছে -বোঁ - ও - ও পতঙ্গ পড়িয়া গেল।"

আর আফিম এর নেশায় ঘোরে কমলাকান্তর মনে হল নসীরামবাবু - 'একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া তামাকু টানিতেছে।"

সংস্কৃত মহাকাব্য 'কুমার সম্ভবম' - এ মহাকবি কালিদাস শিবের প্রতি শরক্ষেপনে উদ্যত কন্দপর্বে বলেছিলেন "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু" । শুধু কন্দর্প নয় সমস্ত মনুষ্য সমাজই যেন বহ্নি অভিমুখে ধেয়ে চলেছে পুড়ে মরতে।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস ও বহ্নিকে জগতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করতেন বহ্নিতে পরিপূর্ণ আত্মাকেই তিনি পবিত্রম বলে মনে করতেন আর কমলাকান্ত মনে হয়েছে -

> "মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গ সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে সকলেই সেই বহ্নিত পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

একদিক থেকে থেকে বিচার করলে একে বলা যেতে পারে সুখের সন্ধানে বাহ্য সম্পদের আগুণে পুড়ে মরা - ঠিক যেমনটা হয়েছে আমার মন প্রবন্ধে। শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাওয়ার যে মত প্রচলিত আছে তার প্রেক্ষিতেই সম্ভবত কমলাকান্ত "ধর্ম বহ্নি' তে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কথা বলেছেন -

> "যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে

পাইত তবে কয় জন বাঁচিত।"

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস অথবা মধ্যযুগের ইতালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও গেলিলির সুগভীর জ্ঞান, যুগান্তকারী ভাবনাচিন্তার জন্ম দিয়েছিল তাঁদের জনপ্রিয়তা কর্তৃপক্ষের চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে সক্রেটিসকে হেমলক পান করতে বাধ্য করা হয়েছিল আর গ্যালিলিও গেলিলির শাস্তি হয়েছিল কাব্যরসে। কমলাকান্ত এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছে -

"অনেক জ্ঞান বহ্নির আবরণ কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়। সক্রেটিস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল।"

বাহ্য সম্পদের আগুণে পুড়ে মরার মতই -

"রূপ - বহ্নি, ধন বহ্নি, মান বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে, - আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি।"

এই পতঙ্গ বহনিতেই বিষবৃক্ষ এর সূর্যমুখীকে বিষপান করে মরতে হয়েছিল 'ককৃষ্ণকান্তের উইল' -এ রোহিনী মরেছিল গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে কমলাকান্ত বলে -

"এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিল হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন - জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল।"

গভীর দার্শনিক উপলব্ধিতে উজ্জ্বল কমলাকান্তর এই ভাবনা। আবার একটি গভীর গম্ভীর বিষয়কে কিভাবে সহজ সরল কৌতুকময় করে তুলতে হয় তাও দেখিয়ে দেয় কমলাকান্ত। বিশ্বাসসাহিত্যের অতুল সম্পদগুলো পতঙ্গ বহ্নির আলোতে নতুন করে বিশ্লেষিত হয়। ইংরেজ কাব্য মিলটনের সপ্তদশ শতকের মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপীয়রের অ্যান্টনী ও ক্লিপেত্রা', 'রোমিও ও জুলিয়েট', ওথেলা' কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম' বাল্মীকি রামায়ন সীতা এবং ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' এরা সকলেই এমনকি সন্ত পল ও যে পঙ্গবৎ বহ্নি মুখে ধাবিত তা বিশ্লেষণ করেছে কমলাকান্ত -

"ধর্ম্ম - বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল। ভোগ বহ্নির পতঙ্গ, অ্যান্টনি ক্লিওপেত্রা।" রূপ বহনির 'রোমিও ও জুলিয়েত' ঈর্ষা -বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয় বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়নের সৃষ্টি।"

বহ্নি কি আমরা তা জানি না। রূপ তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি এ সকল কথা আপাততভাবে কোন অর্থ বহন করে না। এখানে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মপুস্তক, কাব্যগ্রন্থ সকলেই হার মানে - একথা উপলব্ধি করে কমলাকান্ত বলে -

"ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, স্নেহ কি ? তাহা কি, কিছু জানি না তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি ?"

সব শেষে কমলাকান্ত আবার কৌতুকময় ভঙ্গীতে পরামর্শ দিয়েছে -

"দেখ তাই পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই, পার, আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মর, না পার চল 'বোঁ' করিয়া চলিয়া যাই।"

এভাবেই কমলাকান্ত পতঙ্গ বহ্নির প্রতীককে চিরায়িত রূপ দিয়েছেন।

মনুষ্যফল :

'পতঙ্গ'র মত 'মনুষ্যফল' ও অধিক মাত্রায় আফিম সেবনের ফল -

"আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফলবিশেষ আয়াবৃন্ত সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে।"

সবগুলো যে পাকতে পারে তা নয়, কোনটা অকালে ঝরে পড়ে, কোনটা পোকায় খায়, কোনতাচতে পাখি ঠোকরায়, কোনটা শুকিয়ে ঝরেপড়ে।

"কোনটা সবাক্ক হইয়া আহুয়িত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া কেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে - তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক।"

আবার কোনটা বা সুপক্ক হয়ে মাটিতেই ঝরে পড়ে থাকে। একসময় তা শেয়ালের খাদ্য হয়।

"তাহাদিগের মনুষজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা।"

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্তর মন্তব্য স্মরনীয়। তিনি বলেছেন -

"কমলাকান্তের সমালোচনায় প্রথম ও প্রধান গুণ এই যে, সে শুধু সামাজিকো পার্থক্য অস্বীকার করিয়াছে তাহা নহে, মানুষ যে পশুপক্ষী

- কীটপতঙ্গ ও ফুল হইতে আপনাকে পৃথক মনে করিয়া প্রচুর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছে তাআর ও ভিত্তিহীনতা সে প্রমাণ করিয়াছে। বিষ্ণুশর্মা ও ঈশপ পশুজীব হইতে অনেক নীতিকথা সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু সেই নীতিশাস্ত্র বিশেষভাবে মানুষেরই রচিত। পশুজীবনেও তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে এই পর্যন্ত। এই বিচারে পশু সিঁড়ির কয়েক ধাপ অতিক্রম করিয়া মানুষের সঙ্গে এবং শ্রেণীতে উপনীত হইয়াছে। কমলাকান্ত জাগতিক নীতিশাস্ত্র উল্টাইয়া নূতন প্রথায় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুইফট এর অন্তদৃষ্টি বিষ্ণুশর্মার কল্পনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ; এখানে মানুষ নীচে নামিয়া পশুপক্ষী ফুলফলের সঙ্গে একত্র হইয়াছে। কমললাকান্ত শুধু মোটামুটি ভাবে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই বিরত হন নাই, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া মানবের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারে আঘাত করিয়াছে।

তাই মনুষ্যফলে কমলাকান্ত মনুষে ফলত্ব আরোপ করে বলে -

"কতকগুলি মাকালে জাতীয় কেবল দেখিতে সুন্দর কখন কখন ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক জাতীয় ফল।"

এরপরে একে একে কমলাকান্ত এদেশের বড় মানুষদের কাঁঠাল, সিবিল সার্ভিসের সাহেবদেদর আম্রফল, রমনীমন্ডলীকে নারিকেল দেশ হিতৈষীদের শিমূলফূল, অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের ধুতুরাফল, লেখকদের তেঁতুল আর ব্রাহ্মণদের ধুতুরা ফল, লেখকদের তেঁতুল আর দেশী হাকিমদের কুষ্মান্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন।"

"আমাদের দেশের এক্ষণকার বড় মানুষদিগের মনুষ্যজাতির মধ্যে কাঁঠাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁঠাল কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুই কেবল ইঁচোড়েই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না। পৃথিবীর রাক্ষস - রাক্ষসীর ইঁচোড়েই পড়িয়া দাল না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে।"

এভাবে কখন মনুষ্য সমাজের রাক্ষসী ককনও মাঝিদের কথা বলেছে কমলাকান্ত, শৃগালের দৌরাত্য এড়িয়ে যদি গৃহস্থের ঘরে কাঁঠাল গেল তো যদি আসবে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একটু রসের প্রত্যাশায়। এক্ষেত্রে কমলাকান্ত মাছির মধ্যে মনুষ্যত্ব আরোপ করেছেন -

> "মাছিরা কাঁঠাল চায় না তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও - সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ পত্র করিয়াছে, উহাকে একটু রস দাও।"

যারা বড় মানুষদের কাছে সাহায্য লাভের প্রত্যাশী, সেইসব কন্যাদায় মাতৃকায় গ্রন্থ অথবা পুস্তক রচয়িতা সংবদপত্রের প্রকাশককে কমলাকান্ত কাঁঠালের রস খেতে আসা মাছির সঙ্গে তুলনা করেছে। কাঁঠাল বেশিদিন রাখা যায় না পচে যায়। তার কমলাকান্তের পরামর্শ -

> "আমার বিবেচনায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহমনকে ভোজন করনই ভাল।"

দেশের 'সিবিল সার্ব্বিসের সাহেব'দের কমলাকান্ত "মনুষ্যজাতির মধ্যে আশ্রফল" বলে মনে করে।

> "এদেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এদেশে আনিয়াছেন ..... সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পড়িয়া এফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম জলে ঠান্ডা করিয়া যদি জোটে তবে সে জল একটু খোসামোদ বরফ দিও বড় শীতল হইবে।"

বোঝা যাচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের খোসামোদ করা এবং সেলামী দেওয়াকে নিজে একজন 'সিবিল সার্ব্বিসের' কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও ও বঙ্কিম কিভাবে কমলাকান্তকে দিয়ে কৌতুকের ঘায়ে আহত করেছেন।

> "কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, বানরের প্রিয়। কামিনী গণের এগুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। .... আমি বলি রমনী মন্ডলী এসংসারে নারিকেল। বৃক্ষের নারিকেলের সঙ্গে সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকচিবেলা উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর।"

কমলাকান্তের মতে নারিকেলের জলে প্রাণ স্নিগ্ধ হয় আর - "কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস লক্ষণ শূন্য প্রনয়ে হৃদয়ে স্নিগ্ধ হয়।"

সে আরও বলেছে "গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতি, আমার চক্ষে একই দেখায় - উভয়ই চতুর্দ্দিক আলো করিয়া থাকে।"

নারকেলের জল, শস্য, মালা আর ছোবড়ার সঙ্গে কমলাকান্ত স্ত্রীলোকের স্নেহ, বুদ্ধি, বিদ্যা এবং রুপের তুলনা করেছে।

> "নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি, উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া আপাইতে হাঁপাইতে গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর। তখন এই শীতল জল পান করিও - সকল যন্ত্রণা ভুলিবে।"

আর নারকেলের শস্য হল স্ত্রীলেকের বুদ্ধি -

> "ঝুনোর ওবেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য তখন ইহাকে গৃহিনীপনা বলে।"

কমলাকান্তের আক্ষেপ -

> "বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিককেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইয়ের এককে আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য কল আকর্ষী দিয়া পড়া যায়। কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলও হয় নিজে পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।"

ভীষ্মদেব মন্তব্য করেছেন যে কমলাকান্ত পুরোহিতকে ডোম বলেছে - অর্থাৎ ঘটক পুরোহিত হল ডোম। কমলাকান্ত ডোমের খোসামোদে ও রাজী কিন্তু -

> "আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি যেমন মানুষ তেমনি গাছে তেমনি রূপগণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। কিন্তু ভয় নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, রামী, কামিনী আছে যে কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে এদীন অসমর্থ।

দেশহিতৈষীগণকে কমলাকান্তের মনে হয় শিমূল ফুল।

> "যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। ফল ফেটে খানিকতা তুলো বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ে।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরাফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে। বড় বড় বচনে তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কন্টকময় ধুতুরা।"

ধুতুরা মাদকতা বৃদ্ধি করে। কমলাকান্তের মতে সেই কারণেই -

"বঙ্গীয় লেখকরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগেদর নিকট হইতে দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়াছেন। প্রবন্ধ গাঁজার মধ্যে সেই বচন ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জানাইয়া তুলে।"

দেশজ লেখকদের কমলাকান্তের মনে হয়েছে তেঁতুল।

"নিজের সম্পত্তি খোলা আর ওসিটে। কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ....."

"দেশী হাকিম" দের কমলাকান্ত মনে করে কুষ্মান্ড।

তবে কুষ্মান্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে - দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া.....

এইভাবেই 'মনুষ্যফল' এ ব্যাঙ্গ কৌতুকের আবডালে ফলত্ব ও মনুষ্যত্বকে এক আসনে বসান হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের সমৃদ্ধি বঙ্গ সাহিত্যের কুরুচিস্বরূপ বভাখ্যা করেবে। প্রগতিশীল বঙ্কিমের লেখায় এখানে খুঁজে পাওয়া যায়।

অনুশীলনী ও প্রশ্নাবলী :

১. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটি কোন শ্রেণীর রচনা?

২. 'কমলাকান্তের দপ্তর' -এর গদ্যরীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩. 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটি অবলম্বনে হাস্যরসিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় দাও

৪. 'বিড়াল' রচনাটি অবলম্বনে সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় দাও।

৫. 'কমলাকান্তের দপ্তর' চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের যে পরিচয় প্রদান করে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

৬. সমাজতাত্ত্বিক - রাজনৈতিক দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় 'কমলাকান্তের দপ্তর' অবলম্বনে তা আলোচনা করো।

৭. 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলাকান্তের পরিচয় প্রদান করো।

৮. 'কমলাকান্তের দপ্তর' - এর হাস্যরস সম্পর্কে আলোচনা করো।

৯. 'বসন্তের কোকিল' রচনাটির মর্মার্থ আলোচনা করে সমাজতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় দাও।

১০. ‘মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি ব্‌নি আছে’ - উক্তিটি অবলম্বনে ‘পতঙ্গ’ গদ্যটি সম্পর্কে আলোচনা করো।

১১. ‘মনুষ্যফল’ রচনাটিতে কমলাকান্ত মানুষে ফলত্ব আরোপ করেছেন - এই মন্তব্যটির আলোকে গদ্যটির মর্মার্থের পরিচয় দাও।

১২. জীবনের উদ্দেশ্য কী - ‘আমার মন’ গদ্যটি অবলম্বনে।

১৩. ‘আমার মন’ গদ্য অবলম্বনে জীবনের উদ্দেশ্য কী তা কমলাকান্ত অনুসরণে ব্যক্ত করো।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তৃতীয় একক :: ছিন্নপত্র - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থ পরিচয় :

টিপ্পনী

'জমিদারী পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাঁর নিকটতম পরিচয়। পতিসর, শিলাইদহ কিংবা সাজাদপুরের ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলি - লাগাম ছাঁড়া ঘোড়ার মতো ফেনোচ্ছাসিত পদ্মা আর সন্ধ্যাতারা সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশাল চর এরাই রবীন্দ্রনাথকে বহু বঞ্চিত একটি আশ্রয় এনে দিয়েছিল। দিয়েছিল নিজের অনিশ্চিত মনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেমন একদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবন সাধনার একটি সম্পূর্ণ তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন, অন্যদিকে দেশের একটি বাস্তব রূপের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছে। মানিক প্রেমের সীমা - সংকীর্ণতাকে অবন্তরূপ আর প্রেমের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তিনি , বেদের টোল, গ্রাম্য পোস্ট মাস্টার, নববধূর শ্বশুরবাড়ি যাত্রা কিংবা মাস্তুল টেলার খেলায় শিশু মনের অভিব্যক্তিতে 'ছোট সুখ, ছোট দুঃখ' কল্লোলিত একটা বাংলা দেশের পরিচয় নিচ্ছেন তিনি আবার বিক্ষুব্ধ পীড়িত চিন্তা - চেষ্টাগুলোর হাত থেকে প্রকৃতির কাছে এইভাবে তাঁর অপূর্ব আত্মসমর্পন ঘটেছে -

> "একলা বসে সে অসীম যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি আর সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে। একদল আছে তারা ছটফট্ করে 'জগতের সকল কথা জানতে পারছিল কেন', আর একদল ছটফটিয়ে মরে মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পারছিনে কেন' - মনের থেকে জগতের কথাটা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে।"

এইজগতের কথা অন্তরের কথা আর মানুষের কথাকে আবিষ্কার করার বাসন ছিন্নপত্রের ছত্রে ছত্রে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

এইভাবেই সাহিত্য ও সাহিত্যিক' গ্রন্থে নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় 'ছিন্নপত্র' সম্পর্কে তাঁর অমূল্য মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ এই দশবছর ধরে লেখা হয়েছে 'ছিন্নপত্র' এর চিঠিগুলো। ১৫৩ টি চিঠির মধ্যে প্রথম ৮ টি বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মুজমদারকে লেখা এবং বাকিগুলো ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা। সংযোজন অংশে রয়েছে তিনটি চিঠি। প্রথম চিঠি ৭ই অক্টোবর

টিপ্পনী

১৮৯৪ সালে কলকাতা থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন -

"আমি জানি তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই ইচ্ছা করলেও তাদের এ সমস্ত দিতে পারিনে সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার একথা কখনো মনে হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করিবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুচরিত কাব্যকথা বলে মনে করবি । সেইজন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেইরকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি।"

১১ই মার্চ ১৮৯৫ শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন -

"আমার অনেক সময় ইচ্ছে করে, তোকে যে সমস্ত চিঠি লেখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে আমার চোখ পড়লেই আবার সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে এর মধ্যে যা কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত যেটা তেমন বহুমূল্যে নয়; কিন্তু যেটাকে আমি বাইরে ওর থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক একটা দূর্লভ সৌন্দর্য দুরমূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, সেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন - ত হয়তো আমি ছাড়া আর কেই দেখেনি,যা কেবল আমার সেই চিঠির পোআতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই - তর মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস - আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগুলো একটা খাতায় টুকে নেব - কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তা হলে এক সময় নিশ্চই বুড়ো হয়ে যাব - তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সমাগ্রী হয়ে থাকবে।"

রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য এই কাজটি আর নিজের হাতে করতে হব নি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী সেই ছোট বয়সেই চিঠিগুলোকে দুটি খাতার পাতায় লিখে রেখেছিলন এবং সেটা সময়ে তুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে -

> "এই চিঠিগুলির উপলক্ষ হওয়া চাড়া আমার এই সামান্য কৃতিত্বটুকু আছে যে সেই অল্প বয়সেই তার মর্যাদা বুঝে তার সাহিত্যিক অংশগুলিপারিবারিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি খাতায় তারিখ সমেত লিখে রেখেছিলুম, পরে সেই খাতা তাঁকেই দিয়েছিলুম। সেই খাতা থেকেই ছিন্নপত্র বইখানি ছালানো হয়।"

'রবীন্দ্র স্মৃতি' তে একথা জানিয়ছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

১৯১২ সাল অর্থাৎ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে পত্রসংখ্যা ছিল ১৫১ টি তার কারণ হল ঐ সময় পত্র সংখ্যা ১৩২ ও ১৩৩ সংযুক্ত অবস্থায় একটি চিঠি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল; একইভাবে ১৪৬ ও ১৪৭ সংখ্যক ছোট চিঠি দুটি ও সংযুক্ত অবস্থায় ছিল।

'ছিন্নপত্র' এ ইন্দিরাদেবীকে লেখা অনেক চিঠিই গ্রন্থভুক্ত হয়নি অনেক চিঠির অংশবিশেষ বর্জিত হয়েছে। মূল দুটি খাতা অবলম্বনে এই বর্জিত চিঠির সম্পূর্ণাংশে বা আংশিক বর্জিত চিঠিগুলো নিয়ে ১৯৬০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'ছিন্নপত্রাবলী' 'ছিন্নপত্র' এর গ্রন্থ পরিচয় - এ লেখা আছে।

> "ছিন্নপত্র সংকলন কালে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যক্তিগত পত্রগুলির সম্পাদনা ব্যাপারে সম্ভবত সুহৃৎ রামেন্দ্র ত্রিবেদীর সাহায্য লইয়া থাকিবেন। সেই সময়ে ছিন্নপত্রের সংখ্যক পত্রে যে লেখা হইয়াছে তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিত কোথা থেকে এবক প্রথম জীবননোচ্ছাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম -"

ঐ ৬৭ সংখ্যক পত্রের প্রকাশ যোগ্য তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্র এর সংযোজনের তৃতীয় চিঠিতে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন এইভাবে -

> "আমার পুরাতন চিঠিপত্রের এক জায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্র স্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি সম্পাদকের কুঠার লইয়া আমার এই গাছের স্মৃতির গোড়ায় কোপমারিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এ তো অনাবশ্যক ডালপালা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ছাঁটিয়া দেওয়া নয়, এ যে প্রানে আঘাত করা কেননা এ আমার প্রানের কথা। আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানু হইয়াছি বলিয়াই একথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন, সমস্ত জড়জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছ, বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে -"

'ছিন্নপত্র রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয়বন্ধু জুটেছিল সেকথা তিনি তাঁর পতিসর থেকে লেখা ২২ শে মার্চের ১০০ সংখ্যক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন -

"আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে - আমি লোকেদের ওখান থেকে তার একখানা Aniles Journal ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টে পাল্টে দেখি; ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলছি; এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।"

অরি ফ্রেডরিক অমিয়েল ছিল সুইস কবি দার্শনিক (১৮২১ - ১৮৮১) অ্যামিয়েলের জার্নাল তাঁর মৃত্যুর পচর প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা আছে -

"The reader will find in it, not a volume of Memories but the comfidenced of a solitary thiwher, the meditations of a philosopher for whom the things of the soul were the soverign a realities of existence."

উভয়েই পৃথিবীকে নারীরূপে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৮৯২ সালে শিলাইদহ থেকে লেখা চিঠিতে -

"বহুযুগ পূর্বে যখন তরুনী পৃথিবী সমুদ্রস্থান থেকে সরে মাথা তুলে উঠে তখকার নবীন সূর্যকে বন্দনা ককরেছেন। আমি তখন এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছাসে গাছে হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।"

অ্যামিয়েল লিখেছিলেন -

"A morning of intoxicatiay beauty fresh as the fellings sixteen and crowned with flowers like a bride."

রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র এর এই ভাবনাই আবার পল্বিত হয়ে উঠেছে 'সোনার তরী'

র বসুন্ধরা কবিতায় যেখানে তিনি লিখেছেন -

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের .....,
কোনদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অণুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহনিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ ....."

কোথাও বা সাহিত্য রচনার প্রথম খসড়া কোথাও আবার উত্তর সৃষ্টিপর্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা - এভাবেই 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, গান প্রবন্ধের আধার হয়ে উঠেছে - হয়ে উঠেছে এক রবীন্দ্রজীবনীকোষ।

রবীন্দ্র সাহিত্যে ছিন্নপত্রের স্থান :

রবীন্দ্র সাহিত্যের মানচিত্রে শিলাইদহ সাজাদপুর পতিসর এক অনবদ্য স্থান লাভ করেছে একদিকে যেমন রচিত হয়েছে পত্র সাহিত্য 'ছিন্নপত্র' অন্যদিকে 'ছিন্নপত্র' এ প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'আনসী' (১৮৯০), 'সোনবার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) র কাব্যগুচ্ছ। 'হিতবাদী' সাধনার গল্পসম্ভার। অজস্র গান আর প্রবন্ধাবলী।

'মানসী'র ভৈরবী গান কবিতায় বিষাদমূর্তি তিনি রচনা করেছিলেন -

"ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি
বিষাদশান্ত শোভাতে।"

তার পটভূমি হিসেবে রয়ে গেছে পতিসর থেকে ৬ই মাঘ ১৮৯১ সালে লেখা 'ছিন্নপতর' এর ১৪ সংখ্যক চিঠি -

"পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন বিরল, অসীম সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর নীড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়েএকটা টান পড়ে।

মনে হয় যেন -

"মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপনা ছেলেপুলে এবং কোলাহল এবং

টিপ্পনী

ঘরকন্যার কাজ নিয়ে থাকে - যেখানে একটু ফাঁকা একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বীশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে। সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়।"

টিপ্পনী

'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতার দুবছর পরে লেখা 'ছিন্নপত্র'র ৫২ সংখ্যক চিঠি যেন একটি অপরটির পরিপূরক।

'সোনারতরী'র বৈষ্ণব কবিতা 'দুইপাখি', 'মানসসুন্দরী' সাজাদপুর শিলাইদহে লেখা। আবার 'অনাদৃত', 'দেউল' কবিতাদুটি উড়িষ্যায় লেখা। কোথা বা 'ছিন্নপত্র' এ কবিতার ব্যাখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনাগুলিকে প্রসারিত করেছেন কোথাও বা পত্রসাহিত্য হয়ে উঠেছে কাব্যসাহিত্যের প্রতিবিম্ব।

"রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুর ধারা
খর পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।"

'সোনার তরী'র ক্ষুরধরা ভরা নদী কিভাবে চাষীদের মধ্যে হাহাকার ফেলে দেয় তার প্রকাশ ঘটে ৮৮ সংখ্যকপত্রে

"আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছেন। চাষারা নৌকা বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকা যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি - যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়।

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'পূর্ণিমা' কবিতায় দেখানো হয়েছে কিভাবে সন্ধ্যাবেলায় বোটে বোসে বাতি জ্বালিয়ে একটি ইংরেজি সমালোচনার ক্লান্ত হয়ে বাতি নিবাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পালেন -

তন্দ্রাতুর চোখে বন্ধ বারি গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি দ্বিপ্রহর রাতি
চমকে ও আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি

যেমনি নিবিল আলো উচ্ছাসিত স্রোতে
মুক্ত স্বরে বাতায়নে চতুর্দিক হতে
চকিতে পড়িল ক্ষে ক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লবিনী মৌন দুসাহসি।"

কবিতার রচনাকাল ২রা ডিসেম্বর ১৮৯৫। স্থান শিলাইদহ আর ১২ ই ডিসেম্বর তিনি লেখেন -

"এদিকে রাত্রি নেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশ্যে একফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিলুম। দেবামাত্রই হঠাৎ চারিদিকে সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোতের মধ্যে জোৎস্না একেবারে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙে গেল। আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রুপ হাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল....."

হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন -

"অল্পবয়সে বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দের ধারা উদ্বারিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলঙ্কৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে।"

পোস্টমাস্টার, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'একরাত্রি', 'ছুটি', 'সমাপ্তি', নিশিথে, 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রমুখ অসংখ্য ছোটগল্পের বীজতলা এই 'ছিন্নপত্র'।

'পোস্ট মাস্টার' গল্পে রয়েছে -

"আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয় এই গন্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টার ও সেই দশা উপসথিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।"

'ছিন্নপত্র' এর ২১ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"এখনকার পোস্টমাস্টার এবং একদিন সন্ধের সময় এসে আমার সঙ্গে এইরকম ভাবের চিঠি যাতাযাত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয় আমাদের এই কুঠিবাড়ীর এক তলাতেই পোস্ট আপিস বেশ সুবিধে, চিঠি আসামাত্রই পাওয়া যায়। পোস্টমাস্টারের গল্প শুনিতে আমার বেশ লাগে।"

৫৯ সংখ্যক চিঠিতেও রয়েছে 'হিতবাদী' তে গল্পটি বের হলে "পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জা মিশ্রিত হসাস্য বিস্তার করেছিলেন।

১৯৯ সংখ্যক পত্রে তিনি লিখেছিলেন -

"আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের দুপুরবেলা। মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ষে পোস্টমাষ্টার গল্পটা লিখেছিলুম।"

৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সাজাদপুর থেকে লেখা এই চিঠিতেই তিনি উল্লেখ করেছেন -

"আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম; বড়ো ভালো লাগছিল। ছড়ার রাজ্যে আইন কানুন নেই মেঘ রাজ্যের মতো।"

প্রবন্ধটি 'ছেলেভুলানো ছড়া' যা 'সাধনা' র আশ্বিন কার্তিক ১৩০১ সংক্যায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন

"আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশিল, বিবিধ বর্নে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যাদৃচ্ছাভাসমান .... মেঘ বারি ধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু - হৃদয়কে উর্বরা করিয়া তুলিতেছে।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববীনারবে বিশ্বজন মোহিছে', 'কে দিল আবার আঘাত', 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে', 'এসো গো নূতন জীবন', 'পম্পবনে পুষ্প নাহি', 'আহা জাগি পোহালে বিভাবরী" - এই গানগুলো ১৮৯৫ সালের ৪ থেকে ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে শিলাইদহে বসে লিখেছিলেন - এর ৬ই আক্টোবর লিখলেন কুষ্ঠিয়া থেকে একটি পত্র -

"আমার দিনগুলিকে রথীর কাগজের নৌকোর মত এবং একটি করে

ভাসিয়ে দিচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে এবং আধটি গান তৈরি করছি এবং শরৎকালের প্রহরগুলিরমধ্যে কুন্ডলায়িত হয়ে পড়ে আছি । এই অপর্যাপ্ত জ্যোতির্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে অবনত হয়ে পড়েছে আলোক রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে।সর্বব্যাপী স্তব্ধতা আমার রক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে, একটি সাধারণ শান্তি আমার ললাটের উপর চুম্বন করছে।"

'ছিন্নপত্র' এভাবেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, গানকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা। সৃষ্টিশীলতার এক প্রবল প্রবাহ এসে বন্যাস্রোতের মত প্লাবিত করেছিল রবীন্দ্র সাহিত্যের দুকূল, 'ছিন্নপত্র' সেই মহাপ্লাবনকেই প্রসারিত করেছে গান, কবিতায়, প্রবন্ধে, ছোটগল্পে, দর্শনে। 'ছিন্নপত্র' এ তিনি লিখেছেন (১৫০ সংখ্যক পত্র) -

"ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভুত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ীর শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চায়, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই - আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।:"

'ধর্ম' বা শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধগ্রন্থে এই ভাবেরই বিকাশ ঘটেছে - 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্র সৃষ্টিশীলতার এমন একটি আধার যা শুধু ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ নয়, ১৯৪১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্যকে পুষ্প পত্রে পল্লবিত করেছে।

পত্রসাহিত্য হিসেবে ছিন্নপত্র :

চিঠি ব্যক্তের আয়না। জীবনের গভীর গোপন ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রতিধ্বনিত হয় কাছের মানুষকে লেখা চিঠিতে। 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাধারণ সাহিত্য ও পত্রসাহিত্যের তুলনা করে বলেছেন -

"পৃথিবী আপনাকে প্রকাশ করে দু - রকমের চলণ দিয়ে একটা চলন তার নিজেকে ঘিরে ঘিরে আর একটা চলন বড়ো যাত্রাপথে - সূর্যের চারিদিকে। পৃথিবীর বর্ষচক্রমন্ডলে দেখা দেয় ঋতুপর্যায়, নানা জাতের ফল ফসলের ডালি ভরা ওঠে সর্বজনের পন্য শালায়, আর তার দিন যাত্রায় দেখা যায় জলে স্থলে আলো ছায়ার ইসারা, আকাশে আকাশে প্রকৃতির মেজাজ বদল, সকলে সন্ধ্যায় দিক সীমানায় রঙের খেয়াল, ঘুম জাগরণের আনাগোনার পথে নানা কণ্ঠের কলকাকলি।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পৃথিবীর এই দুই প্রদক্ষিনের সঙ্গে তুলনা করা চলে সর্বজনের দরবারে সাধারণ সাহিত্যের আর অন্তরঙ্গ মহলে চিঠির সাহিত্যের গতিবিধির। সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র চলায় দূরদেশ দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্য ধরা হয় লেখকের কাছ ঘেঁসা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি - প্রতিধ্বনি তার ক্ষণিক হওয়ার মর্জি; আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদাপ্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।"

'ছিন্নপত্র' ভানুসিংয়ের পত্রাবলি, 'পথে ও পথের প্রান্তে' ১৩৪৫ সালে এই ৩ টি পত্রধারা শিরোনামে চেহ্নিত হয়। 'পত্রধারা একটা ভূমিকা রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ আর ঐ ভূমিকাতেই রিণহদ্রনাথ 'ছিন্নপত্র' সম্পর্কে লিখেছেন -

> "ছিন্নপত্র পর্যায়ে যে চিঠির টুকরোগুলি ছাপানো হয়েছে তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীত, আমার পথচলা মনে সেই সকল গ্রাম্যদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল; তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত কোথাও কৌতুক কৌতুহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ যায় খুলে। যে কুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেঁকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তাদের স্বাদের বদল হয়। চারিদিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই। লাউড স্পীকার চড়িয়া তাকে ব্রডকাস্ট করা যায় না। ভিড়ের আড়ালে চেনা লোকের মোকাবিলাতেই তার সহজরূপ রক্ষা হতে পারে।"

'য়ুরোপ - প্রবাসীর পত্র' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটে ইংরেজি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর আসে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' প্রথম খন্ড এবং ১৩০০ বঙ্গাব্দে য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি ২য় খন্ড। এর সমকালেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ছিন্নপত্র'। 'গ্রন্থ পরিচয়' থেকে জানা যায় -

> "১৮৮৭ - ১৮৯৫ সাল রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতি ইন্দিরাদেবীকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছেন ছিন্নপত্র গ্রন্থখানি প্রধানত তাহারই সংকলন, কেবল প্রথম আটখানি চিঠি শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। এই সময়ে লিখিত

যাবতীয় চিঠি ইন্দিরা দেবী দুটি খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। এই কাতা দুটি অবলম্বনে ১৩১১ সালে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়।

অবশ বহু চিঠিই রবীন্দ্রনাথ তখন গ্রন্থভুক্ত করেন নাই ; অনেক চিঠির কোন কোনো অংশ সাধারণের সমাদর যোগ্য নহে মনে করিয়া বর্জন ও করেন। বর্জিত অনেকগুলি পত্র ও পত্রাংশ মূলখাতা দুইখানি অবলম্বনে ১৯৬০ অক্টোবরে ছিন্নপত্রাবলী নামে যে যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় তাহাতেও পাওয়া যাবে।"

পরবর্তী কালের রবীন্দ্ররচিত পত্রসাহিত্যগুলো হল - 'ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৩২৪ - ১৩৩০) পর্যন্ত শ্রীমতি রানু দেবীকে লেখাপত্র যা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক পত্র সঙ্কলন 'জাপানীযাত্রী' (১৩২৬ / ১৯৯১), 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি (১৩৩১- ৩২), 'জাভাযাত্রীর পত্র' (১৩৩৪ - ৩৫), জাপানে পারস্যে (১৩৪৩); নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত 'পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮) এছাড়া রয়েছে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ১৬ টি খন্ডে বিভক্ত 'চিঠিপত্র' এর সঙ্কলন যেখানে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, পোত্রী, মেজদা, নতুনদা, মেজবৌদি ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে লিখিত পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

"ছিন্নপত্র'রবীন্দ্র পত্রসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে । শিলাইদহ - সাজাদপুর- পাতিসর এ লেখা রবীন্দ্র সৃজনী সাহিত্যের আঘর হল এই 'ছিন্নপত্র' অসংখ্য কবিতা, গান, ওছোটগল্প রচনার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় এই গ্রন্ধে। রবীন্দ্র জীবনেরই এক অসামন্য উপার্জন এই 'ছিন্নপত্র'। ছিন্নপত্র' রচনা কালে ;হিতবাদী' তে প্রকাশিত ৩৬ টি অমূল্য গল্প, 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ' গোড়ায় গলদ', 'পঞ্চভূত' এবং সর্বোপরি 'সোনার তরী' এই সময়েই রচিত হয়েছিল।

'ছিন্নপ ত্র' এর ৫৯ নং চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অফিস ছিল এবং আমি এঁকে (পোস্টমাস্টারকে) প্রতিদিন দেখতে পেতুম। তখনই আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাষ্টারকে গল্পটা লিখেছিলুম এবং সেই গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন যাই হোক, এই লোকটাকে আমার বেশ লাগে। বেশ

টিপ্পনী

নানারকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।" (সাজাদপুরে লেখা, ২৯ শে জুন ১৮৯২)

'ছিন্নপত্র' এর ৯২ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

"আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সুখ-সম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে - এদিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয়নি। ওদিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে। অনতিদূরে আশ্বিন কার্তিকের যুগল 'সাধনা' রিক্ত হস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। (সাজাদপুরে এই চিঠি লেখা হয়েছে ৩০ শে আষাড় ১৮৯৩)

'ছিন্নপত্র' ১৪১ নং চিঠিটিতে তিনি লিখেছেন -

"পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহর আছে, তার মধ্যে সামান্য /চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি তার সঙ্গে কথা বার্তা কয়ে যতটা লাভ করি চিঠিপত্রদ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশী কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরো একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ওয়েরকাম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না, আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করতে পারে না। এই কারনে চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে।"

ঠিক এইভাবে 'ছিন্নপত্র এর প্রতিটা পত্র পত্রসাহিত্য হিসেবে তার স্থান উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখর চূড়ায় নিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ, জাভা, জাপান, পারস্য, রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর বিভন্ন স্থান থেকে অসংখ্য পত্ররচনা করেছেন কিন্তু শিলাইদহ - সাজাদপুর পরিসর থেকে লেখা চিঠিগুলোতে প্রকৃতি, মানুষ ও সাহিত্য যেভাবে একসূত্রে বাঁধা পড়েছে তা তুলনারহিত। শিলাইদহ থেকে ২ রা আষাড় বুধবার যখন তিনি লেখেন -

"কালে আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত

আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। .... হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। আমার জীবনে ও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ জোড়া সৌন্দর্য নিয়ে উদয় হয় সেই প্রাচীন উজ্জয়িঙ্গর প্রাচীন কবির, সেই বহু বহু কালের সুখ দুঃখ বিরহমিলন ময় নরনারীদের আষাড়স্য প্রথমদিবস। সেই পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে -"

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপ এই নিবিড় অনুভূতি 'ছিন্নপত্র' কে সার্থকতা দিয়েছে। ৩রা ভাদ্র ১৮৯২ সালে শিলাইদহ থেকে লেখা 'ছিন্নপত্র এর ৬৩ সংখ্যক পত্রে তিনি লিখেছেন -

"শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণী সুন্দরীর সঙ্গে কোন এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলছে, তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্থ উদাস অর্ধসুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম সুন্দনজলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলেদর মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা।"

এক অনাবিল ঋদ্ধ উচ্চারণ শিলাইদহ থেকে ৮ই মে ১৮৯৩ সালে লেখে পত্রে তিনি লেখেন -

"জীবনে জাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অণেক মিথ্যাচরণ করা যায়। কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে - সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"

'ছিন্নপত্র' সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর অ্যামিয়েলের জার্নাল ও ছিন্নপত্র রবীন্দ্র মনীষা গ্রন্থে গ্রন্থে লিখেছেন -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

"ছিন্নপত্রে' একটি তরুণ কবিমানসের আত্মজিজ্ঞাসা ও নিসর্গজিজ্ঞাসা রয়েছে, কিন্তু এখানে প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতি প্রেমী মনের নির্বিশেষ ঔন্দর্যসন্ধান ও সবিশেষ মর্তমমতা।"

উজ্জ্বল মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্র - অন্বেষা' তে লিখেছেন -

"ছিন্নপত্রাবলির রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই মহৎগভীর উজ্জ্বল প্রাণ সম্পদ

নিয়ে ফিরে এসেছিলেন শিল্পরচনার তীর্থে সেখানে স্থির স্তব্ধ মহৎ মানসিকতা মহৎ শিল্পের গভীরতা ও ব্যাপ্তীর নদী আকাশকে এবং মিলিয়ে দিয়েছিলেন। ..... ছিন্নপত্রাবলীর পত্রপুটে সেই বৃহৎ মহৎব্যক্তিত্বের বিশ্বকাশই ধরা দিয়েছে।"

টিপ্পনী

ইংরেজি সাহিত্যে পত্র ও পত্রসাহিত্য সাধারণভাবে Letter ও epistles এরমাধ্যমে ওবোঝান হয়। Encyclopacdia তে বলা হয়েছে -

" A broad di..... exists between the letter are epistle . The letter essentially a spontaneous non literany c.....

আর এই কারণেই পত্রসাহিত্য ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক শঙ্খ ঘোষ এর মতে -

"তাঁর পত্রাবলীকে তিনি করে তুলতে চেয়েছেন হৃদয়াবেগে উজ্জ্বল, স্থির শান্ত রচনায় সৃষ্ট শিল্পের মহিমায়। পারস্পরিক সম্পর্ককে তিনি ব্যবহারে বিক্ষিপ্তা বা মনীষার বিচ্ছিন্ন না করে তাকে করতে চেয়েছেন অনুভবের মায়ায় প্রসারিত । আর এই সম্পর্কের শিল্পসুষমাই রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে সচেতন পত্রশিল্পে পরিণত করেছে ।" (রবিন্দ্রনাথের পত্রধারা / রবীন্দ্রায়ন; পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত)

'ছিন্নপত্ত' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের মর্তপ্রীতি ও সৌন্দর্যপিপাসু সত্তার পরিচয় :

"ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি ওর ওই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল, নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।"

আঠারো বছরের ভ্রাতুস্মত্রী ইন্দিরা দেবীকে ১৮৯১ সালে জানুয়ারী মাসে ককালিগ্রাম থেকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথেদর মর্তপ্রিতি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে 'পৃথিবী' হয়ে উঠেছে একটি চরিত্র -

"আমি এই পৃথিবীটাকে ভারী ভালোবাসি । এর মুখে ভারী আকটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে - যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

138

পৃথিবীর মধ্যেই কবি শুনতে পান বসুন্ধরার অশ্রুত হাহাকার। তার মণে হয়েছে -

"আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার

শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এদর সুখ দুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে।"

সমকালে রচিত 'সোনারতরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় ধরা আছে কবির জন্মজন্মান্তরের বন্ধনসূত্র -

"আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা
শতলক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষ নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।" (২৬ শে কার্তিক ১৩০০/ ১৮৯৩)

এই ভাবনাই ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯২ সালে শিলাইদহে লেখা চিঠিতে গদ্যরূপ ধারণ করেছে -

"আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাথ দিয়ে এই সূর্যালোক পান করেছিলুম । নব শিশুর মতো অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরের আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম আমার সমস্ত শিকড় দিয়ে মাটির মাতাকে জড়িয়ে ধরে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম।"

এই চিঠিতেই কবির একথাও মনে হয়েছে -

"এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মত আমার কাছে চিরকাল নতুন ; আমাদের দুজনের মধ্যে একটা খুব সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে।"

আর এই পৃথিবীতে অতিবাহিত "এক একটি দিন এক একটি সম্পত্তির মতো।" - আষাঢ়ের প্রথম দিবসে আড়ম্বরের সঙ্গে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক ঘটে যাওয়ার পর ২রা আষাড় ১২৯৯, শিলাইদহথেকে বিস্ময়াডিভূত হয়ষে তিনি লিখেছেন -

"এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে, এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে!"

সৌন্দর্যপিপাসু রোমান্টিক কবিহৃদয়ে তিনি অনুভব করেছেন -

1"হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আঢ়াড়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতিবৎসর সেই আষাড়ের প্রথম দিন তার সমস্ত

টিপ্পনী

আকাশ জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়।"

আর তার পরেই কবির মনে হাহাকার জেগেছে কারণ তাঁর জীবন থেকে আষাঢ়ের আরও একটি প্রথম দিবস বলে গেল। কবি এই ভেবে উঠত যে একদিন 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবস তাঁর জীবনে আর একটথিও অবশিষ্ট থাকবে না।" আর তার পরেই মনে হয়েছে "এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো ককরে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, জীবনের প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় দিই।"

শিলাইদহ - শাজাদপুরের উন্মুক্ত উদার প্রাঙহগনে এসে কবির মর্তপ্রেম ও সৌন্দর্যচেতা সীমার ব২আধন ছেড়ে অসীমে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই তাঁর মনে হয়েছে -

"সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তির ও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।"

সৌন্দর্যে সন্ধানে কবির যাত্রা ইন্দ্রিয়াতীত বলেই শরৎ এর সোনালী আলো দেখে তাঁর মনে হয় -

"আমাদেদর এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলছে, তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধউদাস অর্ধ সুখের ভাব"

৩রা ভাদ্র ১৮৯২ সালে শিলাইদহে লেখা এই চিঠিতে কবির আরও মনে হয়েছে -

"আমার সমস্ত মনটাকে কে যান তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রংইন শরৎপ্রকৃতির উপর আর এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আর একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে।"

এই নেশার ঘোরই তাঁর সৌন্দর্য পিপাসাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে আর সবার ওপরে আছে স্থান মাহাত্ম্য কারণ তিনি এখন যেখানে আছেন সেখানে রোজ সকালে চোখ মেলে দেখতে পান বাঁ দিকে জল আর ডান দিকে সূর্য কিরণে প্লাবিত হয়ে যাওয়া নদীতীর। এইরকম পরিবেশে বসবাস করে ২০ শে আগষ্ট ১৮৯২ সালে তিনি লিখেছেন -

"অনেক সময় ছবি দেখলে যে মনে হয় 'আহা' এইখানে যদি থাকতুম, ঠিক সেই ইচ্ছেটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়; মনে হয় একটি জাজ্জ্বল্য মান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি, বাস্তব জগতের কোন কঠিনতাই এখানে যেন নেই।"

চিঠিটি শিলাইদহে লেখা। স্পষ্টতই পদ্মাবাসের পর্বে লেখা এই চিঠিগুলোতে

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন ও নান্দনিকতার চরম প্রকাশ ঘটেছে।

পৃথিবীর সঙ্গে যে সম্পর্কের কথা তিনি বারে বারে বিভিন্ন লেখায় তুলে ধরেছেন বিভিন্ন ভাবে এই চিঠিতে তাঁর মর্ত্যপ্রেম ধরনীর সঙ্গে একটা 'নাড়ীর টান' অণুভব করেছে। এখানে রোম্যান্টিক পত্রকার আর পৃথিবী একাকার হয়ে যায় -

> "এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম যখন আমার উপর সনুজ ঘাস উঠলত, শরতেদর আলো পড়ত ..... তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দ রস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকান্ড ভাবে সঞ্চারিত হয়ে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।"

পৃথিবীর ওপর এই "আন্তরিক আত্মীয় বৎসলতার ভাব'ই তাকে সৌন্দর্যপিপাসু করে তুলেছে। তিনি নিজেও জানতেন যে এই চিঠিগুলোর মধ্যে তাঁর মর্তপ্রীতি ও সৌন্দর্য পিপাসু সত্তার পরিচয় কিভাবে পরিস্ফুট হয়ে আছে। আর সেইকারণেই ১৮৯৫ সালের মার্চ মাসে তিনি শিলাইদহ থেকে ভ্রাতুস্পত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখেন -

> "আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস, আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগ গুলো একটা খাতায় টুকে নেব কেননা,যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তা হলে একসময় নিশ্চই বুড়ো হয়ে যাব; তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে । তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকে করে এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্ত জোৎস্না ঠিক এমনটথি টাটকা ভাবে ফিরে পাব । আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখ দুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।"

উপসংহারে 'কাব্যপরিক্রমা'য় লেখা অজিতকুমার চক্রবর্তির মন্তব্য স্মরণীয় -

> "এ চিঠিগুলো ঠিক ছিন্নদলের মতো নয় কাকরণ ইহাদের মধ্যে একটি ভাবসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি । ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ দশ বৎসর কালের এই চিঠিগুলি। কিন্তু পড়িতে পড়িতে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান কিছুইও অনুভূতি হয় না । দশ বৎসরে কত বড়ো বড়ো পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে, কত রাজ্য সাম্রাজ্য ভাঙিতে পারে

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

গড়িতে পারে, কত কীর্তি ভূমিস্যাৎ হইতে পারে, কিন্তু একটি মানুষের নদীর উপরে নৌকাবাসের জীবনে পরিবর্তন নাই। মালার সূত্রের ফুলের পর ফুলের মতো দিনের পর দিন গ্রথিত হইয়া চলিয়াছে । পূর্ণ বিশ্বসৌন্দর্যের পায়ে নিবেদনের একটি সাজি সুগন্ধে অমোদিত হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে । কি নিবিড়, কি গভীর, কি আশ্চর্য এই মানুষটির অউভূতি এবং উপভোগ। মনে হয় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য সার্থক যে, একজনও তাহাকে এমন একান্ত আগ্রহে, এমন বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে হৃদয় ভরিয়া দেখিয়াছে।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতির এই ভাব ঐক্য এই ছিন্নপত্রগুলির মাঝখানে সূত্রের মতো থাকায় ইহারা আর এলোমেলোভাবে উড়িতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে একটিমাত্র কথা -

"হে চিরসুন্দর আমি তোরে ভালোবাসি।
তাহাই শেষ কথা এবং চিরকালের কথা। সোনার
ভাবের বলিতে লেখা পরম সুন্দর কথা।"

ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতার বীজতলা :

'ছিন্নপত্র' এর প্রথম আটটি পত্র বন্ধ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা অষ্টমপত্রে - ২৭ শে জুলাই ১৮৮৭ তে তিনি যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাঁর বন্ধুকে যে কবিতায় তিনি তাঁর মনে কথা প্রকাশ করছিলেন এই ভাবে -

"আপনার বিশেষরূপে মনে থাকবে বলে এই চিঠির কিয়দাংশ পদ্যে অনুবাদ করে পাঠাই, অবধান করা হউক।

বন্ধু হে,
পরিপূর্ণ বরষায়
আদিও তব ভরসায়
কাজকর্ম করো সায়
এসো চট্‌পট্।
শামলা আঁটিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা পড়ে মোর চিত্ত
করে ছটফট্।"

টিপ্পনী

কবিতাটি শ্রাবনে পত্র নামে ভারতী ও বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে সংযোজনকালে এর নাম হয় 'শ্রাবনের পত্র'। 'মানসী', 'সোনারতরী' ও 'চিত্রা' এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে পত্রসাহিত্য ''ছিন্নপত্র' এর প্রভাব অপরীসীম মনে হয় যেন একে অপরের পরিপূরক। যেমন 'মানসী' -র ভৈরবীর গান' কবিতায় সঙ্গে জানুয়ারী ১৮৯১ তে লেখা চতুর্দশ পত্র।

টিপ্পনী

"পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন বিরল, অসীম সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যকন ভৈরবীর মীড টানে আমাদের ভারতবর্ষীব হৃদয়ে একটা টান পড়ে।" ('ছিন্নপত্র' ১৪, পতিসর, ৬ইমাঘ ১৮৯১)

পত্রের এই ভাবটাই ব্যক্ত হয়েছে কবিতায়

"ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি
বিপদগ্রস্ত শোভাতে!
ইই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই
প্রভাতে -

.....

ওই মন উদাসীন ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল পরশে সকল জীন
বিকলি।"

'ভৈরবী গান' কবিতাটি লেখা ২৯ শে জৈষ্ঠ ১৮৮৮ চিঠিটা লেখা হয়েছে জানুয়ারী ১৮৯১ তে। কালের তারতম্য হলেও ভাবটি কালাতীত কবিতা রচনা কাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চারুচনদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন -

"তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য নির্ণয় করতে যাও তো বিপন্ন হবে। বুধবারের পর বৃস্পতিবার আসে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে সেটাকে অবজ্ঞা কোরো। আমাদের জীবনে সুতরাং সাহিত্যে ও হয়তো কোনো একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতিবার সপ্তাহ ডিঙিয়ে চব্বিশ ঘন্টাকে অপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যেদিন বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোত পদ্মার ওপর দিয়ে কাঁচাধানের ডিঙিনৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে সে দিনটা সন তারিখ

মাস পার হয়ে আজও আমার মনে আছে। সেই দিনেই সোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই; এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবার ও কথা কারণ আমার মে সোনার তরীর যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচহছে সেই শ্রাবণ দিনের ইতিহাস.....।" (রবিরশ্মি)

টিপ্পনী

এমনই এক ইতিহাস লেখা আছে 'ছিন্ন পত্র' এর৮৮ সংখ্যক চিঠিতে -

"আমাদের চরের মধ্যে নদীরজল প্রবেশ করেছে চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি যখন আর কয়দিন থকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতে পারা যায়।"

চিঠিটি লিখেছেন ৪ঠা জুলাই ১৮৯৩ শিলাইদহ থেকে আর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম কবিতাটি রচিত হয়েছে ১৮৯২ সালের ফাল্গুন মাসে ঐ শিলাইদহেই -

"রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা
ভরা নদী ক্ষুর ধারা
খরপরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।"

আবার ঐ একটা সময়ে লেখা আর একটি কবিতা 'শৈশবসন্ধ্যা' প্রসঙ্গে সাজাদপুরের পথে, ৬ই জুলাই ১৮৯৪ সালে লেখা 'ছিন্নপত্র' এর ১০৮ সংখ্যক পত্রে তিনিই লিখেছেন -

"সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটা খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ..... আকাশে নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ওপারে সার বাঁধা মহাজনি নৌকোয় আলো জ্বলে উঠল, প্রজাঘর থেকে সন্ধ্যাবাতির কাঁসর ঘন্টা বাজাতে লাগল ..... অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃদস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। .....

আমার 'শৈশব সন্ধ্যা' কবিতার বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম, কথাটা সংক্ষেপে এই মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ - পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগন্ধির কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে - নগরর প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

টিপ্পনী

"ধীরে ধীরে বিস্তাতিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি আর শান্তি আর সন্ধ্যা অংধকার
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি। আপনারে মগ্ন করি
অতলের তলে ধীরে লইতেছি ভরি
জীবনের মাপে - আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর অস্তমান রবি
ম্লান মুর্ছাতুর আলো রোদন অরুণ,
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহী এই গভী বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাস।"

সাজাদপুর থেকে ৩রাজুলাই ১৮৯২ সালে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জাইয়েছিলেন এক স্বপ্নের কথা - স্বপ্নে তিনি এক বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে' র গান শুনেছিলেন রাগ ছিল ইমনকল্যান -

"গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে তারপর তৃতীয়বারের বার নিরাশ হয়ে গানের কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ সেই সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল - সবাই মনে করেছিল, সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখে সে কান্না, তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা' 'আহা করেউঠলেন। একজন প্রকৃত গুণীর মনে এইরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগাতে পারে, তিনি যেন সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন।"

টিপ্পনী

'গানভঙ্গ কবিতায় বৃদ্ধরাজা প্রতাপ রায়ের প্রাচীমন সভাগায়ক বরজলাল একদিন নবীন যুবা কাশীনাথের গান পরিবেশনের পরে ইমনকল্যান গাইতে শুরু করলেন। কিন্তু বৃদ্ধ মহারাজা বাদে আর সব শ্রোতারা সে সভায় ছিল অন্যমনস্ক , সুরু হয় কানাকানি -

"নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ ওঠে শতরূপ
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ দুদিকে ধায় দুই জনে,
তবু রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।
গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারয় গেল কী করিয়া
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে, লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে যায় পড়ে না মনে, মরমে মস্তক নাড়ি
আবার শুরু হতে ধরিল গান আবার ভুলি দিল ছাড়ি।
দ্বিগুন হারথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কন্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে নেবে।
গানের পদ তবে ছারিয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি -
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা - হা করি।"

'ছিন্নপত্র' এদর 'বড়দাদা' যে ভূমিকা গ্রহন করিলেন এখানে বৃদ্ধ রাজা প্রতাপ রায় সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ - শিল্প যে একা শিল্পীর নয়, স্রষ্টা ও শিপ্পরসিকের সম্মেলনেই তৈরী হয় নতুন সৃষ্টি -

"একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।"

পত্ররচনার পরেই রচিত হয়েছিল এই কবিতা, প্রথমে 'সোনারতরী' তে সংযোজিত হলেও পরে স্থান লাভ করে 'কথা ও কাহিনী'র দরবারে। 'অনাদৃত' ও 'দেউল' কবিতা দুটির ব্যাখ্যা করছেন সাজাদপুর থেকে ৩০ শে আষাঢ় ১৮৯৩ সালের লেখা ৯২ সংখ্যক পত্রে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

"মনে করো একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল; সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিংবা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিংবা উভয়ের সীমানা মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই

রহস্য পাধারের মধ্যে জাল ফেলে দখা যাক না কী পাওয়া যায়। এই বলনে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানারকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল - কোনোটা বা হাসির মত শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মত উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মত রাঙা। মনে উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে গভীর তলদেশে যে সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশিকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে।"

আর এই সমস্ত ধন সেই ব্যক্তি সমর্পণ করলেন তাঁর "শ্রেয়সী অথবা স্বদেশকে"

"লয়ে দিবসের ভার ফিরিনু ঘরে
তখন উঠিছে চাঁদ আকাশ পরে।"

গৃহকর্তি তখন গৃহকাজ শেষ করে -

"কাননে বসিয়া ছিল মালাটি পরি।"

অনেক ভেবে জাল ফেলে আহরণ করা ধন সেই ব্যক্তি তাঁকে দিলেন -

"যাছিল চরণে রেখে
ভূমিতল দিনু ঢেকে
সে কহিল দেখে দেখে
চিনি নে কিছু
শুনি রহিলাম শির করিয়া নীচু।"

চিঠিতে তিনি লিখেছেন -

"সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মত যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলো নীয়ে তাকে দিয়ে আনা যাকগে , কাকে যে সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি - হয়তো তার প্রেয়সীকে হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু যাকে দেবে সে তো এ সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনো দেখে নি। সে ভাবলো এগুলো কী, এর আবশ্যকতাই বা কী ... এককথায় এ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়; এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাবমাত্র ..... সে তখন কিঞ্চিত বিষন্নমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল।"

চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছেন যে -

"বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করেছেন তাঁর গৃহকার্যনিরতে অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমন্ডলী তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না; তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়; অতএব এখনকার মতো এ সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে তোমরাও অবহেলা করো, আমিও অবহেলা করি কিন্তু এরাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পষ্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে।"

এইভাবে 'ছিন্নপত্র' এবং রবীন্দ্রকবিতা একে অপরের পরুপূরক হয়ে উঠেছে। কোন কবিতা রচনার পূর্ব মূহূর্তটি ধরা পড়েছে 'ছিন্নপত্র' আরার কোন কবিতা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে পুষ্পপত্রে পল্লবিত হয়েছে এই পত্রসমূহে। শিলাইদহ সাজাদপুর পাতিসরের প্রকৃতির পরিপূর্ণতা, তার সঙ্গে উপনিষদ এর উত্যত্ত মন্ত্র এবং রামমোহন রায়ের অনুবাদ পাঠ, ককনও বা অ্যামিয়েলের জার্ণাল পড়া এই সমস্ত কিছু রবীন্দ্রনাথকে এক পরিপূর্ণতার দিকে নিবে গিয়েছে। তিনিই বুঝেছিলেন -

"যখন কোনে বসে সে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে সেই সমস্ত সুদীর্ঘকালেদর কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সুর্যের আলোক এবং বিশ্বমানের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধূণার স্থান অধিকার করে এবং দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।" ('ছিন্নপত্র' পত্রসংখ্যা ৯২)

"একদা এক বিস্ময় ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে
.....
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।

.....

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি -

ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি"

তালদন্ডা খাল, বলিয়া থেকে কটক যাওয়র পথে ২৩ শে ফাল্গুন ১৮৯৩ সাল লেখা এই 'দেউল' কবিতা। এখানে প্রকৃতির মাঝে দেব আরাধনার যে সুরটি বেজেছে সেই দেবতা প্রতিষ্ঠানিক 'দেউল' এর দেবতা নয় - ্খান থেকেই পাওয়া যায় 'জীবনদেবতা'র বীজসূত্রটি - ১২৪ সংখ্যক পত্রে তিনি লিখেছেন -

"এবার বোটে থাকতে আমি অর্ন্যামী নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার অন্তর জীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।" (ছিন্নপত্র, বোয়ালিয়া ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ

মুখ হতে তুমি ভাষা কেরে লহ

মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ

মিশায়ে আপন সুরে।" (অন্তর্যামী / চিত্রা)

ঐ পত্রেই তিনি লিখেছেন -

"আমরা যখন খুব বড় রকমের একটা আত্মবিসর্জন করি তখন কেন করি ? একটা মহৎ আবেগে আমাদের ক্ষণিক জীবনটাই আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুকদুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই। আমারা আমাদের সুখ দুঃখের চেয়ে বাড়ে। আমরা প্রতিদিনেদর তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত।"

ঐ একই দিনে লেখা ১২৩ সংখ্যক পত্রে তিনি অনুভব করেছেন -

"আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখ দুঃখের ভিতরে নিজের একটা প্রসার অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র কিন্তু দুটো এক নয় - এ আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করি আমাদেদর ক্ষণিক জীবনই সুখ দুঃখ ভোগ করে; আমাদের চিরজীবন সেই সুখ দুঃখ নেয় না, তার থেকে একতা তেজ সঞ্চয় করে।"

তাই তো তিনি লিখেছিলেন - তাঁর 'জীবনদেবতা' কবিতায়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নীঠুর পীড়নে নিড়াড়ি বক্ষা
দলিত দ্রাক্ষাসম।"

আবার বাস্তবের আর এক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে 'ছিন্নপত্র' এর ১২১ সংখ্যক পত্র, ২০ শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ এ লেখা হয় -

"যখন গ্রামের চাদরিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতালতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়াল ঘরও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাটপচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেট মোটা পা সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠান্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মত ঘর কন্নার নিত্যকর্ম করে যায় - তখন সে দৃশ্য কোন মতেই ভালো লাগে না।"

এই চিঠির কয়েক মাস আগেই তিনি লিখেছেন 'চিনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'এবার ফিরাও মোরে' -

"..... ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে ম্লান মুখে লেখা শুধু শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভরে
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ ধাকে প্রাণ তার
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি
নাহি উৎসে অদৃষ্টের নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি.
মানবেরে নহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান

শুধু দুটি অন্ন খুঁতি কোনমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।"

আর এভাবেই 'ছিন্নপত্র' হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বীজতলা।

পদ্মাতীরেদর পত্রসাহিত্য হিসেবে 'ছিন্নপত্র' :

'ছিন্নপত্র' এর আশি শতাংশ কবিতায় রচনাস্থল পদ্মাবক্ষ। পদ্মাপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এক অন্য রূপ লাভ করেছে 'ছিন্নপত্র' - এ কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে ২৪ শে আগষ্ট ১৮৯৪ সালে লেখা ১১৮ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

"পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে; ওপারটা একটিমাত্র কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যায়। আমি এইজালের দিকে চেয়ে ভাবি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছে করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মাউষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খকানিকটা চলা খানিকটা না চলা কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে - সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।"

পদ্মাপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেন একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে শিলাইদহ থেকেলেখা চিঠি -

"শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকান্ড চর ধূ ধূ করছে কোথাও শেষ দেখা যায় না - কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায় - আবার অণেক সময় বালিকে নদী বলে ভ্রম হয় - .... পূর্ব দিকে উখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমমা আর নীচে অনন্ত পান্ডুরতা, আকাশ শুন্য এবং ধরণী ও শূন্য নীচে দরিদ্র শুষ্ক, কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরিরী উদার শূন্যতা।" (১০ সংখ্যায় পত্র)

এর প্রায় তিন বছর পরে ২০ শে আগষ্ট ১৮৯২ সালে শিলাইদহ থেকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন -

"রোজ সকালে চোখে চেয়েই আমার বাঁদিকে জল এবং ডান দিকে নদীতীর সূর্যকিরণে প্লাবিত দেখতে পাই। অনেক সময় ছবি দেখলে যে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মনে হয় আহা এইখানে যদি থাকতুম, ঠিক সেই ইচ্ছেটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়, মনে হয়, একটি জাজ্জল্য মান ছবির মধ্যে অসীম বাস করছি, বাস্তব জগতের কোন কঠিনতাই এখানে যেন নেই।"

পদ্মাপ্রকৃতি 'ছিন্নপত্র' এর পত্রসাহিত্য রচনায় এবং অন্যতম উপাদান পদ্মাতীর নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রেখেছে এই পত্র সাহিত্যকে। নদীর বেগ তার প্রবহানতা আর তার বিপরীতে রয়েছে নদীপারের নিস্তব্ধ প্রকৃতি -

"ভোর থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যে সাত আটটা পর্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে দুধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে, সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি, কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি নে।"

এভাবেই তিনি নদীরকথা লিখেছেন ১২ই মাঘ ১৮৯১ সালে সাজাদপুরের অনতিদূর থেকে লেখা উনিশ সংখ্যক চিঠিতে। আবার কালিগ্রাম থেকে ১৮৯১ সালে জানুয়ারী মাসে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন -

"ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময় এমন সকরন আশঙ্কা ভরা অপরিণত এই মানুষগুইর মতো এমন আপনময় ধন থেকে দিত। আমাদেদর এই মাটির মা আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী এর সোনার শস্য ক্ষেত্রে এর স্নেহবালিনী নদী গুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে।"

'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন -

"বাস্তবিক রবিন্দ্রনাথের মত মহাকবির দৃষ্টিতে পদ্মাকে আর কেউ দেখেনি। বছরের পর বছর ঋতুর পর ঋতু পদ্মাকে নিরীক্ষণ করে তিনি তার বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। চর্মচক্ষের দৃষ্টির সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছ কল্পনার দৃষ্টি ও দিব্দৃষ্টি। এই তিন দৃষ্টির সম্মুখে পদ্মা

উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে তার অপার রহস্য, কিছুই গোপন রাখেনি। কেনই বা রাখবে? সে তো অনাদিকাল থেকে অপেক্ষা করে ছিল এমন একজন মহাকবির জন্যে কবির চোখে ভাবুকের চোখে প্রেমিকের চোখে যে তাকে দেখতে চাইবে। তার আশা এতদিনে সফল হয়েছে।"

টিপ্পনী

জমিদারির কাজে ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ অর্থাৎ তাঁর জীবনের চব্বিশ বছর বয়স থেকে চৌত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিলাইদহ, পাবনা জেলার সাজাদপুর আর রাজশহী জেলার পাতিসর গ্রাম তথা বিরাহিমপুর সাজাদপুর কালীগ্রাম পরগনা জুড়ে রবীন্দ্রনাথকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। পদ্মালালিত এই ভুভাগে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল নদীপথ। এই অঞ্চলের প্রধান নদী পদ্মা। শিলাইদহে পদ্মার সঙ্গে ছিল গোড়াই বা গড়ুই নদী। সাজাদপুর বা পরিসরে পদ্মা না থাকলেও যার সহনদী হিসেবে ছিল যমুনা আর ছিল ইচ্ছামতী নদী এবং চলন বিল। শিলাইদহের কুঠিবাড়ির ইকটথেই পদ্মানদীতে একটি বটগাছ ও বেলগাছের কাছে বাঁধা থাকত পদ্মানামের বোটটি। এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের নদীপথে ভ্রমণনের বাহন। রবীন্দ্রনাথই এই ওটটির নাম রেখে ছিলেন 'পদ্মা'। বর্তমানে কালীগ্রাম - শিলাইদহ-সাজাদপুরের সমস্তটাই বাংলা দেশের অন্তর্গত।

পদ্মাতীরের জীবন তাঁর সাহিত্য সাধনায় কি প্রভাব ফেলেছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৩৪১ সালের ১লা চৈত্র শিলাইদহ পল্লীসাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে লিখেছিলেন -

"আমার যৌবনও প্রৌঠ বয়সের সাহিত্য রস সাধনায় তীর্থস্থান ছিল পদ্মা প্রবাহচুম্বিত। শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ সহকাম্য নয়, কিন্তু সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও আমার নিভৃত স্মৃতিলোকে, সেই আমন্ত্রণে প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম করণ ধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জন হয়ে উঠেছে।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

পাবনা যাওয়ার পথে ১লা জুলাই ১৮৯৫ সালে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছামতী ও পদ্মানদীর তুলনা করেছেন -

"এই আঁকাবাঁকা ইচ্ছামতী নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি। এই ছোটো খামখেয়ালি বর্ষাকালের নদীটি এই যে দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত আখের ক্ষেত আর সারিসারি গ্রাম এযেন একই

টিপ্পনী

কবিতার কয়েকটা লাইন, আমি বারবার আবৃত্তি করে যাচ্ছি এবং বারবাচরই ভালো লাগছে। পদ্মার মতো বড় নদী এতই বড়ো যে সে যেন ঠিক মুখস্ত করে নেওয়া যায় না। আর এই কেবল ক'টি বর্ষা মাসের দ্বারা অক্ষর গোনা ছোটো হাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে।

পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইচ্ছামতী মানুষ ঘেঁষা নদী; তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কমপ্রবাহের স্রোতমিশে যাচ্ছে।

পূর্ববঙ্গের মত উড়িষ্যায় কটকেও ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ছিল। জমিদারি দেখশোনার কাজে রবীন্দ্রনাথকে সেখানেও যেতে হত। সেখান থেকে কলকাতা হয়ে শিলাইদহে বোতে ফিরে এসে তাঁর মনে হয়েছে যেন অনেকদিন বাদে আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। এভাবেই পদমাপ্রকৃতি এবং আত্মিক টান তৈরি করেছিল। ২রা ১৮৯৩ শিলাইদহ থেকে তিনি লিখেছেন -

"এখন ও আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ী। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা। এখানে আমার উপরে আমরা সময়ের উপরে আর কারও কোনো অধিকার নেই। এই বোটটা আমার পুরনো ড্রেসিং গাউনের মতো - এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটা ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। যেমন ইচ্ছে ভাবি, যেমন ইচ্ছে কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি এবং যতখুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুললে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ব আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন যে প্রথম কয়েকটা দিন যেন - "পূর্বপরিচিতের সঙ্গে পুনর্মিলনের বাধো বাধো ভাবটা কাটাতেই যাবে।" তারপর আবার পুরাতন সখ্যতা বেশ সহজ হয়ে যাবে এখনেই 'পদ্মা' বোটটি সম্পর্কে লিখেছেন -

"বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা - আমার যথার্থ বাহন; খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনোরকম; কিন্তু এর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ডকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে - বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এচেছে - একটি পান্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো নরম

শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে, আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে।"

পদ্মাপ্রকৃতির মত পদ্মা বোট সঙ্গে ও রবীন্দ্রনাথের গড়ে উঠেছে এক নিবড় সম্পর্ক।

পদ্মার রূপ বৈচিত্র্য ও ফুটে উঠেছে তাঁর পত্র সাহিত্যে কুষ্টিয়ার পথে লেখা ২৪ শে আগষ্ট ১৮৯৪ সালে ১১৮ সংখ্যক পত্রে তিনি লিখেছেন -

"পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে - একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে; ওপারটা একটি মাত্র কাজলের নীল রেখার মত দেখা যায়।"

ভরাবর্ষার পদ্মার এরপ আবার। শীতের পদ্মাকে দেখে ১৪ই ডীসেম্বর ১৮৯৪ সালে শিলাইদহ লেখা চিঠিতেই রয়েছে -

"পদ্মা তো একটা প্রকান্ড নাগনীই বটে। সে এক সময় এই বৃহৎ চরের উপর বাস করত, এখন সেখানে কেবল তার একটা বৃহৎ খোলস সন্ধ্যাব আলোয় পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে। বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফনা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে, গর্জন করতেককরতে কেমন করে আপনার প্রকান্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে, ফুলতে ফুলতে চলত। সেই দৃশ্যটাও মনে পড়ল। এখন সে শীতকালের সরীসৃপ বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতার হয়ে যাচ্ছে।"

আর এই পত্রসাহিত্য সৃজনেদর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী ছোটগল্প প্রবন্ধ কবিতা গানের বিপুল সম্ভার আর তার মধ্য দিয়েই পদ্মাতীরের পত্রসাহিত্য হিসেবে সার্থকতা অর্জণ করেছে 'ছিন্নপত্র'।

উপসংহারে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য স্মরণীয় -

"পদ্মার মহাকাব্য ছিন্নপত্রাবলী। এখানেও সেই পদ্মার জন্মের নীলান্তর। চিত্রাঙ্গদা পুরুষ হতে গিয়ে রমনী, পদ্মা নদ হতে গিয়ে নদী, ছিন্ন পত্রাবলী হতে গিয়ে পদ্য। রবন্দ্রনাথেদর শ্রেষ্ঠ গদ্য কবিতা ছিন্নপত্রাবলী। সে আবার পদ্মাশ্রয়ী।

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের মত মহাকাব্যিক দৃষটিতে পদ্মাকে আর কেউ দেখেনি। বছরের পর বছর ঋতুর পর ঋতু পদ্মাকে নিরীক্ষণ করে তিনি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তার বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। চর্মচক্ষের দৃষ্টির সংগে ক্রমে যুক্ত হয়েছে কল্পনার সৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি। এই তিন দৃষ্টির সম্মুখে পদ্মা উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে তার অপার রহস্য। কিছুই গোপ রাখেনি। কেনই বা রাখবে? সে তো অনাদিকাল থেকে অপেক্ষা করে ছিল এখন একজন মহাকবির জন্যে কবির চোখে ভাবুকের চোখে প্রেমিকের চোখে যে তাকে দেখতে চাইবে। তার আশা এতদিনে সফল হয়েছে।

পদ্মা একটি নিরবিচ্ছিন্ন গতি। সংসারে যে গতি দেখতে পাওয়া যায় তার কতটা কমা কতকটা চলা, তাই তার বিশুদ্ধ মূর্তি চোখে পড়তে চায় না। কিন্তু পদ্মার যে জলস্রোত মূহূর্তমাত্র স্থাপিত না থেকে চলেছে। সেই চিরচলমান প্রবাহ থেকে গতিটাকে যদি ঢেকে নেওয়া যায় তবে তার মধ্যে পাওয়া যায় বিশ্বব্রহ্মান্ডের আদিম রহস্যকে। পদ্মা তখন আর পার্থিব নদী নয়, চরাচরের মূল গতিরহস্যের প্রতীক। রবীন্দ্রচিত্তের গতিমন্ত্রের দীক্ষাদাত্রী তখন পদ্মানদী।"

চিঠিপত্র ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ :

রবীন্দ্রনাথ যে সব ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখেছেন তয়াঁর আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবদের তা এখনও পর্যন্ত ১৯ টি খন্ডে সংকলিত হয়েছেন। প্রথম খন্ডে রয়েছে পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠি দ্বিতীয় খন্ডে জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, তৃতীয় খন্ডে লিখেছেন পূত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে। ৪র্থ খন্ডের চিঠিগুলো কন্যা চমাধুরীলতা ও মীরা, দৌহিত্র নীতেন্দ্রনাথ দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লেখা। পঞ্চমখন্ডের চিঠি গুলো মেজ দা সত্যেন্দ্রানাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দনী দেবী, কন্যা ইন্দিরা দেবী ও জামাতা প্রমথ চৌধুরী কে লেখা। 'ছিন্নপত্র' এর চিঠিগুলোও তিনি এই ভ্রাতুষ্পুত্রী কেই লিখেছিলেন, যদিও গ্রন্থের প্রথম আটটি চিঠি ছিল শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। ইন্দিরা দেবীকে লেখার চিঠির পূর্ণতর সংস্করণ হলো 'ছিন্নপত্রাবলী' নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত পত্র সংকলন হল 'পথে ও পথের প্রান্তরে' আর শ্রীমতী রান উদেবীকে লেখা চিঠি হল 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'।

স্ত্রী মৃণালিনী দেবিকে লেখা চিঠিপত্র' এর প্রথমখন্ডে রয়েছে ৩৬ টি পত্র নিতান্ত ব্যক্তিগত হয়েও চিঠিগুলো নৈব্যক্তিক -

"স্ত্রী - পুরুষের অল্প বয়সের প্রনয়মোহে একটা উচ্ছাসিত মত্ততা আছে।

কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবন থেকেও অনুভব করতে পারত - বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গ দোলার মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়, নিজের সংসার বৃদ্ধি হলে এক হিসেবে সংসারের নির্জলতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্টতার বন্ধনগুলি চারিদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে।"

এই মনন ঋদ্ধ পত্রের পাশাপাশি ব্যক্তি রবিন্দ্রনাথেদর কৌতুকবোধ কেমন ছিল তার অনন্য পরিচয় আর একটি চিঠিতে ফুটে ওঠে। প্রথম পত্রে তিনিই লিখেছেন -

"যেমনি গাল দিয়েছি অমনি চিঠিত উত্তর এসে উপস্থিত। ভাল মানুষির কাল নয়। কাকুতি মিনতি করলে অমনি মিজমূর্তি ধারণ করেন আর দুটি গালমন্দ দিলেই একেবারে জল। একেই তো বে বাঙ্গাল!"

চিঠিপত্র এর ৪র্থ খন্ডে দৌহিত্র নীতেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে কন্যা মীরাকে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন -

"যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিুম বিরাট বিশ্বসত্তায় তার অবাধ গতি হোক, আমার ওশোক তাকে একটুও যেন পিছনে নাটানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেছি, আর তো আমার কোন কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যণ হোক। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছায় না, কিন্তু ভালোবাসা হয় তো বা পৌছায় - নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন ? শশী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি সমস্তের মধ্যেই সবই রয়ে গেছে, আমি ও তারি মধ্যে সমস্তর জন্য আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেইকাজের ধারা চলতে থাকবে।

কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৯০৭) সঙ্গে নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৯৩২) তুলনা করে কন্যাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে মর্মস্পর্শ পিতৃহৃদয়েদর রূপটি পরিস্ফূট হয়।

'চিঠিপত্র' এর ৬ষ্ঠ খন্ডটিতে রয়েছে জগদীশচন্দ্র বসু ও রতাঁর পত্নী অবলা বসুকে

টিপ্পনী

লেখা পত্র সমূহ। ১৬ই আগষ্ট ১৯০১ সালে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীণ কালের গুরুগৃহ বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিওলাসিতার নাম গন্ধ থাকিবে না - ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যেদীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ পর চেষ্টা ও আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্মযোগী করিতে পারিল না কেন ? মহারাষ্ট দেশে তো তিলক ও মরজ্ঞপে আছে, আমাদের এখানে সেরকম ত্যাগী অথচ কর্ম্মী নাই কেন?

এই পত্ররচনার ছয়মাস পরে ১৩০৮ (১৯০১) বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯১২ সালে শেষে অথবা ১৯১৩ সালের প্রথমে নোবেল পুরষ্কার লাভের আগে আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জগদীশ বসুকে জানিয়েছেন -

> "পশ্চিমে আমি সমাদর লাভ করিয়া একথা মনে করিয়া আসি নাই - যখন অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে বসন্ত যাপন করিতেছিলেম তখন গীতাঞ্জলি হইতে আমার ছোট ছোট গান ইংরেজি গদ্যে তর্জমা করিয়াছিলাম, মুহূর্তের জন্যে মনে করি নাই সেগুলি কোনো কাজে লাগিবে বিশেষত ইংরেজি ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। দৈবক্রমে সেগুলি কাজে লানগিয়াছে - তাআতে আমার বিশেষভাবে এই আনন্দ যে যাহারা আমাকে ভালোবাসে তাআরা গৌরব আনুভব করিবে।"

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ছবিটি বিশেষভাবে ফুটে ওঠে তাঁর ব্যক্তিগত 'চিঠিপত্র' র মাধ্যমে। চিঠিপত্র ৭ তিনি লিখেছিলেন কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিনী সরকারকে। কাদম্বিনী দত্ত মহিমচন্দ্র সরকারের কন্যা ও বাল্য বিধবা তাঁর ঈশ্বর জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯২২ সালে শিলাইদহ থেকে লেখা একটা চিঠিতে রবিন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লিখেছেন -

"চরকা চালিয়ে কোন ফল হয়না একথা কেউ বলেনা, তার যেটুকু ফল তাই হয় তার বেশী হয় না। কুইনিন খেলে ম্যালেরিয়া সারে, ম্যালেরিয়া সারলে দেশের পরম উপকার ঘটে, কিন্তু কুইনিন খেলে স্বরাজ হয় একথা কুইনিন বিক্রির মহাজন ও বলে না।"

নির্ঝরিনী সরকার আনন্দবাজানর পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের পত্নী।

চিঠিপত্র ৮, প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্রসম্ভার।

চিঠিপত্র ৯, হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র কন্যা, জামাই, ভাই ও দৌহিত্রীকে লেখা পত্রসমূহ।

চিঠিপত্র ১০, দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত।

চচিঠিপত্র ১১, আনিন্দিতা দেবী ও অমিয় চক্রবর্তিকে লেখা পত্রসমূহ।

চিঠিপত্র ১২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে লেখা পত্রসমূহ।

চিঠিপত্র ১৩ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুম্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্রসম্ভার।

চিঠিপত্র ১৪, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্ত্রনাথ দত্তকে লেখা পত্রসম্ভার।

চিঠিপত্র ১৫ যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা পত্রসম্ভার।

চিঠিপত্র ১৬, জীবনানন্দ দাস ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুইদ্বদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেনকে লিখিত পত্রসমূহ।

চিঠিপত্র ১৭, ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও তাঁর বড় মেয়ে মীরা চোধুরীকে লেখা পত্রসমূহ।

চিঠিপত্র ১৯, সজনীকান্ত দাস ও সুধারাণি দাসকে লেখা পত্রসম্ভার।

চিঠিপত্চর ১২ তে 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে সহ সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুকে যে চিঠি লিখেচেন তাতে ত২আর পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের সম্পর্কে তাঁর মতামত ফুটে ওঠে - ৩রা অক্টোবর ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতন এর উত্তরায়ন গৃহে বসে তিনি লিখেছেন -

"তোমাদের কবিতা পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য বারোয়ারির দল বাঁধা লেখার মত হয় নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নতুন পরিচয় স্থাপন

টিপ্পনী

করেছে। এর অল্পদিন আগে পর্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ব করতে পারেনি । কতকটা ছিল যেনবউকাল কাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। ..... বস্তুত গদ্যে পদ্যছন্দের কারুশিল্প কৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করবার সাহাস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে । কাব্যভারতীর অধিকারে সেই স্পর্ধা কখনোই পুরস্কৃত হতে পারে না। অনায়াসের আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ। ..... প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তামশা' কবিতাটিনতে পাহাড়তলীর বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রক্ষা পোরুষ লাগল ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান - ছেঁড়া লিরিক। ..... বিষ্ণু দের কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পয়েছে - সেটা দুর্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য্য পাসঙ্গিকতায় আসতে ও পারে কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লোআগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি । ঘাটবাঁধানো দিঘীর পাশাপাশি পাইন বনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না। ..... সমর সেনের কবিতা কয়েকটিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 'নীলিমাকে' কবিতাটি পূর্বেই দেখেছিলেম এবং প্রশংসা ও করেছি। সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে..... তাঁর কাব্য অনেকখানি রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে নিয়েছে নিঃসঙ্কোচে অথচ তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ তাঁর আপন। ..... জীবনানন্দ দাসের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে - তাছাড়া অজিতকুমার দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাঁদের কবিত্ব।"

প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৯৩৫। সম্পাদক বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সআকরী সম্পাদক সমরসেন চিঠিতে বুদ্ধদেব বসুর যে ৩ টি কবিতার উল্লেখ করেচেন তা হল 'চিল্কায় সকাল', 'ঘুমের গান', ও 'বিরহ' সমর সেনের

কবিতাগুলো হল Amor Standsupon you / Etra pound' যা পরে 'তুমি যেখানেই যাও নামে পরিচিত হয়, 'মুক্তি, 'স্মৃতি' ও 'প্রেম' আর মৃত্যুর আগে' পড়ে জীবনানন্দকে মনে হয়েছিল চিত্ররূপময়। এভাবেই ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনথের এক অনন্য পরিচয় ফুটে ওঠে, যার সব থেকে বড় প্রমাণ 'ছিন্নপত্র', ব্যক্তি রবিন্দ্রনাথ যে রকম বিচিত্রভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন 'ছিন্নপত্র' - এ তা আর কোথাও করেননি -

> "আমিও জানি, তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার কার কোনো লেখায় হয়নি।"

আবার এই চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রজীবনের প্রবহমানতাকে ও বুঝে নেওয়া যায় ১৮৯২ সালে ভাদ্রমাসে শিলাইদহ থেকে তিনি লিখেছেন -

> "শরতের সোনালী আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই যৌবনা তরণী সুন্দরীর সঙ্গে কোন এর জ্যোতর্ময় দেবতার ভালোবাসবাসি চলছে, তাই এই বাতাস....." (ছিন্নপত্র ৬৩)

আবার 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' -তে ১৯১৮ সালের শ্রাবণ মাসে শান্তিনিকেতন থেকে বালিকা রূণু অধিকারীকে ৮ সংখ্যক পত্রে লিখেছেন -

> "দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মত সুন্দর হয়ে উঠেছে। আকাশের ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।....."

প্রথম পত্রে রবীন্দ্রনাথ তিরিশের প্রথম কোঠায় পা রেখেছেন আর দ্বিতীয় পত্রে তিনি মধ্য পঞ্চাশে - চিত্ররূপে কোথাই কোন খামখি নেই - দ্বিতীয় চিঠির পরের অংশে তিনি লিখেছেন -

> "আমলকী গাছের পাতাগুলিকে ঝরঝরিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে , তার মধ্য একটা আলস্যের সুর বাঝছে আর বৃষ্টি ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীনার তারগুলো থেকে বেজে ওঠে গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে।" (পত্রসংখ্যা৮ 'ভানুসিংহের পত্রাবলী')

পত্রসংখ্যা ৫২ :

শিলাইদহ থেকে ২ রা আষাড় বুধবার ১৮৯২ সালে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নর রাজ্যাভিষেক
বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে।"

এই পত্ররচনার দুবছর আগে তিনি 'মানসী কোআব্যগ্রন্থের ;'মেঘদূত' কবিতায় লিখেছিলেন -

"কবির কবে কোন বিস্মৃত বরষে
কোন পূর্ণ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছেন মেঘদূত। মেঘমন্ত্র শ্লোক
বীশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনার আঁখির স্তরে স্তরে
যখন সংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।

.....

সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদ শিখরে
কীনা জানি ঘনঘট, বিদ্যুৎ উৎসব
উদ্দাম পবনবেগ গুরু গুরু রব।
গম্ভীর নির্গোষ সেই মেঘ সংঘর্ষের
জাগয়ে তুলিয়াছিল সহস্রবর্ষের
অন্তগূঢ় বাস্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন
একদিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন কঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আদ্র করি তোমার উদর শ্লোক রাশি।"

আর এই পত্রে কবি লিখেছেন -

"মেঘদূত লেখার পর থেকে অপরের প্রথম দিনটি একটা চিহ্নিত যেন হয়ে গেছে, নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক এক সময়ে ভাবি এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ এবং একটি করে দিন আসছে - কোনটি সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা, কোনটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধনীল কোনোটি

পূর্ণিমার জোৎস্নায় সাদাফুলের মত প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য ? এবং এরা কি কম মূল্যবাণ ! হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থণা করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতিবৎসর সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশজোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয় - সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু বহু কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলন ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথমদিবস।"

কালিদাসের কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অথচ আজও রবীন্দ্রনাথকে আষাঢ়ের প্রথম দিন যেন নিয়ে আসে এক উৎসবের আঙিনায় এ উৎসব দিনব যাপনের জীবন যাপনের -

"কাল ওভাবলুম বর্ষার প্রথম দিনটা আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো, তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিনযাপন করব না। জীবনে ৯৯ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাড়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে - সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তাহলেও খুব দীর্ঘ জীবন হবে।"

ত্রিশটা দিন আর আসেনি উনত্রিশটা দিন এসেছিল। ১৯৪১ সালের ২২ শে শ্রাবণ আমার আগে পর্যন্ত। চিঠির প্রথম থেকে একটা বিচ্ছেদ বেদনা, প্রতিবছর একটি একটি করে আষাঠের প্রথম দিবস হারিয়ে ফেলার নিবিড় অনুভূতি গ্রাস করেছিল রবীন্দ্রনাথকে -

"সেই অতিপূরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে অবশেষে এক সময় আসবে যখন এই কালিদাসের দিন । এই মেঘদূতের দিন । এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন। আমার অদৃষ্ট আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না।"

এই বিচ্ছেদ বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও প্রবলভাবে অবলোকন করতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর রূপ - রস গন্ধের প্রতি -

"এই কথাটি ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে; জীবনের প্রতিটা সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় দিই। ..... এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীনথেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে

টিপ্পনী

এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নেল এই সমস্তরং এই আলো এবং ছায়া,এই আকাশবাপী নিৎশব্দ সমারোহে, এই দুলোক ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূণ্য পরপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে । কতবড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা ক্ষেত্রটা । আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না। জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি।"

রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ যে আলো কয়েক লক্ষ যোজন দূরত্ব, কয়েক লক্ষ বছর ধরে পার আসে সেই আলো আমাদের অন্তরে পৌছতে পারে না। মনে হয় সে যেন - "আরো লক্ষ যোজন" দূরে রয়েছে। রঙিন সকাল ও রঙিন সন্ধ্যা সমস্তই সেই কালিদাসের কালের দিগবধূর কর্নাহার থেকে ছিন্ন মনিমুক্তের মত খসে পড়ে সুদ্রের জলে হারিয়ে যাচ্ছে অথচ -

"আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না।"

রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে তাঁর সেই সূর্যাস্তের কথটা। যা তিনি বিলেত যাওয়ার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির হয়ে থাকা জলের উপরে দেখেছিলেন -

"অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই অত্যাশ্চর্য সুর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে।"

এই রকম এক একটি দিনকে রবীন্দ্রনাথ এক একটা সম্পত্তির মত চিরজীবনের সঞ্চয় হিসেবে রেখে দিয়েছেন। এই রকম সঞ্চয় হিসেবে তাঁর ছিল পেনেটি পানিহাটিতে ছাতুবাবুর বাগানে কাটানো কয়েকটি দিন। কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের জন্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে কয়েকদিন জন্যে তাঁরা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী' তে লিখেছেন -

"কলকাতা হইতে বাহিরে ইহাই তাঁহার প্রথম যাত্রা পরে বিশ্ব ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ বহুবার বাহির হইয়াছেন। কিন্তু বাহিরের জগতের সহিত এই প্রথম পরিচয়ের তীব্র আনন্দানুভূতি তিনি কখনো বিস্মৃত হন না।"

'জীবনস্মৃতি' তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছে -

"গঙ্গার তিরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল .... পাল তোলা নৌকায় যখন তখন আমার মন বিনা ভাড়ায়

সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যেসব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজপর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"

তেতলার ছাদে বসত সাহিত্যের আড্ডা নতুনদা জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী থাকতেন তেতলার ছচাদের পাশ্ববর্তী ঘরে। ছেলেবেলা'য় তিনি লিখেছেন -

"বউঠাকরন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরী হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়াসুরের গান, গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিল বিধাতা তা ফিরিয়ে নেননি। সূর্য ভোরা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান।"

চন্দননগরের মোরান সহেরের বাগানবাড়ীতেও এই দুজনের সান্নিধ্য আর প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিল তাঁর দিনগুলি। যেকারণে তিনি চিঠিতে লিখেছেন -

"আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতলার ছাদের গুটিকতক রাত্রিই, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দনগরের বর্ষার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চলশিখরের একটি সুর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় এইরকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষনখন্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। ছেলেবেলায় বসন্তের জোৎস্নারাত্রে যখন ছাতে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত। যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব, এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁতছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ যে সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে যেতে যারা পারে না তারাই সৌন্দর্যেদর ধন বলে অবজ্ঞাকরে প্রকৃতপক্ষে -

"সৌন্দর্য - ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তির ও অতীত কেবল চক্ষুবর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।"

সব শেষে তাঁর এই উপলব্ধি হয়ে যে -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"আমি এ কী সমস্ত বকাদি কাব্যের নায়কেরা এইরকম সব কথা বলে, কনভেনশ্যানাসিটির উপরে তিন চার পাতা জোড়া স্বাগত উক্তি প্রয়োগ করে আপনাকে সমস্ত মানব সমাজের চেয়ে বড়ো মনে পরে।"

আসলে প্রকৃত সত্যটি সহরবাসী ভদ্রলোকেদের ভারী কথায় চাপা পড়ে গেছে রসিকতার ছলে তিনি নিজেকেও সেই দলভুক্ত করেছেন -

"পৃথিবীতে সবাই ভারী কথা কয়, তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগন্য। হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হল।"

পুঃ - আসল যে কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম সেটা বলে নিই। ভয় নেই আবার চার পাতা জুড়বে না - কথাটা হচ্ছে পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস।

পত্রসংখ্যা ৫৯ :

ছিন্নপত্র এর ৫০ সংখ্যা পত্র অর্থাৎ সাজাদপুর থেকে লেখা ২৯ শে জুন ১৮৯২ সালের পত্রটির সঙ্গে যে গল্পটির কাহিনী জড়িয়ে আছে সেটি হল 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত পোস্টমাস্টার'। ১৮৯১ সালের মে মাসের শেষ থেকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচর্যের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে 'হিতবাদীর' জন্ম। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন -

"আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্ছে। একটি বড় রকমের কম্পানী খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্ছে। ২৫, ০০০ টাকা মূলধন। ২৫০ টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং একটা অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমল বাবুকনে (ভট্টাচার্য) প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য বিভাগেদর সম্পাদক এবং মোহীকে (চট্টোপাধ্যায়) রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।"

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৮ শে ভাদ্র পদ্মমোহন নিয়োগীলে লেখা একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন -

"সাধনা বাইর হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। .... সেই পত্রে

প্রতদিন সপ্তাহে আমি ছোটো গল্প, সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম । আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই । ছয়সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' তে লিখেছেন -

"কতর্ব্য ঘাড়ে পড়িলে রবীন্দ্রনাথ সে কার্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত করেন। হিতবাদীর সাহিত সম্পাদক হইয়া তিনি প্রতি সম্মাতে একটি করিয়া ছোটগল্প লিখিয়া দিতে লাগিলেন; বোধ হয় ছয় সপ্তাহে ছয়টি লেখেন, ছোটগল্প রচনায় যর্থর্থভাবে হিতবাদীতেই রবীন্দ্রনাথে হাতে ঘড়ি; ইহার পূর্বে যে দুইটি ছোটগল্প লেখেন 'ঘাটের কথা' ও রজপথের কথা' তাহাদিগকে গল্প বলা যায় না, গল্পের আভাস মাত্র বলা যাইতে পারে। জমিদারি দেখা উপলক্ষে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশাচর সুযোগ হয় এবং সেই থেকেই গল্প লেখা শুরু হয় 'মুকুট', 'বৌঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষির' মানুষগুলি কবিকল্পনার মানুষ অথবা ইতিহাসের মানুষ,তাঁহার চোখে দেখা মানুষ তাহারা নয় তাহার কল্পনার সৃষ্ট জীব। বাস্তবেদর সহিত কবির পরিচয় হইয়াছে এতদিন। পদ্মাতীরে বাসকালে মানুষের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। জমিদারি পরিচালনা করিতে আসিয়া তিনি বাস্তব জগতকে স্বচক্ষে দেখিলেন । অসীম কল্পনাশ্রয়ী মনে বাস্তবের যেটুকু ছায়াপাত হয়াছিল তাহারই প্রতিক্রিয়ায় ছোটগল্পের দৃষ্টি। হিতবাদীতে ছয়টি গল্প বাহির হয় দেনাপাওনা, গিন্নি, পোস্টমাস্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, ব্যবধান এবং রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা। প্রত্যেকটি গল্পের উপাদান পরিচিত জগৎ হইতে সংগৃহীত।"

'হিতবাদী' র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছয় সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হয়নি । কর্মকর্তাদের দাবি ছিল গল্পগুলোকে আরও আল্কা ভাবে পেশ করতে হবে - এই যার মায়েশি কাজ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

এই সময় সম্পর্কে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ;রবীন্দ্রজীবনী' তে লিখেছেন -

"কোনো পত্রিকার চাহিদা নাই, সম্পাদকের তাগিদ নাই, হিতবাদীর সহিত সশ্বব্দ নাই। জমিদারির কাজকর্ম করিয়া যে সময় পান, পড়াশুনা করেন; আর তারপর পত্র লেখেন, যাহা দেখেন যাহা ভাবেন, তাহাই

টিপ্পনী

লেখেন অনেকটা ডায়ারির মতো পত্র লেখখাটা উপলক্ষ মাত্র। নির্জনে চরের মধ্যে নৌকাবাসকালে প্রকৃতিকে অন্তর দিয়ে দেখিবার ও দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া মানুষকে গভীরভাবে বুঝিবার যে অবসর লাভ করেন তাহা জীবন বা সাহিত্যে ব্যার্থ হয় নাই।"

টিপ্পনী

পত্রসাহিত্য রচনার জোয়ার এসেছিল এই সময়। ৫৯ সংখ্যক চিঠির শুরুতে তনি জানিয়েছেন তাঁর আগের দিনের লেখাপত্রের কথা ; কিন্তু তাঁর কালিদাস অধ্যয়নে যিনি ব্যত্যয় ঘটিয়েছিলেন তিনি পোস্টমাস্টার স্বয়ং, যার সঙ্গে মেলামেশার ফলে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন একটি অসাধারণ ছোটগল্প।

"কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম, আজ অপরাহ্ন সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট করা যাবে। বাতিটি জালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে, বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্টমাস্টারের দাবি ঢের বেশি। আমি তাঁকে বলতে পারলুম না 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সংগে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে'। বললেও সে লোকটি ভালো বুঝতে পারতেন না। অতএব পোস্টমাস্টারকে টেবিলটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুটিবাড়ির একতলাই পোস্ট - অফিস ছিল এবং আমি একে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনই আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাইহোক এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

ছোটগল্পের 'পোস্টমাস্টার' এর এরকম কোন গল্প শোনাবার লোক ছিল না রবীন্দ্রনাথের মত। একটি পিতৃমাতৃহীন বারো তের বছরের বালিকা রতন তার বাড়ীর সব কাজ করে দিত যদিও রান্না বান্না পোস্টমাস্টারকে নিজেই করে নিতে হত।

"কলকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধৃত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না।"

এই অবস্থায় রতনের সঙ্গে পোস্টমাস্টারের এক অদ্ভুত সখ্যতা গড়ে ওঠে -

"এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটালায় কোনো আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টার ও নিজের ঘরের কথা পড়িতেন - ছোটভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যাথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইতনা।"

পোস্ট মাস্টার চলে গেলে সেই সন্ধ্যেবেলায় রবীন্দ্রনাথ যে আবার কালিদাস অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন সেকথা বলাই বাহুল্য।

"পোস্টমাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়েপড়লুম। ইন্দুমতির স্বয়ংবর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনেদর উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর চেহারা রাজার বসে গেছেন। এমন সময় শঙ্খ এব তুরী ধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ পরে সুনন্দার হাত ধরে উন্দুমতৌঈ তাঁদের মাঝখানে সভাপথেএসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করিতে এমনি সুন্দর লাগে। তারপরে সুনন্দা এবং এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এবং একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর। যাকে তভাগ করছেন তাকে যে নম্র ভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বসে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সেযে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে আ মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।"

'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে বলেছে -

"কালিদাসের সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

আছে ..... কালিদাসকে ও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে।"

সম্পাদকের তাগদাবিহীন অবসরের এই পত্রসাহিত্য শুধু একটি পত্ররচনা মুহূর্তটিকে নয় ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারাকে চিহ্নিত করেএ যা কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনথে প্রবাহিত যেখানে মূল্যবোধ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

টিপ্পনী

পত্রসংখ্যা৮০ :

"কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী - বোধ হয় আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাগদত্তা হয়েছিল।"

৮ই মে ১৮৯৩ শিলাইদহ থেকে ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা এই চিঠি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বত্রিশ আর পুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স পাঁচ। বউকালের প্রেয়সী কবিতা সম্পর্কে চিঠিতে তিনি আরও লিখেছেন ঐ পাঁচ বছর বয়স থেকেই।

"আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়ি ভিতরের বাগান, বাড়ি ভিতরের একতলার আবিষ্কৃত ঘরগুলি এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্তরূপকথা এবং ছড়াগুলি আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরী করেছিল।"

ছেলেবেলায় ভৃত্যরজক তন্ত্রে মানুষ হওয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই রহসে পরিপূর্ণ জীবন সম্পর্কে জীবনস্মৃতি তে লিখেছে -

"ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সব চেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি, কোনটা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

সমবয়স্কা খেলার সাথী, দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বড়দি সৌদামিনী দেবীর কন্যা ইরাবতী রবীন্দ্রনাথকে ঐ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেই এক রাজার বাড়ি আছে সেকথা বলত অথচ কোনদিনও তাকে সেখানে নিয়ে যায় নি।

"কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, রাজার বাড়ি কি আমাদের

বাড়ির বাইরে। সে বলিয়াছে, না এই বাড়ির মধ্যেই । আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাইতাম,ম বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোথায় ? রাজা যে কে সে কথা কোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে কেবল এইটুকুমাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি। (জীবনস্মৃতি)

আর একটা মায়াজগৎ ছিল বাইরের খোলা.....

"আমার জীবনের বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড় বয়স পর্যন্ত আমার নানারকমের দিন ঐ ছাদে নানা ভাবে বয়ে চলেছে।"

প্রথমদিকে বাড়িতে নতুন বৌঠান অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী এলে রবীন্দ্রনাথের ছোড়দি বর্ণকুমারী দেবী ছাদের ওপরে রবীন্দ্রনাথকে যেতে দিতেন না -

"মনে আছে দিদি বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বউকে পাশে নিয়ে, মনের কথা বলাবলি বলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গন্ডীর বাইরের।"

তারপর একদিন বৌঠাকরুনের জায়গা হল ছাদের লাগোয়া ঘরে। ক্রমশ ঐ ছাদেই শুরু হল গান ও কবিতার আসর।

ভাগ্নে জ্যোতিপ্রকাশের অনুপ্রেরণায় শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার সূত্রপাত। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

"আমার এক ভাগিনের জ্যোতিপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে একটুই বড়ো। তিনি তখন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যামলেতের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন । আমার মত শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না । একদিন দুপুরবেলায় তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে' বলিয়া পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতি পদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

পদ্য জিনিসটাকে এ পর্যন্ত কেবল ছাপার অক্ষরে দেখিয়াছি। কাটাকুটি

টিপ্পনী

নাই ভাবনা চিন্তা নাই, কোনোখানে মত্যজনোচিত দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না।" (জীবনস্মৃতি)

ক্রমশ পদ্য লেখার প্রাথমিক ভয় কেটে গেল।

"আর হাতে হাতে সেই চোদ্দ অক্ষরের ছাঁদে পদ্ম ওই ফুটল এমন কি তার উপরে ভ্রমর ও বসবার জায়গা পেল। কবিদের সঙ্গে আমার তফাৎ পেল খুঁজে, সেই অবধি এই তফাৎ ঘুচিয়েই চলেছি।"

শিলাইদহ থেকে পত্রে তিনি লিখেছেন -

"তখনকার সেই আবছায়া মনের ভাব প্রকাশ করা ভারি শক্ত, কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি, কবিকল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল।"

শিল্পের সঙ্গে মালাবদল জীবকে যে বড় দুর্বিষহ করে তোলে সেকথাও তিনি জানাতে ভোলেননি।

"কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয়, তা স্বীকার করতে হয় ' আর যাই হোক সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না, সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, যাকে বরন করেন তাকে বনিবিড় আনন্দ দেন। কিন্তু এক এক সময় কঠিন আলিঙ্গণে হৃৎপিন্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন।"

এই পত্ররচনার কিছুদিনের মধ্যে ১৩ই শ্রাবণ ১৩০০ বঙ্গাব্দ সাজাদপুরে বসে পুরস্কার কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এক কবির আর্থিক দুরবস্থার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'পুরস্কার' কবিতায় -

"সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী
রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো
রচিতেছ বসে পুঁথি বড়ো বড়ো
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি !

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব -
মাথা ও মুন্ড ছাই ও ভস্ম
মিলিবে কি তাই হস্তি অশ্ব
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না কথা জোটে মেলা
নিশিদিন ধরে একী ছেলেখেলা!
ভারতীরে ছাযি ধরো এইবেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা
ওগো, ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী
যা করিতে হয় করহ এখনি
এত শিখিয়াজ এটুকু শেখ নি
কিসে কড়ি আসে দুটো।"

কালিদাস থেকে ভারতচন্দ্র অথবা বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে জয়গোস্বামী কিংবা শ্রীজাত প্রত্যেকেই কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে রাজানুগ্রহ অথবা পত্রিকা প্রকাশের অনুগ্রহ লাভ করতে হয়েছে জীবনধারণ করার জন্য। আর সেই সৌভাগ্যলাভের পথটি সকলের ক্ষেত্রেই ছিল অতি বন্ধুর। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে।"

'ছেলেবেলা' জীবনস্মৃতি কবিতার সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় থেকে শুরু করে 'কড়ি ও কোমল' পর্ব পর্যন্ত বিস্তার লিপিবদ্ধ করা আছে। আর ছিন্নপত্র লেখার সময় সে সম্পর্ক কেমন ছিল তা পরিণত বয়সে লেখা (বৈশাখ ১৩৪৭) 'সোনারতরী'র ভূমিকাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে -

> "সোনার তরী লেখা আর এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। সুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের

মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি না কোনো দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি, ক্ষণে ক্ষণে যেটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে।"

টিপ্পনী

'সোনার তরী'র 'মানসসুন্দরী' কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

"আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্য বিলাসে অয়ি নিরভিমানিনী
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্য গগনের সৌন্দর্যের শশী।"

ঠিক যেভাবে ৮০ সংখ্যক চিঠির প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে কবিতা তাঁর বহুকালের প্রয়সী, যখন তাঁর বয়স ছিল অতি অল্প, ঠিক এখ তার পুত্রের যে বয়স সেই বয়স থেকে কবিতা তাঁর বাগদত্তা। 'মানসসুন্দরী; কবিতায় কবির 'জীবনের প্রথম প্রেয়সী', তাঁর 'খেলার সঙ্গিনী' ক্রমশ'মর্মের গেহিনী' থেকে 'জীবনের অধিষ্ঠাত্রী' দেবী হয়ে উঠেছিলেন। 'সাধনা' পত্রিকার সাহিত্যচর্চা অথবা জমিদারি দেখাশোনার ধেকেও কবিতা রচনাই যে তাঁর জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর 'মানসসুন্দরী'র কাছে এসে বসা যার সঙ্গে কোনদিন মিথ্যাচরণ করা যায় না - এই সম্পর্কে ছিন্ন পত্রে তিনি লিখেছেন :-

"সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞারসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে - সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"

পত্রসংখ্যা ৯২ :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

174

শিল্পসৃজনের ব্যস্ততার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একদিকে পত্রিকার সম্পাদকের তাড়া অন্যদিকে শিল্পসাহিত্যের সমস্ত বিষয়গুলোতে অগাধ নৈপুণ্যতার দরুন কোনটাকে যে বেশি কাজের করে নেবেন সেই নিয়ে চিন্তা এই নিয়েই সাজাদপুর থেকে ৩০ শে আষাড় ১৮৯৩ সালে 'ছিন্নপত্র' এর ৯২ সংখ্যক পত্রটি রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ।

"আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপননিষিদ্ধ

সুসম্পাদেদর মতো হয়ে পড়েছে - এদিকে আগামী মাসের সাধনার জন্য একটি লাইন লেখা হয়নি, ওদিকে মধ্যে মধ্যে স্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন ও কার্তিকের যুগল 'সাধনা' রিক্তহস্তে আমার মুখেদর দিকে তাকিয়ে ভৎর্সনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালকিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি।"

টিপ্পনী

বড়ভাই দ্বিজেনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' মাসিক পত্রিকা ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৯১ সালের অগ্রাহয়ন মাস থেকে। সুধীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালে বি. এ. পাশ করেন। অসামন্য সাহিত্যিক প্রতিভা না থাকলেও সঙ্গে ছিল কাকা রবীন্দ্রনাথ - এসম্পর্কে প্রভাতকুমারমুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী তে লিখেছেন -

"নতুন পত্রিকা নতুন প্রেমের ন্যায়ই তাহাকে টানে এবং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা এই নতুন আকর্ষণে শতদল পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া ওঠে । সাধনার প্রথম সংখ্যা হইতে ছোটগল্পো, প্রবন্ধ, সাময়িক সারসংগ্রহ বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও সাময়িক সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতি বিচিত্র রচনসম্ভারে উহা পূর্ণ হইল।"

'সাধনার' প্রথম সংখ্যা থেকে তাঁর বিলেত ভ্রমণ অর্থাৎ ১৮৯০ সালে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও লোকের পালিতের সঙ্গে দ্বিতয় বারের জন্য লন্ডন যাত্রার বর্ণনা 'যুরোপ যাত্রীর ডায়ারি; প্রকাশিত হয় -

"এক এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকলারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো ; বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে।"

'সাধনার' প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যাতেই একটি করে গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ 'খাওকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'সম্মত্তি সমর্পণ', 'দালিয়া', কঙ্কাল', 'মুক্তির উপায়', 'ত্যাগ', 'একরাত্রি', 'একটা আষাড়ে গল্প', 'জীবিত ও মৃত', 'স্বর্ণমৃগ', 'রীতিমত নভেল', 'জয়পরাজয়', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'সুভা', মহামায়া', 'দানপ্রতিদান', 'সম্পাদক', 'মধ্যবর্তনী', 'অসম্ভব কথা', 'শাস্তি' প্রমুখ মোট ৩৬ টি ছোটগল্পো প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায়। ছিন্নপত্র এ তিনি লিখেছেন -

টিপ্পনী

"আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনা কোনটা আমার আসল কাজ, এক এক সময় মনে হয় আমি ছোটোগল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে লেখবার সময় সুখ ও পাওয়া যায়। ..... এক এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয় - আবার এক এক সময় মনে হয় দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন; মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোনো সেই কাজই করা যাক।"

এই পত্ররচনার মাত্র তিন দিন আগেই ২৭ শে আষঢ় ১৩০০ ২টি কবিতা 'ভরা ভাঙ্গরে' এবং প্রত্যাখ্যান' ২৮ শে আষাঢ় লিখেছেন 'লজ্জা' -

"নদী ভরা কুলেকূলে খেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।" (ভরা ভাঙ্গরে)

'ভরা ভাদরে' সাধনার ১৩০০ সালের ভাদ্চর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার আগে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ১২ই আষাঢ় লেখা 'হৃদয় যমুনা'।

ছোটগল্প ডায়ারি, প্রবন্ধ, কবিতা, গান, অভিনয়, চিত্রবিদ্যা - এই সবকিছুর মধ্যে কোনটাকে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন সেই নিয়েই দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মনে -

"মদগর্বিতা যুবতি যেমন তার অনেকগুলি নিয়ে কোনটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। নিজেদের মধ্যে আমি কোনটিকেই .... করতে চাই নে - কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তে দীর্ঘ দৌড়ে কোনটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ব হয় না, সহিত্য বিভাগে কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোনটাতে পৃথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্য কর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোনটা আমি সবচেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল ভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয়। কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরোজ্য ও মনোরাজ্যের

সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়।"

উনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ শিল্পসাহিত্যের বহুবিধ ক্ষেত্রে আপনাকে প্রসারিত করেচিলেন। সাহিত্যের সবকটি ক্ষেত্রছাড়াও অভিনয় ও চলচিত্রেও ছিল তাঁর সমান গতিবিধি।

১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'এমন কর্ম আর করব না' তে অলীকবাবুর চরিত্র থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সলে নিজের লেখা 'অরূপরতন' নাটকে ঠাকুরদার অভিনয় পর্যন্ত প্রায় ৫৮ টি বছর অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মঞ্চে অভিনয় করেছেন। 'বিসর্জন' নাটকে তিনি রঘুপতি, জয়সিংহ ও গোবিন্দমানিক্য এই তিনটি চরিত্রেই অভনয় করেছেন। নাট্যাচার্য শিশির কুমার নটসুর্য অহীন্দ চৌধুরী দুজনেরই রবীন্দ্রনাথের অভিনয় প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। ১৯২০ সালে 'বিসর্জন' এ জয়সিংহর ভূমিকায় অভিনয় দেখে অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছিলেন -

"সেদিন সে মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব আর ছিল না।"

৯২ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

"যখন গান করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তাহলে তো মন্দ হয় না; আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে, চাই কী, এতাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যিকথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতি ও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি - কিন্তু আর পাবার আশা নেই,সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মত তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই - তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ তুলি টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।"

নিজের জীবন দিয়ে নিজের এই কথাকেই তিনি ভুল এমনি করেছেন। শুধু তুলির টান নয় নিজের লেখা পছন্দ হলে তাকে কেটে দিয়ে যে আঁকিবুকি করতেন যাকে চিত্রের পরিভাষায় বলা হয় ডুড্‌ল (Doodle)। যে ডুড্‌ল দিয়েই হাত পাকাতে শুরু করেন, আর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তারপরে ‘রক্তকরবী’ রচনার কাল থেকে শুরু হয় আরও বেশী করে চিত্রবিদ্যার প্রতি আত্মনিয়োজন ১৯৩০ সালে প্যারিস হয় তাঁর প্রথম চিত্রকলার প্রদর্শনী। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় রবীন্দ্রচিত্র এক বিশেষ ভূমিকা লাভ করেএ ভারতিয় বিমূর্ত চিত্রকলায় তিনি ছিলেন কান্ডারীর ভূমিকায় । তবে প্রতিভার এই বহুবৈচিত্র্যময় রূপের মধ্যে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ আর তাই এই চিটিতে তাঁর মনে হয়েছে -

> “একলা কবিতাটিকে নিয়েথাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে - বোধ হয় যচেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন - আমার চেলেবেলাকার আমার বহুকালের অনুরাগিনি সঙ্গিনী।”

শুধু ভাষার ক্ষমতা, ভাব অনুভাব নয় একজন কবির চাই গঠন করার শক্তি।

> “কারো বা ভাষা আছে, কারো বা অনুভাব আছে, কারো বা ভাষা এবং অনুভাব দু’ই আছে, কিন্তু আর একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অণুভাব এবং সৃজনশক্তি আছে এই শেষোক্ত লোকটাকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে।”

রবীন্দ্রনাথের মতে ভাব বা ভাষা অথবা উভয় বিষয়ে সমৃদ্ধ মানুষ সরব হতে পারে অথবা নীরব হতে পারে কিন্তু তাঁরা কেউই কবি নন, ভাবুক অথবা ভাষাবিদ অথবা উভয়ই। এই প্রসঙ্গে তাঁর সমালোচনা প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত ‘নীরা কবি ও অশিক্ষিত কবি’ প্রবন্ধটি স্মরণীয়। এরপরে তিনি পান্ডুয়া থেকে কটক যাওয়ার পথে তালদন্ড খালে ২২ শে ফাল্গুন ১২৯৯ সালে লেখা সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত অনাদৃত কবিতার ব্যাখ্যা দেন।

> “তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে
> আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
> সীমাহীন নীল জল
> করিতেছে ফলফল্
> রাঙা রেখা জলজল্
> কিরণমালে।
> তখন উঠিছে রবি গগণডালে।
>
> গাঁথিতে দিলাম জাল বসিয়া তীরে।

বারেক অতলপানে চাহিনু ধীরে -
শুনিনু কাহার বাণি
পরাণ লইল টানি,
জতনে সে জালখানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরিয়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে।

নাহি জানি কত কী যে উঠিল জালে
কোনটা হাসির মত কিরণ ঢালে,
কোনটা বা টলটল্
কঠিন নয়নজল
কোনটা শরম জল
বধূর গানে
সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।"

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনোআথ লিখেছেন -

"মনে করো একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল ..... সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল, এই রহস্য পথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক না কী পাওয়া যায়।"

এই মনে করে সেই ব্যক্তি জাল ফেলল। জালে নানারকম জিনিস উঠে এল -

"কোনটা বা হাসির মত শুভ্র কোনোটা বা অশ্রুর মত উজ্জ্বল কোনটা বা লজ্জার মত রাঙা।"

মনের আনন্দে লোকটি সারাদিন ঐ কাজ করে গেল সন্ধ্যাবেলা সেগুলো সে তুলে দিল তার 'প্রেয়সী' অথবা 'স্বদেশ' এর কাছে।

"কিন্তু যাকে দেবে সে তো এ সমস্ত জিনিস কখনো দেখে নি। সে ভাবলে এগুলো কী এর অবশ্য কতাই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে,

দোকানদারের কাছে যাচিয়া দেখিলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে। এক কথায় এ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়; এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাবমাত্র। ..... ফলত সমস্ত দিনের জাল ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলো যাকে দেওয়া গেল সে বললে এ আবার কী?"

টিপ্পনী

তখন সেই জেলেরও হল অনুতাপ।

'যুঝি নাই খুজি নাই বটের মাঝে -
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে!
কোনো দুখ নাহি যার
কোনো তৃষা বাসনার
এসব লাগিএ তার
কিসের কাজে!
কুড়ায়ে লইনু পুন মনের লাজে।

সারাটি রজনী বসি দুয়াচর দেশে
একে একে ফেলে দিনি পথের শেষে।
সুখহীনন ধনহীন
চলে গেনু উদাসহীন
প্রভাতে পরের দিন
পথিক এসে
সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে।"

ছেলের ঐ রহস্যময় ধনের সঙ্গে তিনি নিজের লেখা কবিতার তুলনা করেছেন -

"বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করেছেন তাঁর গৃহকার্য নিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমন্ডলী তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না, তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়; অতএব এখনকার মতো এ

সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্চে - তোমারাও অবহেলা করো, আমিও অহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলো কুড়োয়ে নিয়ে দেসে বিদেশে চলে যাবে।"

সমকাল এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উভয়ের কাছেই সমাদৃত হয়েছে রবীন্দ্র কবিতা, সমাদৃত হয়েছে সদেশে ও বিদেশে।

"পস্টারিটি' যে অভিসারিনী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাতুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারো বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।"

এই 'পস্টারিটি' র একজন ছিলেন আর্জেন্টিনার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। বলাবাহুল্য তাঁর পৃষ্টপোষকতাকেই ১৯৩০ সালে প্যারিসে রবীন্দ্রচিত্রকলার প্রদর্শনী সম্ভবপর হয়েছিল।

সবশেষে এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ২৩ শে ফাল্গুন ১২৯৯ সালে বালিয়া থেকে কতক যাওয়ার পথে তালদন্ডা খালে লেখা আর একটি কবিতা 'দেউল' এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উড়িষ্যার মন্দিরে অন্ধকার দেবতার ধ্যান তাঁর কাছে অর্থশূন্য বলে মনে হয়েছে, যেখানে মন্দিরের বাইরে রয়েছে লীলাময় প্রকৃতি অনন্ত আকাশ অথবা অসীম সমুদ্র। দেউলের রচয়িতা -

"নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারি ভিতে।
স্বপ্নসম চমৎকার
কোথাও নাহি উপমা তার
কত বরন, কত আকার
কে পাবে বরণিতে"

এই দেউলেই

"একদা এক বিষম ঘোর স্বরে"

বজ্র এসে পড়ল আর তার কালে

"পাষানরাশি সহসা গেল টুটি"

টিপ্পনী

অন্ধকার বিদীর্ণ করে

"গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি"

এ অন্ধকার শুধু প্রকৃতির অন্ধকার নয় - এ মনের ও অন্ধকার। পত্রে তিনি লিখেছেন -

টিপ্পনী

> "যখন কোনো বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজেদর মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে, এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বস্ত্র পড়ে সেই সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধূনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।"

পত্রসংখ্যা ১০৩ :

'ছিন্নপত্র' এর ১৭ই চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ বা ৩০ শে মার্চ ১৮৯৪ সালে পতিসরে লেখা চিঠিটির সঙ্গে সমকালের লেখা একটি প্রবন্ধ 'রজনীতির দ্বিধা' যা 'রাজা প্রজা' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতা এবংর ফিরাও মোরে' যা ছিল 'চিত্র কাব্যগ্রন্থের অন্তভুক্ত পড়লে বোঝা যাবে কেন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন -

> "যখন মনে করি জীবনের পথ সুদীর্ঘ, দুঃখকষ্টের কারণ অসংখ্য এবং অবশ্যম্ভাবী, তখন এক এক সময় মনের বলরক্ষা করা প্রাণপন কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় সন্ধ্যের সময় একলা বসে বসে টেবিলের বাচতির আলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মনে করি, জীবনটাকে বীরের মতো অবিচলিতভাবে নীরবে এবং বিনা অভিযোগে করব ; সেই কল্পনায় মনটা উপস্থিতমত অনেকখানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং আপনাকে হাতে হাতে একজন মস্ত বীরপুরুষ বলে ভ্রম হয় তারপরে পথ চলতে পায়ে যেই কুশোর কাঁটাটি ফোটে অমনি যখন লাফীয়ে উঠি তখন ভবিষ্যতের পক্ষে ভারি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আবার জীবনটাকে সুদীর্ঘ ও আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হয়।"

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় সেই যে রাখাল বালক সরাদিন বাজিয়েছিল বাঁই

তাকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন -

"..... ওরে তুই ওঠ আজি
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিবাছে বাজি
জাগাতে জগৎ জনে? কোথা হতে ধ্বনিবে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন অংধকার মাঝে জর্জর বন্ধনে
অভাগিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষমুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার .....

'রাজনীতির দ্বিধা' তে তিনি লিখেছেন -

"যাঁহার আপনার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহ পালিত মৃগশিশুর মতো মৃদুস্বভাব তাঁহারই নিম্নশ্রেণীদের নিকট ডাঙার বাঘ, জলের কুম্ভীর এবং আকাশের শভেনপক্ষি বিশেষ।

"য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপ যত সদয় যত ন্যয়পর বাহিরে ততটা নহে, এ পর্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাহারা খৃষ্টানদের নিকট খৃষ্টান, অর্থাৎ গালে চড়া খাইলে সময় বিশেষে অন্যগালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। তারই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখৃষ্টানের এক গালে চড় মারিয়া তহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে এবং অখৃষ্টান যদি দুর্বুদ্ধিবশত উক্ত অনুরোধ পালান ইস্তত করে তবে তক্ষণাৎ তাআকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্পখাট আনিয়া হাজির করে, তাহার শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লয়, তার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে। তাহার গাভীগুলা হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং তাহার বাছুরগুলা কাটিয়া বাবুর্চিখানায় বোঝাই করিতে থাকে। .....

দক্ষিন আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভলাও করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই অখৃষ্টানের গালে কৃষ্টানি চড় কাহাকে বলে বুঝিতে পারা যায়।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ঠিক যেভবে এই প্রবন্ধে তাঁর মনে হয়েছে ইংরেজ বড়ো কর্তারা সচেতন ধর্মযুদ্ধের প্রভবাধীন এবং 'ছোটো ছোটো কর্তারা কোনো সুযযোগে একবার আমাদিগকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না।" - ঠিক সেইভবেই কুশের কাঁটা বেধার মাত ছোট ছোট বেদনাই আমাদের বেশি অস্থির করে তোলে।

"বড়ো দুঃখের চেয়ে ছোটো দুঃখ যেন বেশি দুঃখকর। তার কারণ বড়ো দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে; মনের সমস্ত দলবল, সমস্ত ধৈর্যবীর্য একহে আপনার কাজ করতে থাকে - তখন দুঃখের মাহাত্মের দ্বারাই তার সহ্য করবার শক্তি বেযে যায় । মানুষের হৃদয়ে একদিকে যেমন সুখলাভের ইচ্ছা তেমনি এর একদিকে আত্মত্যাগের ইচ্ছাও আছে ; সুখের ইচ্ছা যখন নিষ্ফল হয় তখন আত্মত্যাগের ইচ্ছা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করবার অবসর পেয়ে মনের ভিতরে একটা উদার উৎসাহ সঞ্চার হয়, ছোটো দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ কিন্তু বড়ো দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়।"

আর এই বড় দুঃখের বেদনাতেই রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফেরাও মোরে' লিখেছিলেন -

"এই সব উঢ় ম্লান মীক মুখে
দিতে হবে ভাষা ধেই সব ইশ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ।"

বড় দুঃখ কবিকে করে তুলেছে বীরত্ব ব্যঞ্জনাময় আবার -

"চিঠি না পেয়ে যখন আশঙ্কা হয় যে, বুঝি একটা কিছু বিওপদ কিম্বা ব্যামো হয়েছে, তখন কষ্টটাকে শান্ত করবার জন্য হাতের কাছে কোনো ফিলজফিই পাওয়া যায় না, তখন বুদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়।"

এই দুঃখ গুলোকে 'সবিনয়ে সহিষ্ণুভাবে' বহন করার পরামর্শ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি আরও বলেছেন 'দুঃখের দুখ'অথবা 'সুখের অসন্তোষ' এর কোনটাই নিছক কথার কথা নয়। সর্বোপরি -

"যে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত সেই সুখই স্থায়ী এবং সুগভীর, তাতেই যথার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধন হয়।"

টিপ্পনী

পত্রসংখ্যা ১১৫ :

১৩ই আগষ্ট ১৮৯৪ শিলাইদহ থেকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

"অহমিকার প্রভাবেই যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়। যেটা যথার্থ চিন্তা করব। যথার্থ অণুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হয়, যথার্থরূপে তাকে প্রকাশ করে তোলাই তার স্বাভাবিক পরিণাম। ভিতরকার একটা শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে, অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা মনে হয় না, সে একটা জগৎবভাপ্ত শক্তি। নিজের কাজের কমাঝখানে নিজের আয়ত্বের বহিরভূত আরএকটা পদার্থ এসে তারই স্বভাবমত কাজ করে।"

এই পত্রের মধ্যে 'জীবনদেবতা'র আবির্ভাবের পদধ্বনি যেন শোনা যাব। 'জীবনদেবতা', 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত রচাকাল ১৮৯৬ সাল -

"ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।"

১৮৯৪ সালেএই পত্র রচনার সমকালে লেখা হয়েছে 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থেরই আর একটি কবিতা 'অন্তর্যামী'।

"মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিনী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর।
যদি কৌতুক রাখ চিরদিন

টিপ্পনী

ওগো কৌতুকময়ী
যদি অন্তরে লুকায় বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী
তবে তাই হোক। দেবী অহরহ
জনমে জনমে রহো তবো রহো
নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।

এই চিঠি লেখার কয়েকমাস আগের লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সংশয় কাটেনি তিনি লিখেছেন -

"জানি নে এ আমায় কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথা নিয়ে যাব - আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্য যোজনা করে দেবার কী প্রয়োজন ছিল ?" (ছিন্নপত্র; ১০২ সংখ্যক চিঠি ২৮ শে মার্চ ১৮৯৪, পতিসর)

এ চিঠি লেখার কালে সব সংশয় দূর হয়েছে, তাই তিনি লিখতে পেরেছেন -

"সেই শক্তির হাতে আত্মসমর্পন করাই জীবনের আনন্দ। সে যে কেবল প্রকাশ করায় তা নয়, সে অনুভব করায়। ভালোবাসায়, সেইজন্য অনুভূতি নিজের কাছে প্রত্যেকবার নূতন ও বিস্ময়জনক।"

'গীতাঞ্জলি' তে তিনি যে কথা বলেছেন

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনের বিচিত্ররূপ ধরে।
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।"

এখানেও যেন তারই প্রতিভাষা শোনা যায়-

> "নিজের শিশুকন্যাকে যখন ভালো লাগে তখন সে বিশ্বের মূল রহস্য মূল সৌন্দর্যের অন্তবর্তী হয়ে পড়ে এবং স্নেহ উচ্ছাস উপাসনার মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রীতি মাত্রই রহস্যময়ের পূজা ; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিএ বীশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণীক উপলব্ধি। নইলে ওর কোন অর্থই থাকে না।"

এই সময় যে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন বাংলা গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ ও তার অনুবাদ পড়ছিলেন সেকথা জানা যায় ১৯শে আগষ্ট ১৮৯৪ সালে লেখা 'ছিন্নপত্র'ই ১১৭ সংখ্যক পত্র থেকে। সেখানে বলা হয়েছে-

আননআদ্যের খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি

অর্থাৎ আনন্দ হতেই সমস্ত কিছু উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

পরবর্তি কালের 'ধর্ম গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মাঘ ১৩০৯ সালে লেখা 'ধর্মে'র সরল আদর্শ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-

> "সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রানী জনমিতেছে সেই সর্বব্যাপীন আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধধ্যেই ইহারা গমন করে প্রবেশ করে। .....তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই নিঃশ্বাসেরমধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয় ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত হতে দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে। ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয় উন্মালনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।"

এই রচনারই আভাষা পাওয়া যায় ১১৫ সংখ্যক চিঠির শেষ পর্বে-

> "বিশ্বজগতে সর্বব্যাপী আকর্ষণশক্তি যেমন, ছোটো বড়ো সর্বত্রই তার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যেমন কাজ, অন্তরজগতে সেইরকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষনেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য ও হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অণুভব করি। জগতের ভিতরকার সেই অনন্ত আনন্দেদর ক্রিয়া আমাদের মনের ভিতরেও কার্য করে আমরা সেতাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মনুষের মধ্যে আমরা কেন আনন্দ পাই তার একটা মাত্র সদুত্তর হচ্ছে ; আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

১. 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্র সাহিত্যের এক অভিনব সৃষ্টি - ব্যাখ্যা কর।

২. পত্রসাহিত্য হিসাবে ছিন্নপত্র কতদূর সার্থক তা বিচার করো।

৩. 'ছিন্নপত্র' এর গদ্যরীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪. 'ছিন্নপত্র' পদ্মাতীরের পত্রসাহিত্য - মন্তব্যটি আলোচনা করো।

৫. ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের আতুর ঘর - আলোচনা করো।

৬. 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের কবিতা বীজতলা - আলোচনা কর।

৭. 'ছিন্নপত্র' - এ রবীন্দ্রনাথের মর্তপ্রীতির যে পরিচয় পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮. 'ছিন্নপত্র' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গপ্রীতির পরিচয় দাও।

৯. 'ছিন্নপত্র'-এ ব্যাক্তি রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

১০. 'ছিন্নপত্র'-এ বর্ণিত রবীন্দ্রনাধের মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রীতির পরিচয় দাও।

১১. রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের মধ্যে 'ছিন্নপত্র' - এর স্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিচার করো।

১২. 'ছিন্নপত্র' -এ রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের যে উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় দাও।

চতুর্থ একক :: তিতাস একটি নদীর নাম

অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবন ও সাহিত্য :

টিপ্পনী

তৎকালীন ত্রিপুরার ব্রাহ্মনবাড়ীয়া সাহেবের তিন মাইল দূরে অবস্থিত তিতাসপাড়ের গোকর্ণ গ্রামে আদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। তাঁর বাবার নাম অধরচন্দ্র মল্লবর্মন। তিনভাইও একবোনের মধ্যে অদ্বৈত ছিলেন দ্বিতীয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাইনর স্কুল ও ব্রাহ্মণ বাড়িয়া এডওয়ার্ড হাইস্কুলের পর অদ্বৈত প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে অন্নদা উচ্চবিদ্যালয় থেকে। এরপর উচ্চমাধ্যমিক পড়বার জন্য কুমিল্লা ভিক্টরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু বাবা মা এবং ভাইদের মৃত্যুর জন্য স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সমস্যাটি ছিল ভরণ - পোষণের।

১৯৩৪ সালে জীবিকার কাজে কলকাতায় আসেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথম চাকরীটি ছিল 'ত্রিপুরোহিতসাধিনী সভার মুখপাত্র 'ত্রিপুরা পত্রিকায়। এরপর কুমিল্লার শ্রকাহল এর ক্যপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'নবশরি' পত্রিকায় যোগদান করেন সহ-সম্পাদক হিসাবে। পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। উল্লেখ যে এখানে অদ্বৈত সহকারী হিসাবে পেয়েছিলেন পরবর্তিকালের 'দেশ' পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে।

'নবশক্তি' হঠাৎবন্ধ হয়ে গেলে অদ্বৈত যোগ দেন মাসিক 'শাহাম্মদী' পত্রিকায়। তিনবছর এই পত্রিকায় থাকাকালীন দৈণিক 'আজাদ' পত্রিকাতে কাজ করেছেন। তারপর সাগরময় ঘোষের আগ্রহে তিনি 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দান করেন। 'দেশে' কর্মরত থাকাকালীন বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগে পার্টটাইম কাজ করতেন। মূলনত বই কিনতে গিয়ে এবং বাড়িতে টাকা পাঠাতে গিয়ে তিনি নির্দিষ্ট মাইনেতে কুলিয়ে উঠতে পারতেন না বলে অতিরিক্ত পরিশ্রম শুরু করেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

বই ও অন্যকে সাহায্যের জন্য একদিকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতেন, অন্যদিকে টাকার অভাবে ঠিকমতো খাবার জুটত না। অর্ধাহার, অনাহারে থাকার ফলস্বরূপ যক্ষারেগে আক্রান্ত হন। যদিও প্রথম দিকে সহকর্মীদের বুঝতে দেননি অবশেষে ১৯৪৮ সালে তাঁকে ভর্তি করসা হয় কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। কিন্তু অচিরেই রোগ বেড়ে যায়। আবার ভর্তি করা হয় সেই হাসপাতালে।

টিপ্পনী

কিন্তু হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চলে আসেন জকলকাতার নারকেলডাঙার ষষ্ঠীতলা রোড়ের বাড়িতে। সেখানেই ১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র প্রকাশিত হয়েছিল - "সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সু-সাহিত্যিক শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাৎসরিককাল যক্ষ্মারোগ ভোগের পর গত সোমবার ১৬ এপইল নারকেলডাঙার ষষ্ঠীতলা রোড়স্থ গৃহে পরলোক গমণ করিয়াছেন।"

গ্রামীন পরিবেশ ও গোকর্ণঘাটের প্রতিবেশে অদ্বৈত মল্লবমর্মণ গান লিখতে সুরু করন খুব অল্প বয়সে। বাঙালিরা সাহিত্যজীবন শুরু করেন কবিতা লিখে। অদ্বৈত ও স্কুলের নিচু ক্লাস থেকেই কবিতা লিখতেন। জর্জ স্কুলের দেওয়াল পত্রিকা 'সবুজ' এ তিনি কবিতা লিখেছেন। এছাড়া 'খোকা খুকু', শিশুসাথী', 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী, 'ত্রিপুরা হিতৈষী', প্রজাবন্ধু' 'ঊষা', রবি', 'পূর্বাশা', 'কল্যানী, ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েচিল। তাঁর 'ত্রিপুরালক্ষী' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি হল -

"আয় মা ত্রিপুরা লক্ষ্মী,
ত্রিপুরার আকাশ - বাতাস করি মধুময়
ত্রিপুরার মাঠে - ঘাটে পূর্ণ ফসলের হাসি নিয়ে
আয় প্রথময়।

কবিতাতেও তিতাস এসেছে -

সম্মুখে তিতাস বহে এলায়ে
বিপুল দেহভার
পথে পথে বেড়ে ওঠে, বুকে তার
কি ক্ষুব্ধ ঝঙ্কার।

চয়নিকা পাবলিশিং হাউস থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথমগ্রন্থ 'ভারতের চিঠি - পার্লবককঐ' প্রকাশিত হয়। চয়নিকার অন্যতম কর্নধার সনৎকুমারা নাগের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কম দামে জনশিক্ষা প্রসারমূলক গ্রন্থাবলীর প্রথম পুস্তিকা এটি। অদ্বৈতর জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্বেতাঙ্গ জাতির আগ্রাসী মনোভাব নিয়েও তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাক্ত হয়েছে।

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশীত হয় আরভিভ স্টোনের (Irving

Stone) লাস্ট থর লাইফ (Lust for Life) এর বাংলা অনুবাদ 'জীবনতৃষ্ণা' । এটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। কর্ল কপোকের রচনার আনুসরণে 'দেশ' পত্রিকার দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আদ্বৈত মল্লবর্মণের 'নাটকীয় কাহিনী'। নাট্যশিল্প নিয়ে আলোচনা।

অদ্বৈত বাংলার বিষয় নিয়ে গদ্য লিখেছেন। এর মধ্যে যেমন আছে 'আম্রত্ব' এর কথা তেমনই আছে 'এদেশের ভিখারী সম্প্রদায়'। ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক দ্বিতীয় লেখাটিতে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের সমাধান রচনার চেষ্টা করেছেন ।বেশ কিছু পালাগান করেচেন। ব্রতকথা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রাধা বা সীতা বারোমাসী গাণ জোগাড় করেছেন। অনভদিকে ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরের সপ্তাএই 'দেশ' পত্রিকায় কবি টি . এস. এলিয়টকে নিয়ে চমৎকার বিশ্লেষণী ও তথ্যনির্ভর গদ্য লিখেছেন।

চয়নিকা পাবলিশিং হাউস থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সম্পাদনায় 'দলবেঁধে' নামক একটি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয় । এখানে প্রকাশিত তাঁর গল্পটির নাম 'স্পর্শদোষ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে গরীবদের খাদ্য / খাবার জোগাড়ের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গল্পটি গড়ে উঠেছে। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল সন্তাবিকা, কান্না।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথম উপন্যাস 'রাঙামাটি' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। ১৩৭১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত 'চতুস্কোণ' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । এখানে তিনটি স্তরের চরিত্রকে পাওয়া যায় - ভিক্ষাজীবী, শ্রমিক - মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ি - অভিজাত ধর্মী। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু প্রেম। সেইসঙ্গে বাংলার সমাজের বাস্তব ও কল্পিত আদর্শ রূপটি ফুটে উঠেছে।

অদ্বৈত দ্বিতীয় উপন্যাস 'সাদা হাওয়া' প্রকাশিত হয় শারদীয়া 'সোনারতরী' পত্রিকার। খুব সম্ভবত ১৯৪২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে এটি লেখা শেষ হয়। মাত্র চার পরিচ্ছেদের এই গ্রন্থটিকে উপন্যাসিকও বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে এটি লেখা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিশ্ব - রাজনৈতিক গতিবিধি আলোচিত এ উপন্যাসে। বিনয়, গোবিন্দ, টম, জেন - এই চারটি চরিত্র নিয়ে গঠিত উপন্যাসটি।

কাহিনী সংক্ষেপে :

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপনাসে আছে চারটি খন্ড। একটি খন্ড আবার দুটি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

192

অধ্যায়ে বিভক্ত। মোট আটটি অধ্যায় হল - তিতাস একটি নদীর নাম, গ্রবাস খন্ড, নয়া বসত, জন্মমৃত্যু বিবাহ, রামধনু, রাঙা নাও, দুরঙা প্রজাপতি ও ভাসমান।

প্রথম অধ্যায়টি হল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এখানে তিতাস নদীর বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তুলনা করা হয়েছে বিজয় ও মেঘনা নামে দুটি নদীর সঙ্গে। বিজয় নদীতে বর্ষাকাল ছাড়া জল থাকে না। সেখানকার মালোদের জীব সংগ্রাম তীব্র। 'চৈত্রের খরায় নদী কর .... হয়'। আর জেলেদের অবস্থা আরও করুণ। তাদের মাথাও ঠিক মতো কাজ করে না। নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ এমনই দুই জেলে। নিত্যানন্দ 'যতই ভাবিয়েছে, দেখিয়াছে কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না'। অণ্যদিকে মেঘনা নদীর বিপুল জলরাশি দেখলে ভয় জাগে। বর্ষায় দুকূল প্লাবিত হয়ে যায়। এই দুই নদীর মাঝখানে যেন তিতাস। তিতাস কোনো পাহাড় থেকে সৃষ্ট নয়। মেঘনার একদিকে শুরু হয়ে আরেকদিকে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু নদী অকৃপণ। এখানে দুকূল প্লাবীত বিপুল জলরাশির শৃঙ্কার নেই। আবার শুকিয়ে যাবার চিহ্ন নেই। জেলারা নিশ্চিন্তে মাছধরে। আবার সাঁতরে তাকে পার হওয়া সহজ নয়। এরই সঙ্গে আছে জোবেদ আলীর মুনীস করমালী - বন্দানী -র ক্লান্ত জীবনের কথা। শুধু তাচরাচই খাটে না, খাতে তাদেদর স্ত্রীরাও।

প্রথম খন্ড শুরু হয়েছে মালোদের মাঘমন্ডল ব্রত দিয়ে। বাসন্তীর চৌয়ারি তৈরি করে দেয় জেলে পাড়ার দুরন্ত দুইজন - কিশোর ও সুবল। সেই দুজন পাঠশালায় যায় না। সুবলের বাবা গগণচন্দ্র জাল হাল করতে পারেনি। স্বপ্ন দ্যাখে ছেলে করবে। বাবা মারা যাবার পর সুলব কিশোরের নৌকায় কাজে লাগে। কিশোর, সুবল, প্রৌঢ় তিলকচন্দ্রকে নিয়ে প্রবাসে বের হয়। গাওয়ারের নাম শুকদেবপুর, থলার নাম উজাণিনগর। তাদের যাত্রা শুরুতে খটে ছিল শুধু কিশোরের মা, বাসন্তী ও বাসন্তীর মা। মেঘনার উত্তাল তরঙ্গ পেরিয়ে অবশেষে পৌছন শুকদেবপুর । পাথরের মতো কোঁদা শরীরের বাঁশিরাম মোড়লের নেতৃত্বে শুকদেবপুরেদর জীবন সমৃদ্ধশালী। সেখানেই আসে দোলপূর্ণিমা। রঙে মেতে ওঠে জেলেরা। কিশোর - যুগলরাও । সেখানেই দেখা হয়ে যায় এক কিশোরীর সঙ্গে। পঞ্চদশীও কিশোরকে দেখে রোমাঞ্চিত । মোড়লগিন্নির ত্ত্বাবধানে কিশোরের সঙ্গে আর্ধবিবাহ সম্পন্ন হয় । মাছ বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝায় পড়ে কিশোরেরা । তারপর তিতাসের থেকে একদিন আসে এক খাড়ির মধ্যে রাত কাটান। সেখানে ব্যবসায়ীদের আরও নৌকার দল। রাতে ডাকাতের দল কিশোরদের বেঁধে রেখে রোজগারের দুইশত টাকা চুরি করেছে এবং সেইসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে না গলুইয়ের

পাটাতনের নিচে লুকিয়ে রাখা কিশোরের স্ত্রীকে। তিতাসের মোহনা খাসে। কিশোরের চোখে পড়ে একটি মৃত নারীদেহ ভাসছে উপুড় হয়ে। এই আঘাতে কিশোর পাগল হয়ে যায়।

এরপর দ্বিতীয় খন্ডের 'নয়াবসর্ত' শিরোনামাঙ্কিত অংশ। 'রাজার কি' অবন্তের মা একসময় আশ্রয় পেয়েছিল নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ - দুই বৃদ্ধ ভাইয়ের কাছে। চারবছর পর অনন্ত ও তার মাকে নিত্যানন্দরা পৌঁছে দিয়ে আসে গোকর্ণ ঘাটে। নতুন মানুষ দুটিকে নিয়ে মালোপাড়ার বিস্ময়। অন্যদিকে অনন্ত-র অবাক হওয়া। অনন্তর মায়েদের ঘাটে পৌঁছনার সময় পাগল কিশোরকে নদীতে স্নান করাতে আনে তার বৃদ্ধ বাবা মা। কালোবরণের মা গ্রহণ করে নতুন মানুষ দুটিকে। মালোপাড়ার বউ মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বন্ধুত্ব হয় সুবলার বউয়ের সঙ্গে। জেলেদের কাজকর্মে যুক্ত হয় সে। সমাজের ..... হয় ভারতের বাড়িতে। রামপ্রসাদ, দয়ালদাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র, নিতাই, কিশোর প্রমুখ মাতব্বর দের উপস্থিতিতে মঙ্গলার বউয়ের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় আনন্তর মা, রামপ্রসাদ ..... থেকে ফিরবার পথ ভুল করে বাহারুল্লার বাড়িতে উপোস্থিত হয়। জারিগান আর কালীপুজোর অণুষ্ঠান নিয়ে দুই প্রবীনের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। রামপ্রসাদ অণন্ত ও অনন্তরমায়ের মতো নাতি কন্যার স্বপ্ন দেখে।

এর পরবর্তী অংশ 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ'। রামকেশবের বাড়িটির চির অন্ধকারে ডুবে। অণন্তর মা কিশোরের প্রতি দুর্বল। এই দুর্বলতা জানতে পারে বাসন্তী। মালোদের কালীপূজো হয় খুব ঘটা করে। সেই পূজোর সেবাইত হয় অনন্তর মা। অনন্তর মনে হয় মা যেন অনেক দূরের জীব। রমকোব ছেলের মঙ্গলের জন্য উত্তরায়ণ সংক্রান্তির আয়োজন করে। সেখানে সারারাত ধরে মঙ্গলার বউ, সুবলার বউ ও অনন্তর মা পিঠে বানায় ও নিজেদের জীবনের অতীতকে ফিরে দেখে। তারপর আবার বসন্ত আসে। অণন্তর মা কিশোরকে রঙ্গিন করতে চায়। কিশোরের পাগলামী বেড়ে যায়। অনন্তর মা কে বোধহয় শেষ সময়ে সে চিনতে পারে। কিন্তু পাগলরের পাগলামীতে আতঙ্কিত অনন্তর মা অচৈতন্য হয়ে পড়লে গ্রামবাসীরা কিশোরকে পিটিয়ে মারে। অন্যদিকে চারিদিনের মধ্যে মারা যায় অনন্তর মা।

তৃতীয় খন্ড শুরু হচ্ছে 'রামধনু' দিয়ে। হাটের বড় ব্যাপারী কাদিরের আলুর নৌকা তিতাসের জলে ডুবতে যাবার আগেই ধনঞ্জয় ও বনমালী তাকে রক্ষা করে। বনমালী লবচন্দ্রের বৌ উদাতারার দাদা। তার অনন্তকে ভাল লাগে। এদিকে বাসন্তীর বাড়িতে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অর্থাভাব। তাই অনন্তকে আর রাখতে চায় না। ঝড়ে ঘর ভাঙে বাসন্তীর। আর কালোর মা - র নাও ভাঙে। তবি কালোর মা জিওলেদর ক্ষেপে অনন্তকে নেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাতে পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে বাসন্তীর ভিতরটা মুচড়ে ওঠে। অনন্তকে তাড়িয়ে দিতে হয়। বনমালী - উদয়তারা অনন্তকে নিয়ে যায়। উচ্চবর্নের লোকেদের সঙ্গে মালোদের বিবাদ বাধে। তেলিপাড়ার একজনে অশোভন আচরণের ফল বাসন্তীর কৌশলে মালোরা তাকে হত্যা করে জলেলাশ ভাসিয়ে দেয়। সে লাশ কোথায় চলে যায়। উচ্চবর্ণের লোকেরা এর বিহিত করতে চায় তাদের জব্দ করে। অন্যদিকে উদয়তারা বাপের বাড়িতে দেখা হয় দিদি নয়নতারা ও বোন আসমান তারার সঙ্গে। পদ্মাপুরান পাঠ করে বৈষ্ণব। অণন্তকে মনে লাগে। তাকে পড়াতে চায়। মনসাপুজো উপলক্ষে দেখা হয় অণন্তর সঙ্গে অনন্তবালার। দেখা মেলে রাঙানাওয়ের।

'রাঙানাও; শীর্ষক অংশে শুরু চৈত্রমাসে চতিতাসের অবস্থা দিয়ে। তারপর ক্রমে ছাদিরের রাঙা নাও তৈরি হওয়ার বয়ান। কাদিরকে মিথ্যা মামলার ফাঁদে ফেলে সর্বশান্ত করতে চায় মাগন সরকার। ছাদির তাঁর সৎ স্বচ্ছ মন দৃষ্টী নিয়ে দাঁড়ায় তার সামনে। দোলগোবিন্দ সাহার মৃত্যু মাগনকে বিচলিত করে। সে কাদিরকে জানায় এই তার শেষবারের মতো শয়তানি। ওতবু সে করবে। কাদির সান্ত হয়ে সব মেনে নেয় পরদিন খবর পাওয়া যায় মানব নারকেল গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে বীভৎসভাবে মারা গেছে। তারপর কাদির ছাদিরের কথা মেনে নিয়ে নৌকাগড়ার টাকা দেয়। মেনে নেয় নাতির মক্তবে পড়ার দাবিও। নৌকা তৈরি হয়। তিতাসে নৌ বাইবার প্রতিযোগিতা। জারি গান - সারিগানে চারিদিক মুখরিত। এই প্রতিযোগিতাতে অংশ নেয় মেয়েরাও। আসে বনমালী - উদয়তারা অনন্ত - অনন্তবালারাও। অন্যদিকে সুবলার বউ, অনন্তমাসির দেখা পায়। বাসন্তী এক দৌড়ে এসে জাপটে ধরে আদর করতে চায় অনন্তকে। উদয়তারার শ্লাঘায় আঘাত লাগে। অনন্ত মাসির প্রতি আকৃষ্ট হয়েও বাইরে আবেগ দেখাতে পারে না। তারপর সুবলার বউ ও উদয়তারার মধ্যে মারামরি শুরু হয়। সবাই হতম্ভব হয়ে দেখে বাসন্তীকে শুইয়ে ফেলে উদয়তারারা প্রবল মারাধোর করে। মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত সুবলার বউ তাদর নৌকায় ফিরে যায় এবং প্রতিযোগিতায় অংশ না নিয়েই ফিরে যায়।

চতুর্থ খন্ড শুরু হনচ্ছে 'দুরঙ্গা প্রজাপতি' নামক অধ্যায়টি দিয়ে। সুবলার বউ এর শরীরে দোলা ব্যাথা দুদিনে কমে গেলেও মনের ব্যাথ্যা কমল না। শেষে অন্যপাড়ার ভিনজাতের ছেলেরা পর্যন্ত তাকে উত্যক্ত করতে লাগল। কিন্তু সুবলার বউয়ের মধ্যে

বিপ্লবী নারী বাস করে'। সে বারে বারেই রুখে দাঁড়ায়। রুখে দাঁড়াল এবারও। তামসীদের বাড়ীতে যে তিনজন তবলা বাজাত। তাদের বিরিদ্ধে মালো ছেলেদের এক করল বাসন্তী অন্ধকার রাতে তাদের মারধর করা হল। মার খেয়ে এরা ঠিক করল হাতেনয় ভাতে মারবে মালোদের। মালোদের আকাশে একখন্ড কালো মেঘ ভেসে থাকল যা পরবর্তীতে বড় আকার নেবে। অণ্যদিকে ছাদিরের নৌকা ভেঙে গেল। ছাদির কোনক্রমে বনমালির কৃপায় রক্ষা পেল। এই বনমালীই তাদের আলুর নৌকা ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে ছিল। ছাদিরেদর লোকগুলি হারিয়ে গিয়েছিল তারাও বিধ্বস্ত অবস্থার একে একে ফিরে এলো। উদয়তারা, জামিলা, অনন্ত-রমুর সাক্ষাৎ ঘটনা। তারপর গ্রামে দিয়ে অণন্ত লেখাপড়ায় মন দিল। শিশু শিক্ষা শেষের পর অনন্ত গড়বার জন্য কুমিল্লা শহরে গেল। এদিকে যাত্রাদলেদর পানহডারা মালো সমাজে ভাঙ্গণ ধরাবার জন্য আরো জাঁকিয়ে বসল। মালোরা ক্রমে নিজেদের সংস্কৃতি ভুলতে লাগল। সুবলার বউকে নানাভাবে অপমান করা হতে লাগল।

যাত্রার শেষমহড়া হবে কালোচরণের বাড়িতে। কালোচরণকে নিষেধ করেও লাভ হনি। মহড়ার দিন কালোচরণের পাশেই মোহনের বাড়ীতে গানবাজনার আসর বসাল সুবলার বউ। অর্ধেক এদিকে অর্ধেক ওদিকে ভিড় করেন। শেষরাতে মোহনেদর বাড়ীতে লোকারণ্য। প্রথম চোটে সুবলার বউদের জয় হল। কিন্তু যখন যাত্রার পোশাক পড়ে যাত্রা শুরু হল তখন গোটা মালোপাড়া ঝেঁটিয়ে কালোচরণের বাযিতে গেল। মালো সংস্কৃতির এই পরাজয়ের দিন দুজন সেখানে যায়নি মোহন ও সুবলার বউ।

উপন্যাসের শেষ অধ্যায় ভাসমান। মালো সমাজ ক্রমে আত্মসমর্পণ করল উচ্চবর্ণীয়দের কাছে। মেয়েদের বিলাসিতা বাড়ল। ছেলেরা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাল। বাবুরা ঋণ দিয়েছিল। মালোরা সেই ঋণ শোধ করতে না পারায় তাদের ঘটি বাটি পর্যন্ত আটক হল। এমনকী বুড়ো রামকেশবচন্দ্রকে পর্যন্ত দাঁড়ি টেনে তিতাসের জলে নিয়ে গিয়ে টাকা আদায় করা হল। এদিকে রাধাচরণ মালো স্বপ্ন দেখল তিতাস শুকিয়ে গেছে। তার মধ্যে চড়া জেগেছে। সবাই হেসে উঠিয়ে দিলেও তা একদিন সত্য হল। চর জেগে উঠল। চরের দখল নেওয়ার জন্য লাঠালাঠি হল। শেষঅবধি কোন ভাগচাষী বা গরীব চাষী নয়। চাষের জমি গেল তাদের আধিকারে যাদের প্রচুর জমি নিয়েও আছে। মালোরা চরেদর জমি দখল নিতে কী করবে? অন্যদিকে অণন্তবালা প্রতীক্ষা করতে থাকে অনন্তর জন্য। বনমালী শহরে গিয়েও অনন্তর খোঁজ পায় নি। পরে যখন অনন্তবালার বিয়ের বয়স পেরিয়ে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গেছে যে ষোল পেরিয়ে সতোরোয় তখন বনমালী নিজে মাছ ধরে না, শহরের .... মাছের পোনা বয়ে নিয়ে যায়। সেই সমস্ত খোঁজ মেলে অবন্তর। সে প্রবাসে বনমালীকে চিনতে না পারলেও শেষে চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরে। তাকে ধূতি, তার মাসি, সুবলার বউ ও উদয়তারার জন্য শাড়ি কিনে দেয় কিন্তু অনন্তবালার জন্য কিছুই নয়। উদয়তারাকে তার স্বামী বাড়ি নিয়ে গেল। যাবার পথে দেখা হল সুবলার বউ এর সাথে। দুজনে ভুলে যায় পুরণো কথা। অনন্তর কথা আসে। সুবলার বউ আর মনে হয় যদি সে আত্রা করা শুরু করে। তিতাসে ক্রমে চর বড় হয়, মাছ কমে আসে। মালোপাড়ায় আর কাল সুতোর কারবার নেই। কোনদিন পুঁটি, মৌরলা পাওয়া গেলে ভাত জোটে, নতুবা নয়। গ্রাম ছেড়ে অনেকেই অন্য কাজের সন্ধানে যাব। মৃত জয়চন্দ্রের বউ ভিন্ন গ্রামে ভিক্ষা করতে যায়। ভয়ে থাকে যদি তার কর্ম প্রকাশ হয়ে যায়। একদিন তা প্রকাশ্যে এলো। কিন্তু নিন্দার বদনে দেখা গেল অনেকেই তারপথ ধরেছে। অনন্তবালার বাবা পরিবার নিয়ে আসামে চলে গেল। আর অনন্ত গ্রামে সেবাকার্য করে বেড়াচ্ছে। সুবলার বউ স্বপ্ন দেখে পুরনো ভরা তিতাসের, মাঘমন্ডল ব্রতের দুই যুবকের টানাটানির, পরাস্তারের। আরো দেখে তার অনন্ত, যে অনন্তর জন্য মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, আন্যের সঙ্গে মারামারি করেছে, সেই অনন্ত তাকে ও বুড়ো রামকেশবকে (তার ঠাকুরদা) ভাত তুলে দিচ্ছে মাটির সরায় কাউকে চিনতে পারছে না। সুবলার বউ এর হাত থেকে লোটা পড়ে যায়। ধানকাটা হয়ে গেলে তিতাস জুড়ে জল ও ঢেউ। মনে হয় না সেখানে চড়া ছিল। ঢেউ ধাক্কা মারে মালোপাড়ার মাটিতে। সে মালোপাড়ায় এখ শূন্য। ভিটেতে গাছপালার জন্মেছে। তাতে বাতাস লেগে সোঁ সোঁ শব্দ হয় ল এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেল।'

তিতাস একটি নদীর নাম :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে একটি নদীকে কেন্দ্র করে। নদীকে কেন্দ্র করে উপন্যাস বাংলা সাহিত্য কম নেই এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', দেবেশ রায়েদর 'তিস্তাপারের বৃত্তআন্ত'। এই তিনটি নদীই বিখ্যাত ও প্রবলভাবে বহমান। তিতাস কুলশীলহীন সামান্য একটি শাখা নদী। মেঘনা থেকে তৈরি হয়ে মেঘনাতেই গিয়ে মিশেছে। একটা বলয়ের মতো তৈরি করেছে। এই তিতাসই উপন্যাসটির কেন্দ্রভূমি। তিতাসের তীরে আবস্থিত গোকর্ণগ্রাম ও তার মালোপাযার মূল উপজীব্য হলেও তিতাসপারের মানুষজন সবাই এসেছে উপন্যাসে। মূলত নদীকেন্দ্রিক যেসব মানুষ তারা উপন্যাসে বিধৃত। জেলরা ছাড়াও আছে কৃষদের দল। কিন্তু তাদের

আস্তিত্ব ঐ তিতাসকে ঘিরেই। উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে -

> "তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছাস।
>
> স্বাপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।
>
> ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রাভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতে চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।"

আর উপন্যাসটি শেষ হচ্ছে -

> "ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। চরে আর একটিওও ধান গাছ নাই। সেখানে এখন বর্ষার সাঁতার জল। চাহিলে কারো মনেই হইবে না যে এখানে একটা চরছিল। জলে থই থই করিতেছে। যতদূর চোখ যায় কেবল জল। দক্ষিণের সেই সুদূর হইতে ঢেউ উড়িয়া সে ঢেউ এখন মালোপাড়ার মাটিতে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু এখন সে মালোপাড়ার কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই ল শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।"

এই বিস্তারের মাঝখানটা জুড়ে আছে একটি নদীকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

চারটি খন্ডে উপন্যাসটি বিভক্ত। প্রতিটি খন্ডে আবার দুটি করে উপ্যাখ্যান এপিসোড়। যেন নদীর ছোট ছোট ঢেউ এর মতো এপিসোড়। আর যেন নদীর বাঁকেদর মতো উপন্যাসের প্লট নতুন নতুন বাঁকে নতুন নতুন চরিত্র ও আখ্যান উপহার দিয়েছে। গুণময় মান্না এমনই বলেছেন - "নদী যেমন ছোটো ছোটো ঢেউ তুলে আবর্ত রচনা করে কিছুটা এগিয়ে তারপর বাঁক নেয়, এ উপন্যাসের প্লটন ও তেমনই - এক এক বাঁকে নতুন চরিত্র, নতুন ঘটনা; তবু মূল ধারাটি একই থেকে যায়।" (অদ্বৈত মল্লবর্মনের তিতাস : তিতাস একটি নদীর নাম : ক্রমঙ্গ ও অনুষঙ্গ)।

আমরা যদি কাহিনীর তাকাই তাহলে দেখব প্রতিটি উপাক্যানের ঘটনা বদলে যাচ্ছে এবং প্রচুর চরিত্র এসেছে। চরিত্রগুলিও আবর্তিত হয়েছে তিতাসকে কেন্দ্র করে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তিতাস বিজয় নদীর মতো সীর্ণ নয়, আবার মেঘবার মতো দুরন্ত নয় ল এ নদীকে দুষ্ট গল্পীবালকা সাঁতরিয়ে পার হতে পারে না, আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়ে মাঝি পারাপার করতে ভয় পায় না। ভাটায় সে কানিকটা ঝরঝরে হলেও শীর্ণ হয় না, জোয়ারে মেদ বাড়লেও ভয়ানকরূপ ধারন করে না । এই নদী নিয়েই মালোদের জীবনপালা অভিনীত। তাদের জীবিকা নদীকে নির্ভর করে। আবার তাদের সংস্কৃতিও নদীকে ঘিরেই। তিতাস বয়ে নিয়ে আসে অন্য দেশের মানুষকে । আবার মালোদের নিয়ে যায় অন্য কোনখানে। নদী বেয়ে আসে। আবার এই নদীতেই প্রেমিকা তথা স্ত্রীকে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে পড়ে কিশোর। নদী যেমন অর্থ জোগায় নদীই আবার কেড়ে নেয় জীবনও । তাই চিরকাল বৈধবে কাটাতে হয় সুবলার বউকে। তিতাসকে কেন্দ্র করে কার্নিভাল বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নৌকা প্রতিযোগিতায় নাম লেখায় কত মানুষ। এই প্রতিযোগিতায় চলে মারামারি - লাঠালাঠিও। উৎসবের পাশেই ভাসতে পারে লাশ। আবার তিতাসের জলে পাওয়া যায় নতুন বন্ধুও। কাদির - ছাদিরের আলুর নৌকা ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচায় বনমালী কিংবা ছাদিরকে নৌ প্রতিযোগিতার লাঠালাঠি থেকে উদ্ধার করে সে। বনমালীর মরত্যুতে মুহ্যমার কাদির মালোপাড়ার অকালে খুলে দেয় তার ভান্ডার। তিতাসের বুকে কিশোর হারিয়েছিল তার স্ত্রীকে। আবার তিতাসের বুকেই দুই বুড়ো নিত্যানন্দ - গৌরাঙ্গ উদ্ধার করে কন্যার মতো মানুষ করে তাকে। আবার তিতাস বড়েই গোকর্ণঘাটে পৌঁছায় অনন্ত ও অনন্তের মা। তিতাস বেয়েই একদিন গোকর্ণ ঘাট ছাড়ে অনন্ত। এমনকী তিতাসকে ছেড়ষে চলে যায় কুমিল্লা। কিনতু শেষ পর্যন্ত ফিরে আসে তিতাসের টানে।মৃত তিতাসের সেবা করতে ।আর অপেক্ষা করতে করতে অনন্তবালা অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ায় তিতাসের সরু হয়ে যাওয়া ধারা বেয়ে। যদিও সেই ধারা বেয়েই উদয়তারা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি ফেরে।

তিতাসের বুকে জন্মায় চর। মালোরা ক্রমে সরে যায়। আর চরের দখল যায় কৃষকদের হাতে। বড়লোক কৃষকদের হাতে। অর্থনৈতিকভাবে মালোরা ধ্বংস হতে থাকে। আর তাদের উপরে চেপে বসে উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতিও। তিতাসের শুকিয়ে যাওয়া যেমন তাদের ভিক্ষাবৃত্তই নিতে বাধ্য করে। তেমনই উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির কাছে মাথা নোয়াতে হয়। এক আশে দিয়ে শুরু করে ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ উপন্যাসের প্রথম খন্ডেই বললেন - "নদীর একটা দার্শনিকরূপ আছে। নদী বহিয়া চলে ; কালও বহিয়াচলে ; কালের বহার শেষ নাই ; নদীরও বহার শেষ

নাই। কতকাল ধরিয়া কত নিরবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়াছে। তার বুকে কত ঘটনা ঘতীয়াছে। এই ঘটনারই জলছবি উপন্যাসটি। সেই ঘটনা নদিকেন্দ্রিক। অদ্বৈত অবশ্য সেখানেই শেষ করেন না। বরং আরেকটু এগিয়ে গেলেন - "সে দিখিয়াছে কত শিশুর জন্ম, দেখিয়াছে আর ভাবিয়াছে। ভাবী বিগ্রহের নিগড়ে আবদ্ধ এই অজ্ঞ শিশুগুলি জানে না হাসির নামে কত বিষাদ, সুখের নামের কত ব্যাথা, মধুর নামে কত বিষ তাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছে।" তরপর ট্র্যাজিক পরিণতিতে পৌঁছলেন - "কত মানুষ মরিয়াছে।" মানুষতো কালের কাছে তুচ্ছ। কিন্তু লেখক দেখালেন নদীর মৃত্যু। এই মৃত্যু শুধু একটি নদীর মৃত্যু নয়, জীবন প্রবাহেরও। সুতরাং নদী ভিন্ন এই উপন্যাসে কে আছে, কী আছে?

তিতাসের মধ্যগগন থেকে সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার ইতিবৃত্ত ষযেন বিধৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। ইতিতাসের মৃত্যু শুধু উপকথার মৃত্যু নয়। মিথের মৃত্যু নয় ; একটা গোটা সমাজের শেষ হয়ষে যাওয়া। তিতাস নদীকে কেন্দ্র করেই একটা সমাজের গড়ে ওঠা, বড় হওয়া আবার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। তাই তিতাস এই উপন্যাসের নায়ক। তিতাস একটি নদীর নাম। উপন্যাসেরও। সে উপন্যাসটি সার্থকনামা।

উপন্যাসের চরিত্র :

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি চরিত্র চিত্রমালা। চারটি খন্ডের আটটি উপখন্ডে একের পর এক চরিত্রের ঢেউ এসেছে। নদীর প্রতিটি বাঁকে যেমন নতুন ইশারা তেমনই এই উপন্যাসের প্রতিটি উপাখ্যানে নতুন ইশারা তেমনই এই উপন্যাসের প্রতিটি উপাখ্যানে নতুন ঘটনা নতুন চরিত্র। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস মন্তব্য কচরেছেন - "তিতাস একটি নদীর নামের চরিত্রগুলি গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে"। (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম) কিন্তু সমস্ত চরিত্রই গণ হয়ে ওঠেনি। কয়েকটি চরিত্র তাষদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত। বেশির ভাগ চরিত্রই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ভাস্বর। এই নিজস্বতার কারণ স্বয়ং লেখক খুব ঘনিষ্ঠভাবে চরিত্রগুলিকে চিনতেন - জানতেন। কখনও কখনও মনে হয় লেখক নিজেও স্বয়ং চরিত্র হয়ে উঠেছেন। অদ্বৈতর জন্ম ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস পারে মালোপাড়ায় । সুতরাং এই মানুষগুলিকে চেনা -জানা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে অদ্বৈত্বর স্কুলের অগ্রজ সহপাঠী সুবোধ চৌধুরী বলেছেন - "প্রথম যখন পান্ডিলিপি জমা দিয়েছিলেন, আমি বলেছিলেম - 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' আর কি মানুষ তোমার বই মানুষ নেবে? বলেছিলেন অদ্বৈত - "সুবোধদা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় Artist, Master

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

200

artist, কিন্তু বাত্তনের গোলা রোম্যান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা। "খাঁটিও সোনা তাই ভেঙ্গে গেল : সুবোধ চৌধুরী। সাক্ষাৎকার চতুর্থ দুনিয়া। ডিসেম্বর ১৯৯৪। অর্থাৎ কিনা আউলার পোলা জল জাল জেলেদের বিয়েই তো বাস্তব লেখা লিখবে। তাঁর চরিত্রগুলিও বাস্তবভূমি থেকে উঠে আসবে। তাই হয়েছে এখানে। সেইসঙ্গে ছিল অদ্বৈত্বর শিল্পবোধ। এই দুয়ের সংমিশ্রণে উপন্যাসটি চরিত্র বর্ণনায় সুন্দর হয়ে উঠেছে। আমরা এখানে কয়েকটি চরিত্র নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করতে পারি।

বাসন্তী :

উপন্যাসের সূচনা বিকাশ পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে যে চরিত্রটির সূচনা বিকাশ পরিণতি ঘনিয়েছে সেই চরিত্রটি হল বাসন্তী। যেন তিতাস নদী ও গোকর্ণঘাটের মালো সমাজের বিবর্তনকে এবং ট্রাজিক সমাপ্তিকে বাসন্তী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। অধ্যাপক অচিন্ত্য যর্থাথই বলেছেন, "তার (বাসন্তীর) বিকাশ এ উপন্যাসের কথাবস্তুর সঙ্গে একাকর। বাসন্তীর মধ্যে দিয়ে অদ্বৈত গোকর্ণঘাট ও তিতাসের জীবনপ্রবাহকে প্রতীকায়িত করেছেন। সেখানকার গণ জীবনের প্রায় সমস্ত লক্ষণ বাসন্তীর মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে।: (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম)

প্রথম খন্ডে দেখি "দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তী পড়িল বিষম চিন্তায়। সব বালিকারই কারো দাদা, কারও বাপ চৌয়ারি বানাইতেছেন, - ফুলকাটা, ঝালরওয়ালা, নিশান - উড়ানো কত সুন্দর চৌয়ারি। সংসারে তার একটি ভাইও নাই যে কোনোরকমে একটি চৌয়ার খাড়া করিয়া তার মাঘব্রতের শেষদিনের অনুষ্ঠানটুকু সফল করিয়া তুলিবে।"

বাসন্তীর চৌয়ারি তৈরি করে কিশোর ও সুবলল। সবথেকে সুন্দর। তারাই সেটি ধরে। সুবলকে দিয়ে কিশোর নিজের স্বত্ত্ব ত্যাগ করে। এতে করে উপন্যাসের সূচনাতেই ইঙ্গিত দেওয়া হয় বাসন্তী সুবলের স্ত্রী হবে।

তারপর সে হয়ে ওঠে 'সুবলের বউ। সুবলা নাই, তার বউ আছে।' আগমন ঘটে অনন্তর মা-র। অনন্তর প্রতি একটা অব্যক্ত টান অনুভব করে বাসন্তী। কিশোরকে সে পায়নি, পায়নি সুবলকেও। তবু তার আতিথেয়তা, আর বন্ধুত্ব, তার আবেগ টের পাওয়া যায়। সে আপন করে নিয়েছে অনন্তর মাকে। দুই তরুণের বন্ধুত্ব যেন চারিয়ে গেছে তাদের স্ত্রীদের মধ্যে।

তবে বাসন্তীর সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মালো সমাজের ধ্বজাধারী। তিতাস পারের

মালোপাড়া যখন নানান দিক থেকে আক্রান্ত তখন সে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে তার সত্তাকে, তাদের সত্তাকে। ভদ্রপাড়া অর্থাৎ উচ্চবর্গের সঙ্গে সংঘাতে নিম্নবর্গকে নেতৃত্ব দিয়েছে। এমনকী যখন সবাই যাত্রা দেখতে গেছে, সে অন্ধকারে তাদের সাংস্কৃতিকে নিয়ে বসে থেকেছে। ভদ্রপাড়ার ছেললেদের কু-ইঙ্গিতের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। স্বয়ং ঔপন্যাসিক বলেছেন - "সুবলার বউর মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে।" উপন্যাসে সে সত্যের পরিচয় আছে।

মেয়েদের জীবের পরিচয় নানান সময়ে পাল্টে পাল্টে যায়। বাসন্তী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর নিজের কথায় - "বাসন্তী আছলাম ছোটবেলা, যখন মাঘমাসে ভেউরা ভাসাইতাম। তারপর হইলাম কার বউ, তারপরে হইলাম রাড়ি। মাঝখানে হইয়া গেছলাম অনন্তরমাসী। তখন আবার হইয়া গেলাম বাসন্তী।" অর্থাৎ কিনা একটা বৃত্তের সম্পূর্ণা হওয়া। যে বাসন্তী 'বিপ্লবী' ছিল, সেই উদয়তারার কাছে মার খায়। শেষ অবধি দেখি তিতাস শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তীরও জীবন শুকিয়ে এসেছে।

অনন্তর মা :

উপন্যাসে বাসন্তীর পরেই যে নারী চরিত্রটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি সে হল অনন্তর মা। 'প্রবাস খন্ডে' তার সঙ্গে কিশোরের দেখা, ভালো লাগা, বিয়ে হওয়া। তারপর হারিয়ে যাওয়া। ফিরে আসা মালো পাড়ায়। তখন তার পরিচয় অনন্তর মা। কিন্তু এই সত্তার আড়ালে প্রবলভাবে বয়ে চলেছে তার প্রেমিক সত্তা। এত উথাল-পাতালেও সে খুঁজে পেতে চেয়েছে কিশোরকে, তার প্রেমকে। সামাজিকভাবে বিয়ে না হওয়ার অভিশাপ সে বহন করে চলেছে। উন্মাদ স্বামীকে ভালবেসেছে। তাকে কাছে পাবার চেষ্টা করেছে। দোলের দিন উন্মাদ স্বামীকে ভালবেসেছে। তাকে কাছে পাবার চেষ্টা করেছে। দোলের দিন তাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। বলেছে - "পাগলে আমারে পাগলিনী করছে।" এই পাগলামি কিশোর এবং তার জীবন কেড়ে নিয়েছে। একদিকে অনন্তর মা, অণ্যদিকে অতৃপ্ত দাম্পত্যের চিরপ্রেমিকা - এই দুই সত্তা তার মধ্যে সর্বদা কাজ করেছে। অনন্তকে বড় করবার জন্য তার প্রচেষ্টাও নেহাৎ কম নয়। মনে আশা ছিল - "এই একদিন আমরার দুঃখ ঘুচাইব।"

উদয়তারা :

বাসন্তীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব মারামারি ছাড়াও উদয়তারা অনন্তর একটা সময়কালের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পালনকর্ত্রী হিসাবে বেশি উল্লেখযোগ্য। বাসন্তীর সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের কারণ দুজনেরই নেতৃত্বদানের ক্ষমতা উদয়তারারও ছড়া শোলোক কেটে জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু এসবকিছুর মধ্যেও সে বাসন্তীর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। তার এই সহজস্বভাব তাকে অণ্যমাত্রা দিয়েছে। উদয়তারার মধ্যে একটা স্নেহ-মমতার ধারা ছিল। তাই সে যেমন দাদা বণমালীর প্রতি সহানুভূতি প্রবন হয়েছে, তমনি কাছে পেতে চেয়েছে অনন্তকে। সন্তসানহীনা নারীর স্নেহ ধাবিত হয়েছে অনন্তরপ্রতি।

অনন্তবালা :

অনন্তর মা যেমন কিশোর নামক তার প্রেমকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, তেমনি অনন্তবালা অনন্ত নামক প্রেমকে নিয়ে সারাজীবন বাঁচতে চেয়েছে। লেখক এই প্রেমের মধ্যে বুনে দয়েছেন মালোদের বাস্তবকে। আপলা ফুলের মালা সে বদল করেছিল অনন্তর সঙ্গে। অনন্তর মায়ের সামাজিক বিয়ে হয়নি। আর অণন্তবালা অনন্তর জন্য অন্তহীন সময় অপেক্ষা করেছে। কিন্তু তিতাস শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও শুকয়ে গেছে।অনন্বত শিক্ষার মধ্য দিয়ে এক সুদূর পথের ইশারা পেয়েছিল। অনন্তবালা সেই ইশারা ধরে রাখতে চেয়েছিল অনন্তর মধ্যে। তিতাস যেমন শুকিয়ে গেছে, তেমনি অর্থনৈতিক টানাপোড়ন তাদের প্রেমকে নিঃশেষ করেছে। অনন্ত বনমালীকে চিনতে পেরে বাসন্তী ও উদয়তারার জন্য কাপড় কিনে পাঠিয়েছে। কিন্তু অণন্তবালাকে তার মনে নেই। তবু অনন্তর জন্য অনন্তবালা অপেক্ষা করার কথাই যেন বলা হয়েছে। অনন্তবালার প্রেম পরিণতি পায়নি। সে অণন্তর চিহ্ন ইয়ে অপেক্ষা করেছে। শেষ অবধি দেশান্তরী হয়েছে। উপন্যাসটি প্রেমের নয়, তার পরিণতি ট্র্যাজিক। সেই পরিণতির সঙ্গে অনন্তবালা চরিত্রটি মিলে যায়।

কিশোর :

অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন - "কিশোর তিতাসের রোমান্টিক সৌন্দার্যাভিসারের দিকটিকে স্পষ্ট করেছে।" প্রথমখন্ডে অর্থাৎ 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'প্রবাসখন্ডে' সেই নায়ক। তার মধ্যে দিয়েই লেখক তিতাসের যাত্রা শুরু করেছেন। তার উত্তরসুরী অনন্তর মধ্য দিয়ে শেষ করেছেন। আর বিনি সুতোয় তাদের মধ্যে সংযোগ গড়ে দিয়েছে বাসন্তী। কিশোর গোকর্ণঘাটের মালোদের সুদূরের স্বপ্ন দেখিয়েছে। সে নিজে অভিযানে বেরিয়েছে। নয়াকান্দা, শুকদেবপুর সর্বত্র মালো সমাজকে সে অণুধাবন করে তাদের সজ্বল জীবনকে পাবার পরিকল্পনা করেছে। অর্থাৎ কিশোরের মধ্যে লুকিয়েছে

একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। সে হয়ত পারত তিতাস পারের জীবনকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে।

উপন্যাসের সূচনাতে বাসন্তীর চৌয়ারি গড়ে দেওয়া ও ধরার মধ্যে এবং পরবর্তীতে অভিযানে বেরনোর মধ্য দিয়ণে তার নেতৃত্বদানের ক্ষমতাটি স্পষ্ট হয়। কিন্তু তার প্রেমিকসত্তার রূপটি তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই তার উন্মাদ হয়ে যাওয়া। কিশোর কোনো অজানা - অচেনার প্রত্যাশী। তাই বাসন্তী তার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রাখলেও সে বিয়ে করতে চায় - 'যার লগে কোনকালে দেখা সাক্ষাৎ নাই।' আর তাই শুকদেবপুরে সুদেশের মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। ভিড়ের মধ্য থেকে তাকে আলাদা করে নিয়েছে। কিন্তু এই মেয়েটিকে হারিয়েই সে উন্মাদ হয়ে গেছে। শেষে হয়ত অনন্তর মাকে চিনতে পেরেছিল কিন্তু সে চেনা তাকে জীবনের উপান্তে এনে ফেলেছে।

টিপ্পনী

কাদির :

সরল চরিত্রের কাদির। ধর্মপ্রাণ মুসলমান সে। আলু বিক্রির আগেই অনাথদের জন্য আলু ছড়িয়ে দিয়েছে। ভালোবেসেছে সবাইকে। তাই মেয়ে আর পুত্রবধূর মধ্যে পার্থক্য করেনি। মিথ্যা তার কাছে গরলতুল্য। তাই মুহুরী নিজামতকে তাঁর প্যাঁচালো বুদ্ধিকে পচ্ছন্দ করেনি। মামলা -মোকদ্দমা সাধারণ মানুষের বিষয় নয় বলে সরে এসেছে সে পথ থেকে। তার কথায় - 'মানুষ মানুষকে এতটুকু বিশ্বাস করিবে না কেন?' বরং তার সহজ বুদ্ধি আস্থা রাখে মানুষের ইমংনের উপর। তাই নাতি রমুকে শহরে শিক্ষিতর মতো না করে মক্তবে পড়াতে চেয়েছে।

কাদির শেষ অবধি নিজের গোলা খুলে দিয়েছে উমুর্ষ মালোদের জন্য। তাঁর এই স্বভাব তিতাস পারের সরল জীবনধারাকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। অপরিসীম স্নেহশীলতার প্রতীক ককাদির মিঞা।

অনন্ত :

উপন্যাসে অনন্তর আগমন স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তিকালে। সে ছোট হলেও গভীর পর্যবেক্ষক। অধ্যাপক জহর সেনমজুমদারের মতে বলতে পারি - "সবকিছুকে সে নিবিড় বিস্ময়বোধন থেকে নিজ হৃদয়ে গ্রহণ করেছে। ..শুধু তাই নয়, যা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর নয়, সেই অদেখা অজানা রহস্যের প্রতিও এর দুর্নিবার আকর্ষণ।" (অদ্বৈতমল্লবরর্মণ : প্রেমে ও পিপাসায় - তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ)

টিপ্পনী

জন্ম থেকে সে ছিন্নমূল। অনন্তর মা ডাকাতের হাত থেকে বাঁচতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, সেসময় অনন্ত তার গর্ভে। তারপর বারে বারে সে ঠাঁই নাড়া হয়েছে। মা, বাসন্তী, উদয়তারা প নাশন আশ্রয়ে তার স্থিতি বদলে গেছে। সে গৌকর্ণঘাটের অনুষ্ঠানে নিজের অনিকেত ভাবটাকে আবিষ্কার করেছে। তাই অনন্ত কোথাও শিকড় গজাতে দেয়নি। মালোদের মতো জল-জাল-নৌকার স্বপ্ন দেখেনি। বরং অন্য এক অনুভব নিয়ে তিতাসকে প্রত্যক্ষ করেছে।

মালোদের অধঃপতন ঘটলেও, তারা তাদের প্রচলিত রীতি থেকে সরে গেলেও অনন্ত কিন্তু ধরে রাখতে চেয়েছে। তবে সে অন্য মালোদের মতো প্রেমে ভেসে যায়নি। তাই অনন্তবালার শত আকর্ষণ সত্ত্বেও পিপাসিত হয়েছে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি। তার ব্যাক্তি প্রেম উত্তীর্ণ হয়েছে সমষ্টি প্রেমে। স্থূল দেহ সর্বস্ব ভাবনা যেমন কিশোর ভাবেনি, তার সন্তান আরও বেশি করে ভাবেনি। বরং অনন্ত 'বাবুদের সঙ্গে মিলিয়া লোকের উপকার করিয়া ফিরিতেছে'। এইখানেই অনন্তর চরিত্রের সার্থকতা।

মৃত্যুচেতনা :

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস আসলে একটা নদীর মৃত্যু, কিংবা উপকথার মৃত্যু, কিংবা জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর উপন্যাস। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ট্র্যাজিক উপন্যাসে একটা জনগোষ্ঠীর ছবি আঁকতে চেয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষের এক কৌম সমাজের স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবে তাই জীবন - পথচলার পাশাপাশি মৃত্যু থেমে পড়া স্থান পেয়েছে। এটি কোন রোমান্টিক প্রেমোপ্যাখ্যান নয় যে এখানে মরণ সত্য হবে না। উপন্যাস শুরু হচ্ছে - "তিতাস একটি নদীর নাম। তার কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।"

আর সমাপ্তি ঘটেছে - "এখন সে মালোপাড়ার কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিতাগুলিতে গাছগাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।"

গৌরাঙ্গসুন্দরের স্ত্রী-র অতীত মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে উপন্যাসে মৃত্যুর লেখা শুরু। এই মৃত্যু উপন্যাসের ট্র্যাজিক ইদিত দেয়। তারপরের মৃত্যু অজ্ঞাত নারীর। কিন্তু এই কিশোরীর মৃতদেহ কিশোরের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী বলে ভুল করছে সবাই। এই ভ্রান্তি উপন্যাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিশোর উন্মাদ হয়ে গেছে। অনন্তর মা

পরিচয়হীনতায় ভুগেছে। আর অনন্ত পরিচয় হীনতার সঙ্গে সঙ্গে শিকড়হীনতায় আক্রান্ত হয়েছে।

পরবর্তীতে গণপ্রহারে মারা গেছে কিশোর। উন্মাদ কিশোর বোধহয় সেই সময় তার প্রয়সীকে খুঁজে পাচ্ছিল, খুঁজে পাচ্ছিল তার নষ্ট যাওয়া জীবনের মানে। সে স্বাভাবিক হবারমুহূর্তে হারিয়ে গেল। এই মৃত্যু সমাপ্তি ঘটাল একটি ট্রাজিক প্রেমের, সমাপ্তি ঘটাল কিশোরের প্রেমিকার জীবনের। অনন্তর মার মৃত্যু অনন্তকে আরো বেশি জীবন উদাসীন করে তুলেছে। কিশোরের মৃত্যু বৃহৎ অর্থে তিতাসের শুকিয়ে যাবার ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিত করে। কেননা কিশোর তার স্বভাবসুলভ বুদ্ধিমত্তায় মালোদের অন্যজীবনকে দেখেছে। সে হয়ত বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে পারত। কিন্তু সে না মারা গেলে উপন্যাস পরিণতি লাভ করবে না।

কিশোরের প্রবাসযাত্রাত দুই সংগী তিলক ও সুবল মারা গেছে। প্রবীন তিলকের মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু কিশোরের বাল্য-বন্ধু সুবলের মৃত্যু মর্মান্তিক। তার মৃত্যু আরো বেশি একাকী করেছে বাসন্তীকে। কিংবা বলা যেতে পারে, সুবলের মৃত্যু বাসন্তীকে বিপ্লবী করে তুলেছে। লেখক সুবলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মালো শ্রমিকদের কষ্টকর লাঞ্ছিত জীবনকে চিত্রিত করেছেন।

মাগন সরকারের মৃত্যু বীভৎস। কাদির অণৃতভাষণকারী জাগণকে বারে বারেই ক্ষমা করে দেয়। 'ভালোমানুষ' হয়ে ওঠার শপথে জাগন সরকার শেষ বারের মতো কাদিরের সর্বনাশ করেছিল। কিন্তু তারপর নারকেল গাছ থেকে পড়ে তার মৃত্যু কি পাপের প্রায়শ্চিত্তএর আত্মহত্যা? এই মৃত্যু পাঠককে স্তম্ভিত করে।

দয়ালচাঁদ, বাসন্তীর বাবা-মা, উদয়তারা, মোহন বনমালী- একে একে অনেকেই বিদায় নিয়েছে। তাদের মৃত্যু তিতাসের শুকিয়ে যাওয়া, তাদের অর্থনৈতিক দীনতার কারণে।

শুধু মানুষের মৃত্যু নয়, প্রেমের মৃত্যুও ঘটেছে উপন্যাসে। বাসন্তী কিশোরকে চাইলেও কিশোর বিয়ে করতে চেয়েছে অপরিচিতকে। বাসন্তী প্রেমের মৃত্যু ঘটেছে। পরবর্তিকালে অনন্তর মধ্য দিয়ে কিশোরকে অনুভব করতে চাইলে অনন্ত দূরে সরে গেছে। কিশোরের প্রেম মারা গেছে ডাকাতদের পাল্লায় পড়ে। অনন্তর মা ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও অজানা কিশোরীর মৃতদেহ তাকে উন্মাদ করে দেয়। সমাপ্তি হয় তার প্রেমের। অনন্তর মা পাগল কিশোরকে স্বাভাবিকতার পথে আনতে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চাইলেও দোলের উন্মদনা ও গণপ্রহারে কিশোরের মৃত্যু তার প্রেমের মৃত্যু ঘটিয়েছে। শারীরিকভাবে ও মৃত্যু হয়েছে তার। অনন্তবালার অনন্ত অপেক্ষা শেষ অবধি নিরাশায় পরিণত হবেছে। অনন্ত অনন্তবালার মধ্যে দিয়ে দৈহিক প্রেমকে চরিতার্থ করতে চায়নি অণ্য মালোদের মতো। বরং অনন্তবালার চির অপেক্ষা তাকে উদাসীন করেছে। সে জানত তারজন্য অন্তত একজন অপেক্ষা করছে । কিন্তু এই উদাসীনতা মৃত্যু ঘটিয়েছে অনন্তবালার প্রেমের। শেষপর্যন্ত সে দেশান্তরী হয়েছে।

মৃত্যু ঘটেছে মালোদের সংস্কৃতির । বাসন্তী মোহনদের ধরে জোর করে সে সংসখৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু উচ্চবর্গীয় সংস্খৃতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে তা।

সবথেকে বড় কথা একটা গোষ্ঠীর মৃত্যু ঘটেছে এখানে। তিতাস নাম নদীটি শুকিয়া গেছে। তার শুকিয়ে যাওয়া, শুকিয়ে দিয়েছে জেলেদেরকে। তিতাসের বুকে চর জেগে ওঠা তো মৃত্যুরই সামিল। নদীকেন্দ্রিক, নদীনির্ভর যে সমাজ নদীর মৃত্যুতে তারও মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুই উপন্যাসের ট্র্যাজিক পরিণতির কারণ। বাসন্তীর হাত থেকে লোটা পড়ে যাওয়া কৌম সমাজের পতনের দিককে সূচিত করেছে।

তবে শেষ পর্যন্ত তিতাসের বুকে ধানের দোলন কিংবা ধানকাটার পর বর্ষায় তিতাসের বুকে জলের বয়ে চলা জীবনের বমানতার ইঙ্গিত দেয়। জীবনে চলার পথে বিবর্তন স্বাভাবিক। জীবনের গতিপথ বিচিত্র সেই বৈচিত্র্যের পথ ধরেই পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু মানুষ রয়ে গেছে।

নিম্নবর্গচেতনা ও তিতাস একটি নদীর নাম :

১৯৩৬, ১৯৫৬, ১৯৫৭ এবং ১৯৮৮ সাল চারটি বাংলা উপন্যাসের প্রকাশ সাল। চারটি উপন্যাসই নদীকেন্দ্রীক। যথাক্রমে - পদ্মানদীর মাঝি, তিতাস একতি নদীর নাম, গঙ্গা এবং তিস্তাপারের বৃত্তান্ত। লেখক - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু এবং দেবেশ রায়। চারটির মধ্যে পদ্মা, গঙ্গা এবং তিস্তা তিনটি বাংলার প্রধান নদী। পদ্মা পুর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ), গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গের এবং তিস্তা উত্তরবঙ্গের। তিতাস ত্রিপুরার এক ছোটোনদী, যার কোন কুল মর্যাদা নেই। কুল মর্যাদা নেই তার লচেখক অদ্বৈত মল্লবর্মনেরও। অন্য লেখকরা উচ্চবর্গের প্রতিনিধি।অদ্বৈত নিজেই শুধু নিম্নবর্গীয় না, তাঁর চরিত্রও। কোনও তুলনা-প্রতিতুলনায় না গিয়ে এখানে অদ্বৈতর নিজের একটা কথা বলে

নেওয়া যেতে পারে। অদ্বৈতর স্কুলের অগ্রজ সহপাঠী সুবোধ চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন -

> "প্রথম যখন পান্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন, আমি বলেছিলেন - 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি', আর কি তোমার বই মানুষ নেবে?' বলেছিলেন অদ্বৈত : 'সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় Artist, master artist, কিন্তু বাওনের পোলা - রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা।" (চতুর্থ দুনিয়া : ডিসেম্বর ১৯৯৪)

সুতরাং একজন 'জাউলার পোলা' অর্থাৎ জেলের ছেলে যখন তাঁর নিজের সমাজ-সংসারকে নিয়ে লেখেন তখন তা হয় অনেক স্বাভাবিক, অনেক বাস্তব। বলা যেতে পারে তিতাসের Down to earth হবার পিছনে এই জাতিগত চেতনা কাজ করেছিল। কাজ করেছিল অদ্বৈতর বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা।

'Subaltern Studies' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত কারা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন -

> "শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষি ও প্রায় - গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য।"

এছাড়া অধ্যাপক গুহ দেশীয় প্রভুদের অধিনস্থদেরও নিম্নবর্গের মধ্যে ফেলেছেন। জেলেরা ক্ষেতমজুর না হলেও গরীব তো বটেই। তারা অধিকাংশই মহাজনের অধীনস্থ ও। সেই হিসাবে জেলে - মাঝিরা নিম্নবর্গের প্রতিনিধি। এরা আনওনিও গ্রামশীর ভাষায় 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণীর অপর মেরুতে অবস্থিত অধীন 'সাবলটার্ন' শ্রেনীর।

অধ্যাপক অশোক সেন বলেছেন -

> "The term Subaltern is used to denote the entire people that is subordinate in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way." (Subalterm Studies : 1987)

প্রভুত্ব-অধীনতা সম্পর্কে নানাপ্রকার উৎপাদন সম্পর্ক গ্রথিত আছে। জেলেরা মাছ ধরে। সেই মাছ চালান যায়, বিক্রি হয়। সেই অর্থে এখানেও একটা উৎপাদন সম্পর্ক রয়ে গেছে। তাই সব মিলিয়ে জেলেরা নিম্নবর্গীয়।

টিপ্পনী

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস পারের গোকর্ণঘাটে জন্মেছিলেন। তাঁর পাড়াটির নাম ছিল মালোপাড়া বা গারদের পাড়া। উপন্যাসটি জুড়ে এই মালোদেরই ধ্বনি। উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে তিতাসকে দিয়ে ল তার বৈশিষ্ট্য দিয়ে -

> "তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস।
>
> স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।
>
> ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।"

এই নদীর সঙ্গে তুলনা করেন শীর্ণকায় বিজয় নদীর হতভাগ্য দরিদ্র জেলেদের। অণ্যদিকে আসে গহীন জল, ঢেউ তোলা, নৌকা ডোবান মেঘনা। তিতাসের মধ্যে না আছে এই ক্ষীণতা, না আছে মেঘনার কৌলিণ্য। এ নদীর তীরে নেই কোনও নামী নগরী। কিন্তু তবুও তিতাসের কৃপণতা নেই। মালো তথা জেলেদের দুহাত ভরে দেয় সে। অথচ শেষ অবধি দেখি ধান-জমির চর মালোপাড়ার শূণ্যতা -

> "এখন সে মালো পাড়ার কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই। শূণ্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।"

একটি সমৃদ্ধপাড়া রিক্ত হয়ে যাচ্ছে। একটা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পুরো উপন্যাসটি জুড়ে এই নিম্নবর্গীয়দের ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ইতিহাস ড.গৌতম ভদ্র এক আলোচনায় বলেছেন -

> "গোটা উপন্যাসে মালোদের সমাজ ধ্বংস হওয়াটা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয় বরং একটা বিমূর্ত অর্থনৈতিক শক্তির ফলরূপেও দেখান হয়েছে।" (তিতাস একটি নদীর নাম : মধ্যবিত্তের চোখে : চতুর্থ দুনিয়া : ডিসেম্বর ১৯১৪)

ঠিকই বলেছেন ড. গৌতম ভদ্র। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিতে বাজারি দর কষাকষির মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হয়। মালোরা একটা নদীর উপর নির্ভরশীল। নদী তাদের কাছে অর্থ জোগানের উৎস। এই প্রাকৃতিক শক্তিই যখন

নিঃশেষ হয়ে যায় তখন কিভাবে একটা নিম্নবর্গীয় সমাজ শেষ হয়ে যায় সেটাই দেখান লেখক। অদ্বৈত উপন্যাসটির স্তরে স্তরে তানাপোড়নের সংঘাতকেই বিন্যস্ত করেছেন। তুলে ধরতে চেয়েছেন এক বয়ে চলা জীবনেতেহাসকে -

> "তিতাস সাধারণ একটি নদি মাত্র। কোনো ইতিহাসের কেতাবে, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণীতে এ নদীর নাম কেউ খুঁজে পাইবে না। কেননা তার বুকে যুযুধান দুই দলের বুকের শোণিত মিশিয়া ইহাকে কলঙ্কিত করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তার কি সত্যি কোনো ইতিহাস নাই?"

অনুশীলনী ও প্রশ্নাবলী :

১. বাংলা উপন্যাসের ধারায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর স্থান কোথায় যুক্তি সহ আলোচনা করো।

২. অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' - একে অপরের পরিপূরক - আলোচনা করো।

৩. নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস হিসাবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৫. বাসন্তী চরিত্রটির ইতিবৃত্ত তিতাসের ইত্তিবৃত্তএর সঙ্গে জড়িত - আলোচনা করো।

৬. বাসন্তী চরিত্রটির বিকাশ ও পরিণতি সঙ্গে তিতাস নদীর বিকাশ ও পরিণতি একীভূত হয়ে গেছে - আলোচনা করো।

৭. কিশোর ও সুবল চরিত্র দুটি বিশ্লেষণ করো।

৮. অনন্ত চরিত্রটি কি নিরাসক্ত দর্শকমাত্র - উপন্যাস অবলম্বনে যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৯. অনন্তর মা ও অনন্তবালা চরিত্রদুটির বিবর্তন উপন্যাসে কীভাবে ঘটেছে বিশ্লেষণ করো।

১০. 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির প্রকাশ কীভাবে ঘটেছে?

১১. উপন্যাসটি নারীচরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

১২. উপন্যাসটির পুরুষচরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

১৩. 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি অবলম্বনে লেখকের মৃত্যুচেতনার পরিচয়

টিপ্পনী

দাও।

১৪. উপন্যাসে গৌণচরিত্রগুলির ভূমিকা কী?

টিপ্পনী

NOTES

টিপ্পনী